ময়ূর ময়ূরী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৭৩

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

বিভূতিভূষণ রায়

বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :

অজিত গুপ্ত

ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রিয়ব্রত ক্লাশের বাইরে এসে একটু থামল। ছাত্র পড়ানোর অভিজ্ঞতা এর আগেও হয়েছে, কিন্তু অধ্যাপনা করা এই প্রথম। তাও মেয়েদের কলেজে। পথে-ঘাটে, বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে মেয়েদের যে শান্ত শিষ্ট নিরীহ রূপ দেখা যায়, সেটাই যে তাদের আসল চেহারা, এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। অন্তত চৌকাঠের ওপারে যে চীৎকার আর হৈ-চৈ শুরু হয়েছে সেটা একমাত্র সমুদ্র গর্জনের সঙ্গেই তুলনীয়।

অবশ্য আই-এ ক্লাশের মেয়েরা এমনই হয়। স্কুলের বাঁধনটুকু সরে যায়, ফ্রকের খোলস ছেড়ে অনেকেই নতুন-গড়ে-ওঠা-দেহ শাড়ীতে জড়ায়। কুঁড়িও নয়, ফুলও নয়, মনের এমনই অর্ধ বিকশিত অবস্থা।

এরাই যখন আর একটু বড় হবে, বি-এ পড়বে, এম-এ ক্লাশে ঢুকবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিধিও বাড়বে, বিস্তৃত হবে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র, সংসারের রূঢ় বাস্তবের ছায়া অনেকেরই মুখে এসে পড়বে, তখন এরাই স্তিমিত হয়ে যাবে। অনেক গম্ভীর। জীবনের সব কিছু এখনকার মতন ক্ষমাসুন্দর মনে হবে না। এ-সব কথা, এত কথা প্রিয়ব্রত চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববে, এত সময় তার হাতে ছিল না।

এ-সব সে পরে ভেবেছে। অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার অবসরে।

প্রিয়ব্রত শহরের ছেলে নয়। প্রথম জীবন তার মফস্বলেই কেটেছে। মধ্যবিত্ত বাপের আওতায়।

বাপ মধ্যবিত্ত অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। কিন্তু যে অফিসে কাজ করতেন সেখানে বাড়তি আয়ের পথ ছিল। সামান্য

অসৎ হতে পারলে, বিবেকের কথা বিস্মৃত হলে রোজগার বেশ ভাল হবার পন্থা ছিল।

প্রিয়ব্রতর বাপ এর কোনটাই পারেন নি। বরং সৎ হব এমন একটা দুর্বার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যার ফলে প্রিয়ব্রতদের সংসার স্বচ্ছলতার আলো দেখবার অবকাশই পেল না।

অথচ সংসার নিতান্ত ছোট নয়। প্রিয়ব্রত বড়, তারপরে ছোট আরও দুজন ছিল। এক ভাই, এক বোন। এ ছাড়া বিধবা এক পিসিও সংসারে থাকতেন।

অতিরিক্ত রোজগার না করতে পারার জন্য প্রিয়ব্রতর বাপের গঞ্জনাব অন্ত ছিল না। স্ত্রী বলত, পিসি বলত, মাঝে মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ পড়শীরা এসেও উপদেশ দিতে ছাড়ত না।

প্রিয়ব্রতর বাবা উত্তেজিত হতেন না। হাসি মুখে বলতেন, কি করি বলুন, আমার নামটাই যে বাদ সাধছে। কিছু করবার ইচ্ছা হলেও পারি না। নামটা মাঝপথে এসে দাঁড়ায়। লোভেব হাতটা আপনা থেকেই গুটিয়ে আসে।

প্রিয়ব্রতর বাপের নাম সত্যব্রত।

প্রিয়ব্রতর চরিত্রে বাপের ছায়াই পড়েছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রিয়ব্রত ভাল ভাবেই পাশ করল। জলপানি পেল না বটে, কিন্তু যারা পেল, তাদের কাছাকাছিই রইল। অঙ্ক আর ইতিহাসের পরীক্ষকরা আর একটু দরাজ হলে, একটা বৃত্তি পাওয়া খুব অসম্ভব হত না।

এবার সমস্যা হল প্রিয়ব্রত কি করবে।

মা আর পিসির ইচ্ছা এইবেলা বাপের অফিসে একটা দরখাস্ত দিক। ধরাধরি করলে চাকরি একটা হয়ে যাবে। অল্পবয়সে ঢুকতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতি অবধারিত। তবে বাপের মতন অমন নিরীহ গোবেচারা হলে চলবে না। আর সকলের মতন চালাক চতুর হতে হবে। যে রাজ্যের যে বিধি।

প্রিয়ব্রত একটি কথাও বলল না। সবাই পীড়াপীড়ি করতে শুধু বলল, বাবা যা বলবে, তাই হবে।

সত্যব্রত দুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। দেশের বাড়ীতে। কালেভদ্রে যান। দেশের বাড়ী বলতে কিছু জঙ্গলাকীর্ণ জমি আর তার মাঝখানে জরাজীর্ণ একমেটে চালা।

তিনি সন্ধ্যার পরই ফিরলেন। ফিরেই বললেন, আর দেরী নয় প্রিয়, কালই তুমি কলকাতায় চলে যাও। কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা কর। রেজাল্ট যখন ভাল হয়েছে, তখন ভাল কলেজে ভর্তি হতে নিশ্চয় কোন অসুবিধা হবে না।

প্রিয়ব্রত কিছু বলল না। যা বলবার তার মাই বলল।

বলি ছেলেকে তো পড়তে পাঠাচ্ছ, শহরে পড়ার খরচ কত সে হিসাব আছে? এ টাকা আসবে কোথা থেকে?

সত্যব্রত হাসলেন, এতদিন যার কাছ থেকে এসেছে, তার কাছ থেকেই আসবে।

বলেই পেটকাপড়ে-বাঁধা থলিটা বের করে উপুড় করলেন। অনেকগুলো নোট পড়ল থলি থেকে।

সত্যব্রতর স্ত্রীর দুটো চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। একগাল হেসে বলল, যাক, এতদিনে ভগবান তোমায় সুবুদ্ধি দিয়েছেন। বলেছিলাম না, ন্যায়, সত্য ও-সব বড় বড় কথা আঁকড়ে আজকাল আর বাঁচা যায় না। সবাই যা করছে তাই কর। এ পাপ নয়। এ যুগধর্ম।

স্ত্রীর উচ্ছ্বাসের দিকে সত্যব্রত খুব নজর দিলেন না। টাকাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললেন, এতে বারশো টাকা আছে। দেশের বাড়ী-জমি বেচা টাকা। এ ছাড়া তোমাকে দিতে পারি এমন কিছু আমার নেই। তোমাকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে। কম খরচে থেকে, ছাত্র পড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

সত্যব্রতর স্ত্রী কপাল চাপড়াল।

সর্বনাশ, ওই শেষ সম্বলটুকু তুমি শেষ করে এলে। খেয়াল আছে মেয়ে বড় হচ্ছে। তার বিয়ে দিতে হবে। তার চেয়ে প্রিয়ব্রতকে তোমার অফিসে ঢুকিয়ে দাও। দু পয়সা আনুক। তবু সংসারের একটু সাশ্রয় হোক।

সত্যব্রত আর কথা বললেন না। নোটগুলো জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভাবটা যেন প্রিয়ব্রতর সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গিয়েছে। আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

প্রিয়ব্রত কলকাতায় এল। অসুবিধা হয় নি। স্কুলের আরো কয়েকজন ছেলে এল। তাদের অভিভাবকরাও সঙ্গে ছিলেন।

সত্যব্রত এলেন না। প্রথম কথা, সবে ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলেন, এখনই আবার ছুটি পাওয়া মুস্কিল। দ্বিতীয় কথা, এবং সেইটাই আসল, সত্যব্রতর যাওয়া মানেই বাড়তি খরচ। থাকা, খাওয়া, ট্রেনভাড়া।

কাজেই প্রিয়ব্রত একলাই এল। ভর্তি হল প্রেসিডেন্সি কলেজে, থাকবার ব্যবস্থা করল বাগবাজারের এক মেসে। সেখানে চেনাজানা একটি লোকও ছিল।

শহর কলকাতা সহস্র-বাহু। যেই সান্নিধ্য আসে, তাকে বুকে টেনে নেয়। হাজার প্রলোভনের চুমকি জড়ানো তার জীবন। যারা মজে, তারা মরে। আবার ওরই মধ্যে অনেকে লোভের পাশ কাটিয়ে, বিলাসিতা এড়িয়ে কৃচ্ছ্র সাধন করে। পরিমিত জীবনযাত্রা।

প্রিয়ব্রত তাই করল।

গোটা তিনেক টিউশনি নিল। সকাল বিকাল। ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা। নিজের খরচটা নিজেই চালিয়ে গেল। বাপের কাছে হাত পাতার প্রয়োজন হ'ল না।

একটা দুটো করে চারটে বছর কাটল। একটা মানুষের

জীবনে চারটে বছর অনেক সময়। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যায়। পুরোনো মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়, নতুন মানুষ আসে।

সত্যব্রত গেলেন একেবারে আচমকা।

শনিবার মায়ের লেখা চিঠি এল। বাপের অসুখ। কি অসুখ, কবে থেকে তার কোনই বিবরণ নেই।

প্রিয়ব্রত তখনই ছুটল। বাড়ীর দরজায় গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন কান্নাগোল উঠেছে।

সব ঢুকে যেতে প্রিয়ব্রত একবার সংসারের দিকে চেয়ে দেখল। জরিপ করার দৃষ্টিতে।

এককোণে শঙ্খশুভ্র কাপড় জড়িয়ে মা পড়ে রয়েছে। রুক্ষ চুলের রাশ, বিবর্ণ মুখ, রক্তহীন অধর, পাণ্ডুর দুটি চোখ। এই কদিনেই মার বয়স যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে।

কিশোরী বোন। অভাবের সংসারে আর কিছু সংগ্রহ করতে পারে নি, কিন্তু স্বাস্থ্য সঞ্চয় করেছে। দেহে যুবতী। জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। আকস্মিক এই ওলোট-পালোটটা এখনও বুঝি মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না।

ছোট ভাই দেবব্রত। শোকে বিমূঢ়। গরীবের ঘরের ছেলেরা দুঃখের আঁচে পুড়ে সব কিছু একটু তাড়াতাড়িই বুঝতে শেখে।

একমাত্র পিসি অবিচল। ঝড়ঝাপটা গায়ে লেগেছে চেহারা দেখে এমন মনে হ'ল না। রোজকার মতন সংসারের কাজে ব্যস্ত।

চেয়ে চেয়ে প্রিয়ব্রত দেখল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও তার মনে পড়ে গেল। এতগুলো মুখের অন্ন, পরনের বস্ত্র তাকে যোগাতে হবে এখন থেকে। শুধু অন্নবস্ত্রই নয়, সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ সব কিছুর ভার তার ওপর।

প্রিয়ব্রত নিশ্বাস ফেলল।

নিজের পড়াশোনার ফাঁকে, টিউশনির অবসরে প্রিয়ব্রতর প্রায়ই নিশ্বাস পড়ত। নিজেকে উহ্য রেখে, যতটা সম্ভব টাকা বাড়ীতে

পাঠিয়ে দিত। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ীতে আসত। বোনকে দেখত, ভাইয়ের পড়াশোনার খোঁজ-খবর করত। মার কাছে বসে থাকত চুপচাপ। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেত না।

বি-এ পাশ করে প্রিয়ব্রত এম-এ ক্লাশে ঢুকল।

এই সময় মা মুখফুটে একটা কথা বলেছিল।

আর পড়ে কি হবে বাবা? সংসারটা যাতে থাকে সেই চেষ্টা কর।

প্রিয়ব্রত মার দিকে চাইল না। মাটির দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, পড়াশোনা করছি সেই জন্যই মা। শুধু বি-এ পাশ করে কোন লাভ নেই। এদেশে সাধারণ গ্রাজুয়েট ঘরে ঘরে। ভাল করে এম-এটা পাশ করতে পারলে ভাল চাকরি একটা জুটে যেতে পারে, কিংবা প্রতিযোগিতামূলক কোন পরীক্ষা।

মা চুপ করে রইল।

প্রিয়ব্রত বুঝতে পারল তার উত্তরে মা খুব সন্তুষ্ট হয় নি। তাই সে মার দিকে আর একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের কি কোন কষ্ট হচ্ছে মা? আমি কি ঠিকমত তোমাদের দেখছি না? অভাব মেটাতে পারছি না?

মা এবার বিচলিত হল, না, প্রিয়, অমন কথা আমি কখনও বলব না। উনি যাবার পর থেকে তুই বুক দিয়ে সংসারটা আগলে রেখেছিস, কিন্তু সংসারের দাবীও যে অনেক। নীলা চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। দেবুকে নিয়ে তো আমি ভাবনাতেই পড়েছি। লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই, কেবল পাড়ায় টইল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রিয়ব্রত আর কোন কথা বলল না। এ চিন্তা যে সেও করে নি, এমন নয়। কিন্তু কূল পায় নি। সমস্যার পর সমস্যা মনের সামনে থাবা মেলে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পায় নি।

তার ওপর প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করেছে দেবব্রতর পড়াশোনায় মন নেই। স্কুলের পরীক্ষাগুলোয় মোটেই ভাল নম্বর পায় না। কিছু

বদ সঙ্গীও ছুটেছে। প্রিয়ব্রতর ইচ্ছা, তার ভাল চাকরি-বাকরি জুটলে ভাইকে সে শহরে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে।

এ-সব সমস্যার হয়তো সমাধান হবে, কিন্তু নীলাকে কি করে পাত্রস্থ করবে সে কথা ভাবলেই তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। নীলা চোখ ধাঁধাঁনো সুন্দরী না হ'লেও কুরূপা নয়। স্বাভাবিক ভাবে তার একটা পাত্র জুটে যাওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল পাত্রপক্ষ শুধু রূপ খোঁজে না, রূপারও অনুসন্ধান করে। রূপ আর রূপার সেতুবন্ধন হ'লে তবে বিয়ের ফুল ফোটে।

সেইখানেই প্রিয়ব্রতর আসল সমস্যা।

এম-এর ফল বের হতে প্রিয়ব্রত মুহ্যমান হয়ে পড়ল। এমন ফল প্রিয়ব্রত আশা করে নি। প্রিয়ব্রতর অধ্যাপকরাও নয়।

প্রিয়ব্রত দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করল, তার অর্থ, এত কষ্টে, এতদিন ধরে তার তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

এরপর দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে বেড়াতে হবে অধ্যাপকের চাকরির আশায়। এ সর্বনাশ শুধু তাকেই স্পর্শ করল না, তার সংসারকে চূরমার করে দিল।

কেন এমন হল এ-কথা প্রিয়ব্রত বার বার ভেবেছে।

পড়তে পড়তে ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। মনে হত সংসারটা বিরাট মুখব্যাদান করে তার পিছু পিছু ছুটে আসছে। সে একটু অসাবধান হলেই তাকে গ্রাস করবে। প্রসারিত থাবা, লোল রসনা, ছুচোখে বুভুক্ষার ছায়া।

সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠত। প্রিয়ব্রত বইয়ের টেবিল ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াত। কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারত না।

রাত্রে শুয়েও নিস্তার নেই। মনে হত তক্তপোষের ছু পাশে

দু জন এসে দাঁড়িয়েছে। নীলা আর দেবব্রত। তৃষিত চোখ মেলে প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে রয়েছে।

কি চায় এরা! প্রিয়ব্রত তো নিজেকে নিংড়ে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সংসারের কল্যাণের জন্য ঢালছে। তবু কি এরা তৃপ্ত নয়? কেন এরা বোঝে না, একটা অনূঢ়া মেয়ের বিয়ে দেওয়া, একটি কিশোরকে লেখাপড়া শেখানো শুধু আয়াস সাধ্যই নয়, অনেক টাকার খেলা।

এত টাকা প্রিয়ব্রতর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ-সব কথা অধ্যাপকদের কাছে বলা চলে না। তাই প্রিয়ব্রত তাঁদের মৃদু তিরস্কারের উত্তরে মাথা নীচু করে রইল। একটি কথাও বলল না।

ওরই মধ্যে একজন অধ্যাপক উপদেশ দিলেন, তুমি কোন বে-সরকারি কলেজে চাকরির একটা চেষ্টা কর, আর সঙ্গে সঙ্গে ডি ফিল-এর জন্যও তৈরী হও। প্রফেসর লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টাও ঠিক করে নাও। প্রফেসর লাহিড়ীর নিজের রিসার্চের বিষয় ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সনেট।

একটা বে-সরকারি কলেজেই প্রিয়ব্রতর চাকরি জুটল। তা-ও মেয়ে কলেজে। কলেজটার নাম আছে। বিশেষ করে ইতিহাসে আর ইংরাজী সাহিত্যে। এ-ও জুটল প্রিয়ব্রতর এক অধ্যাপকের সুপারিশে।

বরাবর প্রিয়ব্রতর নম্বর ভালই ছিল। কেবল এম-এ পরীক্ষাতেই একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়ব্রত ডিফিল-এর জন্য বিষয় নির্বাচন করেছে Philosophy of Shelley.

প্রিন্সিপাল প্রিয়ব্রতকে ইণ্টারমিডিয়টের দুটো ক্লাশ দিলেন। ইংরেজী কবিতা।

অধ্যাপনা প্রিয়ব্রতর জীবনে এই প্রথম, কিন্তু টিউশনি সে অনেক বছর ধরে করছে। তবে সবই ছাত্র, ছাত্রী কেউ ছিল না। আর এখানে সবাই ছাত্রী।

কথাটা মনে হতেই প্রিয়ব্রতর সারা মুখে আবিরের ছোপ লাগল। রুমাল দিয়ে ঘাড় কপাল মুছে নিয়ে সে মরীয়া হয়ে ক্লাশে ঢুকে পড়ল।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের বেঞ্চ থেকে নারীকণ্ঠ, এস, এস, সুন্দর যাদব।

প্রিয়ব্রত মুখ তুলতে পারল না। হাতে একটা বই ছিল, সেটা শক্ত করে না ধরলে বইটা হয়তো মেঝেতেই ছিটকে পড়ত।

আস্তে আস্তে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেয়ারে বসল না। বইটা টেবিলের ওপর খুলে ধরে বলল, আজ যে কবিতাটি তোমাদের পড়াব তার নাম, 'দি লেডি অফ শ্যালট'। ল্যাটিন ভাষায় একটি রোমান্টিক গাথা আছে, নাম, দাওনা দ্য স্ক্যালাটা। অনেকের ধারণা লর্ড টেনিসন তাঁর এই কবিতার বিষয়বস্তু ওই রোমান্টিক গাথা থেকেই আহরণ করছেন। এই ভাবধারাই তিনি ভিন্নরূপে প্রকাশ করেছেন তাঁর 'আইডিল অফ ল্যানসেলট অ্যাণ্ড এলেন' কবিতায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় কবি টেনিসন ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিভূ। তাঁর চিন্তার প্রসারতা, জ্ঞানের গম্ভীরতা, ব্যক্তিত্বের বিশালতা তাঁকে চিরদিনের জন্য রসপিপাসু মনের কাছে অমর করে রাখবে। এ যুগে, এই আনবিক যুগে কবি টেনিসনের জনপ্রিয়তা যদি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, তার একমাত্র কারণ জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের হৃদয়ে কোন আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয় না। এই জন্য তিনি দায়ী নন, যুগে যুগে মানব-মনের বিবর্তন, রুচি, অরুচিই দায়ী। কিন্তু শিল্পী হিসাবে টেনিসনের আবেদন চিরকালীন।

আধ ঘণ্টার ওপর প্রিয়ব্রত বক্তৃতা করে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতন সকলে শুনল। কোথাও একটু শব্দ নেই। মনে হল নিশ্বাসও বুঝি রুদ্ধ।

প্রিয়ব্রত টেনিসনের বিভিন্ন কবিতার অংশ মুখে মুখে আবৃত্তি

করে গেল। দি লোটাস ইটার্স, আর্লি স্প্রিং, টিয়ার্স আইড্‌ল্‌ টিয়ার্স, দি ঈগল।

কলধ্বনি শুরু হল প্রিয়ব্রত ক্লাশ ছেড়ে বাইরে বের হবার পর।

এবার বাংলা ক্লাশ। একেবারে পাশের ঘরে। পড়াবেন হরকুমার পাঠক। বয়স ষাটের কাছাকাছি। অর্ধেক দাঁত বিলুপ্ত, কাজেই যা পড়ান তার অর্ধেকের বেশী তাঁর মুখগহ্বরেই থেকে যায়।

প্রথমে কথা বলল দীপিকা। সেই প্রিয়ব্রতকে আহ্বান করেছিল ক্লাশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে।

টেবিল চাপড়ে বলল, অদ্ভূত, অপূর্ব। এই বয়সেই কি চমৎকার পড়ান। আগে কোন কলেজে ছিলেন খোঁজ নিতে হবে।

গৌরী বড়লোকের আদরিনী কন্যা। সকালে মোটরে আসে, ছুপুরে মোটরে বাড়ী যায় টিফিন খেতে, বিকেলেও মোটর। তবে সব সময় যে এক মোটর আসে এমন নয়। ব্যারিস্টার বাপের ছু খানা, ইঞ্জিনীয়ার দাদার এক। পালা করে গৌরী এই তিনটেতেই চড়ে।

সে বলল, আমাদের বরাতে থাকলে হয়। বেশী মাইনে পেয়ে দেখবি কোনদিন অন্য কলেজে চলে যাবে। আবার সেই সি কে বি আসবে আখ চিবোতে চিবোতে।

যারা কাছাকাছি বসেছিল তারা হেসে উঠল।

গৌরী ঠিকই বলেছে। সি কে বি-র পড়ানো আখ চিবানোরই নামান্তর। ইংরাজী সাহিত্যটাকে একেবারে ছিবড়ে করে ছাড়েন। তার ওপর ভঙ্গীটাও ওই চিবানোরই মতন।

সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, এ-রকম অধ্যাপক পেলে তারা সারাটা দিন কেবল ইংরাজীর ক্লাশ করতেও রাজী।

কেবল ছু'জন কোন কথা বলল না। কোন মতামত প্রকাশ করল না। তারা অসীমা আর সুমিতা। ছু জনেই লেখাপড়ায় ভাল। ইংরাজী সাহিত্যে তো বটেই।

তারা যে চুপচাপ বসেছিল এটা দীপিকার চোখ এড়ায় নি। সে ঝুঁকে পড়ে বলল, কিগো মাণিকজোড়, তোমরা নীরব কেন? মাস্টার পছন্দ হয় নি?

মুখরা দীপিকাকে তারা দুজনেই ভয় করে। মেয়েটার মুখের কোন আগঢাক নেই। যা মনে আসে, তাই বলে।

অসীমা বাংলা বই খুলে নিজেকে আড়াল করল।

সুমিতা আঙুল দিয়ে ডেস্ক খুঁটতে খুঁটতে বলল, অধ্যাপকের সমালোচনা করা আমাদের কি উচিত, বিশেষ করে সম্পর্কটা যখন গুরু-শিষ্যের।

দীপিকা কাছে এসে একহাতে সুমিতার থুতনিটা তুলে ধরল, রকম-সকম তো ভাল বোধ হচ্ছে না। এতো শুধু চোখের দেখা নয় সখী, এ আগুন যে বুকের পাঁজরে গিয়ে ঠেকেছে।

সকলে হেসে উঠেই থেমে গেল। হরকুমারবাবু ক্লাশে ঢুকছেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

এবারও দীপিকা। কপট উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আপনার পায়ের বাতটা আজ কেমন আছে স্যর?

আর মা দীপিকা, বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। বাতসার তৈল বিশেষ কাজে লাগল না।

পড়া শুরু হ'ল। একটানা ক্লান্তিকর ছন্দে।

সেদিন কলেজ থেকে বেরোবার মুখেই প্রিয়ব্রত থেমে গেল।

সামনে গৌরী এসে দাঁড়িয়েছে।

নমস্কার স্যর, আপনি কোনদিকে থাকেন?

প্রশ্নটা আকস্মিক এবং অর্থহীন।

তবু প্রিয়ব্রত বলল, তারা রোড, কেন?

আসুন স্যর, আমার গাড়ী রয়েছে সঙ্গে। আমি গড়িয়াহাট যাব। তারা রোড আমার পথেই পড়বে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী একটা ফিকে সবুজ রংয়ের মোটরের সামনে দাঁড়াল। অর্থাৎ, এ মোটরটাই যে ওদের এটা জানাবার উদ্দেশ্যে।

পলকে প্রিয়ব্রতর দুটি কান লাল হয়ে উঠল। দু চোখে তীব্র জ্বালা। বাচালতারও একটা সীমা থাকা দরকার। ক্লাশে পড়াতে পড়াতে অনেকদিন প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করেছে, মেয়েটি গোল আয়না সামনে রেখে পাউডারের পাফ্ বুলিয়ে মুখ মেরামত করছে। কিছু বলতে গিয়েও প্রিয়ব্রত বলতে পারে নি। সঙ্কোচ এসে বাধা দিয়েছে। যে ধরনের সাজগোজ করে মেয়েটি চলাফেরা করে, সেভাবে সেজে কেউ শিক্ষায়তনে আসে না। এটা সাধনার পীঠস্থান, এখানে বেশে-বাসে আচারে-আচরণে সংযম প্রকাশই বাঞ্ছনীয়।

উৎকট সাজে সজ্জিতা ঐ মেয়েটির পাশে বসে প্রিয়ব্রতর যেতে ইচ্ছা করল না।

মিথ্যার আশ্রয় তাকে নিতে হ'ল।

গৌরীর একটু কাছে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন বাড়ী যাব না। আমার টিউশনি রয়েছে।

প্রিয়ব্রত আর দাঁড়াল না। পাশের গলি দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে গৌরী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো স্যরের সত্যিই টিউশনি আছে, কিন্তু কথাটা ভদ্রভাবে, আরো মোলায়েম করে তিনি বলতে পারতেন। এভাবে ছুটে পালাবার প্রয়োজন ছিল না।

তারপরের কথাটা মনে হ'তেই গৌরীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। ব্যাপারটা কলেজের কেউ লক্ষ্য করে নি তো? কোন সহপাঠিনী?

মুখ তুলতেই দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো অসীমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। সর্বনাশ! কি দেখেছে অসীমা? কতটুকু

দেখেছে ? অসীমা দেখা মানেই সুমিতা দেখা। তবে একটা সুবিধা, এরা আর কাউকে বলবে না। সারা ক্লাশ জানাজানি হবে না।

গৌরী গাড়ীতে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ড্রাইভার তৈরিই ছিল। মোটর চলতে শুরু করল।

ইদানীং প্রিয়ব্রত একটা দু কামরা বাড়ী নিয়ে আছে। মেসের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।

তারা রোড। একেবারে ভিতরের দিকে প্রিয়ব্রতর ঘর। খুব নিরিবিলি। বাইরের শব্দ বিশেষ পৌঁছয় না।

বাড়ীওয়ালা পতিতপাবনবাবু ওপরেই থাকেন। রেল অফিসের জাঁদরেল কেরানী। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাইরেই কাটান। এটা ছাড়াও কলকাতায় আরও একটা বাড়ী আছে। বেহালায় একটা বস্তি। একটা লোক চাকরি করে এত সম্পত্তি কি করে করলেন ভাববার বিষয়। অবশ্য যদি মাইনের অঙ্ক ছাড়া অন্য পথে বাড়তি টাকার আমদানি থাকে তা হলে অন্য কথা।

ভদ্রলোকের একটি মেয়ে। স্ত্রী আছেন, তা সে না থাকারই মতন। মাসের মধ্যে বেশী ভাগ সময় বিছানায় শুয়ে থাকেন। অম্বল, পিত্ত, মাথাঘোরা, আরো কি সব রোগ আছে।

মেয়েটিই সর্বেসর্বা। সারা সংসার মাথায় করে রেখেছে।

এখানে আসবার পরের দিনই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একেবারে মুখোমুখি।

স্নান সেরে প্রিয়ব্রত ঘরের মধ্যে এসে মাথা মুছছিল, দরজায় শব্দ। সেই অবস্থাতেই গামছাটা শরীরে জড়িয়ে প্রিয়ব্রত দরজা খুলে দিয়েছিল।

বয়স সঠিক কত বোঝা মুস্কিল। বিশেষ একটা বয়সের পর মেয়েদের বয়সের হদিশ পাওয়া যায় না। মসীলাঞ্ছিত বর্ণ। গোল

মুখ। তার মধ্যে চোখ দুটোকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। পরনের শাড়ীতে হলুদের ছোপ। মনে হল মেয়েটি রাঁধতে রাঁধতে উঠে এসেছে।

ও-রকমভাবে স্নান করলে তো চলবে না।

মেয়েটির আরো বোধ হয় কিছু বলার ছিল, কিন্তু প্রিয়ব্রতকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

বোঝা গেল, মেয়েটি এত সুপুরুষ, অল্পবয়সী ভাড়াটে হয়তো আশা করে নি।

কি রকমভাবে বলুন? প্রিয়ব্রত খুব মৃদুকণ্ঠে বলল।

মেয়েটি গলার সুর আরো মিহি করল, মানে আপনি কল খুলে স্নান করলে আমরা ওপরে জল পাই না। এই সময়টা আমাদের ওপরে জল দরকার। আপনি বরং বালতি করে জল ভরে রাখবেন, সেই জলে স্নান করবেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ব্রত বলল। মেয়েটির কথা শেষ হবার আগেই। তার চেয়ে আমি বরং ভোরে স্নান সেরে নেব। ভোর পাঁচটায়।

এরপর আর কিছু বলবার নেই। তবু মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে প্রিয়ব্রতর অগোছাল সংসারের দিকে দেখল।

জিনিসপত্র খুব সামান্যই, কিন্তু তাও প্রিয়ব্রত গুছিয়ে উঠতে পারে নি। সময়ই পাচ্ছে না। সকালের দিকে একটা টিউশনি। তারপর বাড়ী ফিরে স্নান সেরে মোড়ের হোটেলে খেয়ে কলেজে দৌড়াতে হয়। আবার বিকেলে এসে দুটো টিউশনি। তার বেশী আর প্রিয়ব্রত করে না। করলে নিজেরই ক্ষতি হবে।

কিন্তু সংসার এতেও সন্তুষ্ট নয়। মার চিঠিতে মনে হয়, আরো কিছু পাঠালে ভালো হয়। সব জিনিসের আগুনছোঁয়া দর। কিছুতেই কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

মেয়েটি এক সময়ে চলে গেল। প্রিয়ব্রত পোশাক পাল্টে

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মুনলাইট বোর্ডিং-এর উদ্দেশ্যে।

এই সময়টাই প্রিয়ব্রতর কষ্ট হয়। বোর্ডিং-এর নাম মুনলাইট কেন, ঈশ্বর জানেন। স্যাঁতসেঁতে খাবার ঘর। মুনলাইট সানলাইট কোন লাইটই ঢোকে না। সেজন্য নয়, প্রিয়ব্রতর কষ্ট হয়, খাবার সময়।

এর আগে মেসের খাওয়াটা ভালই হ'ত। নিজেদের তদারকে। বাড়ীতে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু যত্ন ছিল। এখানে কোনটাই নেই। ঠক্ ঠক্ করে খাবারের থালা বাটিগুলো যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে যায়। কোন জিনিসের দরকার হ'লে বারবার চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে হয়। লাজুক মুখচোরা প্রিয়ব্রতর কাছে এটাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। তাই বেশীর ভাগ দিনই অর্ধভুক্ত অবস্থায় তাকে উঠে যেতে হয়।

মাঝে মাঝে প্রিয়ব্রত ভেবেছে, অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলে বাড়ীতে রান্নার ব্যবস্থা করবে। একটা কুকার কিনে সামান্য আয়োজন। কিন্তু এই সামান্য আয়োজনেরও প্রস্তুতি পর্বের কথা ভেবে প্রিয়ব্রত আর এগোয় নি। বাজার করার একটা ঝামেলা আছে। তারপর চাল, ডাল, তেল, লবণের পিছনে দৌড়াদৌড়ি। এ-সব করতে গেলে টিউশনি করার সময়ই পাবে না। নিজের পড়াশোনারও ইতি।

কোন রকমে খাওয়া সেরে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে পড়ল। কলেজ খুব কাছে নয়, তাও প্রিয়ব্রত হাঁটে। বেশ কিছু পয়সার সংস্থান হয়। তার বর্তমান অবস্থায় একটা টাকা একটা মোহরের সামিল।

প্রিয়ব্রত যখন কলেজে গিয়ে পৌঁছল, তখন ক্লাশ শুরু হ'তে মিনিট দশেক বাকি।

মেয়েরা জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ গল্প করছে, কেউ নিছক চেঁচামেচি। প্রিয়ব্রত পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেল।

অধ্যাপকদের একটি বিরামকক্ষ আছে। অবসর সময়ে সবাই এখানে এসে বসেন। কেউ পাঠমগ্ন থাকেন, কেউ নিদ্রামগ্ন। কেউ

কেউ আবার নোট লেখার কাজে ব্যস্ত। পরীক্ষা-সমুদ্র পার করে দেবার নির্ভরযোগ্য ভেলা।

প্রিয়ব্রত চেয়ার টেনে একটা পাশে গিয়ে বসল।

ইতিহাসের অধ্যাপক অনাদিবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনি আড়চোখে একবার প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি ভুল পথে এসেছ ব্রাদার।

প্রিয়ব্রত একটু অন্যমনস্ক ছিল, কথাটা ঠিক শুনতে পায় নি। তাই ঝুঁকে বলল, কিছু বললেন ?

বলছি, শিক্ষকতার লাইনে না এসে তোমার সিনেমার লাইনে যাওয়া উচিত ছিল। মোটা রোজগার। আদর্শবাদের শুকনো বকুনিতে পেট ভরাতে হ'ত না। এমন চেহারা তোমার।

প্রিয়ব্রত আরক্ত হ'ল। বিড় বিড় করে কি প্রতিবাদ করল শোনা গেল না।

আজকের বিখ্যাত অমরকুমার, বুঝলে, এই কলেজে পড়ত। ইতিহাসের ছাত্র ছিল। ফরাসী বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে ক্লাশে জিজ্ঞাসা করলাম, উঠে অম্লান-বদনে দাঁড়িয়ে বললে, কে বেশী ফরাসী সুন্দরী নিজের করায়ত্ত করবে এই নিয়ে নাকি ফরাসী বিদ্রোহের শুরু। একদিকে অভিজাত সমাজ আর একদিকে সাধারণ প্রজা। বললাম, অমর কেন আর বাপের পয়সা খরচ করছ, অন্য কিছু দেখ।

বুদ্ধিমান ছেলে অন্য কিছু দেখছে। এমন দেখছে যে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালের মতন দশজনকে ড্রাইভার রাখতে পারে।

সবই ভাগ্য অনাদিবাবু বুঝলেন। বাংলার অধ্যাপক হরকুমার-বাবু নিজের কপাল চাপড়ালেন।

কিন্তু এ-সব ছেলে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কি করে ? প্রিয়ব্রত বিস্ময় প্রকাশ করল।

প্রিয়ব্রতর বিস্ময়ে অনাদিবাবু আরো বিস্মিত হলেন।

আরে ভায়া, এ-দেশে সবই সম্ভব। বিদ্যা তো এদেশে একটা কমোডিটি। কেনা যায়, বিক্রি করা যায়। পয়সার জোর থাকলে পি-এইচ-ডি এসে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এদেশে শিক্ষার আভিজাত্য আছে, না কৌলিন্য আছে ?

আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল। কারণ ঘণ্টার শব্দ। যাঁদের ক্লাশ আছে তারা উঠে দাঁড়ালেন।

অনাদিবাবু আর প্রিয়ব্রত দুজনেই পাশাপাশি বাইরে চলে এল।

ক্লাশে ঢুকে প্রিয়ব্রত রোজকার মতন একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

সব চেয়ে আগে নজর পড়ল গৌরীর ওপর। অন্য কোন কারণে নয়। চড়া শ্যাম্পেন-রঙ শাড়ী সে অঙ্গে জড়িয়েছে। দুকানে পাথর বসানো দুল। বেশে-বাসে হাবে-ভাবে এই মেয়েটার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রাণপন একটা প্রয়াস লক্ষ্য না করে উপায় নেই। শুধু মেধা তেমন প্রখর নয়, কিন্তু সব বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন।

সেদিন প্রিয়ব্রতকে মোটরে আহ্বান করার পর থেকে আর কাছে ঘেঁসে নি। করিডরে দু একটি মেয়ে এগিয়ে এসেছে পাঠ নিয়ে আলোচনা করার জন্য। কারুর এগিয়ে আসাটা ঐকান্তিক, কারও ভানমাত্র। ভাল মেয়ে সাজবার বাসনা। কিন্তু গৌরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করেছে। চোখের মুখে ঔদ্ধত্যের রেখা ফুটিয়ে।

আজকের বিষয়, প্রিয়ব্রত শুরু করল, টেনিসনের ভার্জিল। এই কবিতাটি ভার্জিলের উনবিংশতম মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত। কবি এখানে ভার্জিলের প্রতি তাঁর আজীবন আনুগত্য স্বীকার করছেন। তিনি বলছেন, পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই মৃত্যুর বীজ নিহিত। রাজ্য, সাম্রাজ্য কালের অমোঘ বিধানে সবই একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মিশিয়ে যায় ছায়ার মত, কিন্তু ভার্জিলের কাব্য চিরন্তন, তাই তা মৃত্যুরও উর্ধ্বে।

এই কবিতাটিতে ভার্জিলিয়ান হেক্সামিটার ছন্দও অনুসৃত হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে ইনিড, জর্জিস, একলোগাস, যেটির উপজীব্য মেষপালকের জীবন।

সেদিন বিকেলেই দেখা হয়ে গেল।

রেস্তরাঁ থেকে এককাপ চা খেয়ে প্রিয়ব্রত বাইরে আসতেই একেবারে চোখা-চোখি।

মনীশই আগে কথা বলল।

আরে প্রিয় না? কি করছ আজকাল?

মনীশের সঙ্গে প্রিয়ব্রত বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল। বি-এ পাশ করার পর মনীশ আর পড়ে নি। অথচ লেখাপড়ায় ভালই ছিল।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করতে বলেছে, অত উচ্চশিক্ষা আমাদের জন্য নয় ভাই। ও আমাদের নাগালের বাইরে। বি-এটা পাশ করতে হয়, নইলে অফিসের চৌকাঠও মাড়াতে দেয় না। দরখাস্ত নেওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু তুমি এত ধারালো ছেলে। কথাটা প্রিয়ব্রত ইংরাজীতে বলেছিল।

মনীশ হেসেছে, সংসারের চাকা আমার চেয়েও ধারালো। বেশী এগোতে গেলেই ছিন্নমস্তা করে দেবে। অবশ্য এমনিতেও থেঁৎলে জীবনের সব রসটুকু নিংড়ে নিচ্ছে।

মনীশের কথা প্রিয়ব্রত আগেই শুনেছিল। বিরাট সংসার। একান্নবর্তী পরিবার, কিন্তু রোজগারের হাত শুধু একটি লোকের। মনীশের কাকার। কাজেই মনীশ পাশ করে তাড়াতাড়ি কিছু একটা জুটিয়ে না নিতে পারলে সংসার অচল হয়ে যাবে।

এই একটা দিক দিয়ে মনীশের সঙ্গে প্রিয়ব্রতর অন্তত খুব মিল ছিল। সংসারের বিষে দুজনেই প্রায় নীলকণ্ঠ।

কিন্তু এত দুঃখ, এত বেদনা মনীশের প্রাণোচ্ছলতাকে নির্জীব

করতে পারে নি। দেখা হ'লেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চীৎকার করে কথা বলে। নিজের দুঃখের কথাও এমন ভাবে শোনায় যেন বিজয় কাহিনীই শোনাচ্ছে। আজও তাই।

প্রিয়ব্রত প্রায় উত্তর দেবার অবকাশই পেল না। শুধু বলল, একটা ছোট কলেজে ইংরাজী পড়াচ্ছি আর ডি-ফিলের জন্য তৈরী করছি নিজেকে।

মনীশ কোন কথা শুনল না। প্রিয়ব্রতকে টেনে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

এর আগে বাড়ীতে যাবার সুযোগ হয় নি। দুজনেরই ছাত্রাবস্থা। লাইব্রেরিতে বসে বসে পড়াশোনার কথা বলেছে কিংবা দেশের অবস্থা আলোচনা।

মনীশের বাড়ী দেখলে তাদের অবস্থা বোঝা যায় না। জরাজীর্ণ, সহস্রফাটল-কলঙ্কিত, কিন্তু বিরাট বাড়ী। মনীশের ঠাকুদার আমলের। এখন খোপে খোপে ভাড়াটে আছে তবুও বিশেষ সুরাহা হয় নি। এক তো সবই পুরোনো ভাড়াটে। ভাড়া যা দেয়, তা নগণ্য, তার ওপর প্রায়ই বাকি থাকে। কোর্ট-ঘর করে মামলা-মকর্দমা করে আদায় করার মতন বাড়তি লোক এ বাড়ীতে নেই।

মনীশরা একতলার ডানদিকে থাকে। কোন রকমে।

এস, এস, মনীশ প্রিয়ব্রতকে বাইরের ঘরে বসাল।

বাইরের ঘর বটে কিন্তু ঘরের চেহারা দেখে প্রিয়ব্রতর বুঝতে অসুবিধা হল না, রাত্রে এ-ঘরে শোয়াও হয়। একেবারে, কোণের দিকে গোটানো বিছানা।

তুমি কোথায় কাজ করছ আজকাল ?

এই প্রথম বোধ হয় প্রিয়ব্রত প্রশ্ন করার সুযোগ পেল।

টেবিলের তলা থেকে একটা বেতের মোড়া বের করে তার ওপর বসতে বসতে মনীশ উত্তর দিল, হার্বাট অ্যাণ্ড জনসন কোম্পানীতে।

ওষুধের কারখানা। আমি অবশ্য লেজার লিখি। দশটা পাঁচটা ঘাম ঝরিয়েও কুলাতে পারি না ভাই, রাত্রে আবার এক মাড়োয়ারীর গদিতে হিসাব লিখি। দুদিন কর্তা কানপুর গেছে, তাই আমায় যেতে হবে না।

মনে মনে প্রিয়ব্রত হিসাব করল। আজ বুধবার। বুধবার আর শুক্রবার এ দুদিন তারও ছুটি। যে টিউশনিটা ছিল, সেটা গেছে। ছাত্র পাশ করেছে। এইবার একটা খুঁজে নিতে হবে।

দাঁড়াও আসছি।

মনীশ উঠে দাঁড়াতেই প্রিয়ব্রত তার পাঞ্জাবির হাতা চেপে ধরল।

না ভাই, যে জন্য উঠছ বুঝতে পেরেছি। আমি কিছু খাব না। খেতে পারব না।

প্রিয়ব্রতর এই ছলনাটুকু ধরতে মনীশের একটুও অসুবিধা হ'ল না। সে হেসে বলল, তোমার পেট বোঝাই তা জানি ভাই, কিন্তু প্রথম দিন এসেছ একেবারে শুধু মুখে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে। তোমার জন্য কি আনি, আগে তাই দেখ।

মনীশ ছেঁড়া শাড়ীর পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল।

মিনিট দশেক, তার মধ্যেই মনীশ ফিরে এল।

চেয়ার থেকে উঠে প্রিয়ব্রত জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ীর কার্নিশে কার্নিশে কূজনমুখর পায়রার দল। নিজেদের মধ্যে সোহাগ করছে, আবার ঝগড়াও।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। এখনও বাতি জ্বালান হয় নি।

ঢুকেই মনীশ সুইচ টিপে দিল। আলো ফুটে উঠল ঘরে। যে কুশ্রীতা এতক্ষণ অন্ধকারে চাপা পড়েছিল, সেটা ফুটে উঠল প্রকট হয়ে।

কি এনেছি দেখ, রাজভোগ নিশ্চয় নয়।

মনীশ সশব্দে হাসল।

কিন্তু না, প্রিয়ব্রতর নজর টেবিলের ওপর রাখা চায়ের কাপ আর পাঁপড় ভাজার ওপর পড়ল না, পড়ল দুটি বিস্ফারিত দৃষ্টির ওপর।

আটপৌরে শাড়ী পরে কিশোরীটি অবাকচোখে প্রিয়ব্রতকে দেখছে।

একি তুমি ?

এবার মনীশের বিস্মিত হবার পালা।

তুমি সুমিতাকে চেন নাকি ?

এবার সুমিতা এগিয়ে এল। দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে মনীশের দিকে চেয়ে বলল, দাদা, এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। ইনি আমাদের ইংরাজী কবিতার ক্লাশ নেন।

তাই না কি ? মনীশের হাসি অম্লান, কি করে তোব সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝব বল। তুই এসে বলেছিলি, পি-বি আমাদের অদ্ভুত পড়ান। পি-বিতে প্রিয়ব্রতও হয় আবার ফটিক বিহারীও হ'তে পারে।

বাইরের আধঘুমন্ত পায়রাদের উড়িয়ে দিয়ে তিনজনে উচ্চকিত হাসিতে ভেঙে পড়ল।

প্রিয়ব্রত চা পাঁপড় শেষ করল।

ওঠবার মুখে মনীশ কথাটা পাড়ল।

প্রিয়, কিছু যদি মনে না কর তো একটা কথা বলব।

এঁটো কাপ ডিশ নিয়ে সুমিতা ভিতরে চলে গিয়েছিল। প্রিয়ব্রত একটু বিস্মিত হ'ল। তাকে বলার মতন মনীশের কি কথা থাকতে পারে।

কি বল ?

যদি সময় করে একটু সুমিতাকে দেখ। ইংরাজীর দিকে ওর খুব ঝোঁক। আমি তো ওকে দেখবার সময়ই পাই না।

দিনরাত চাকরির চরকিতে ঘুরছি। মাঝে মাঝে, ধর সপ্তাহে একটা দিনও যদি আস।

আমারও তো সময় কম মনীশ। অনেকগুলো টিউশনি করতে হয়।

এই পর্যন্ত বলেই প্রিয়ব্রত আচমকা থেমে গেল। পর্দার পাশে সুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে। টানা দুটি চোখ অপূর্ব মমতায় উচ্ছল। ঠোঁটের বঙ্কিম রেখাটিও অপূর্ব।

কি হ'ল প্রিয়ব্রতর। যা বলতে চায় নি, তাই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

বেশ, যদি পারি তো প্রতি বুধবার আসবার চেষ্টা করব।

সুমিতা কি মুখ টিপে হাসল। ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু তার দুচোখে খুশীর ছায়া।

মনীশ এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল প্রিয়ব্রতর পিঠে।

বাঁচালে ভাই, সুমিতা বেশ মেধাবী, তুমি একটু সাহায্য করলেই মনে হয় ও ভালই করবে। বুঝতেই তো পারছ, আজকাল একটু লেখাপড়া না জানলে পাত্রপক্ষ আর ফিরেই চায় না। ইদানীং সবাই চাচ্ছে চাকুরে মেয়ে। একজনের অর্থে সংসার চালাতে সাহস পাচ্ছে না।

সারাটা রাস্তা প্রিয়ব্রত ভাবল। কি এমন দেখল সুমিতার মুখে যে বিনা দ্বিধায় একটু ইতস্তত না করে কথা দিয়ে ফেলল। সারা সপ্তাহে দুটো দিন মাত্র তার অবসর। এই দুটো দিন একটা অর্থকরী টিউশনি জোটাতে পারলে সংসারের অনেক সুরাহা হ'ত।

কিন্তু সংসারের কথা না ভেবে শুধু নিজের চোখ, নিজের মনকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এত বড় একটা ঝুঁকি প্রিয়ব্রত নিল!

ক্লাশে পড়াতে পড়াতে প্রিয়ব্রত অনেকবার লক্ষ্য করেছে দু গালে দু হাত রেখে সুমিতা একমনে তার পড়ানো শুনছে। ঋজু বসার ভঙ্গী। আচার্য দান করছে, ছাত্রী গ্রহণ করছে ঠিক এই ভাব।

সপ্তাহান্তিক পরীক্ষাতেও সুমিতা ভাল নম্বর পায়। তার ইংরাজী লেখার পদ্ধতি সুন্দর। লিপিচাতুর্য প্রশংসার্হ।

এমন ছাত্রীকে পড়ানোর মধ্যে একটা আনন্দ আছে। তৃপ্তি আছে।

বাড়ী গিয়ে দরজা খুলতেই প্রিয়ব্রত একটা চিঠি পেল। পোস্টম্যান দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

জামাকাপড় না ছেড়েই প্রিয়ব্রত চিঠিটা তুলে নিল। খামের চিঠি। ওপরের ঠিকানাটা নীলার হাতের লেখা। সব চিঠির ঠিকানাই নীলা লিখে দেয়। চিঠিটা খুলেই আশ্চর্য হ'ল। এবার ভিতরের চিঠিটাও নীলার লেখা।

দ্রুত প্রিয়ব্রত চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। না, দুঃসংবাদ কিছু নেই। মা ভালই আছেন। এ চিঠিটা নীলাই দাদাকে লিখেছে। তার নিজের কথা। আজকাল শহরে নতুন যে শাড়ীর চল হয়েছে সেই শাড়ী নীলা একটা চেয়েছে। ছাপা শাড়ী। ডিজাইনটা যেন ভাল হয়।

কোনদিন মুখ ফুটে নীলা কিছু চায় নি। দাদার আর্থিক সামর্থ্যের পরিধি তার অজানা নয়, সংসারের বিকৃত চেহারার সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। এই বয়সে দু একটা শখের জিনিস পেতে মন চায় বই কি।

দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে প্রিয়ব্রত হিসাব করল। মাস শেষ হতে এখনও দিন দশেক। তার আগে শাড়ী কেনা সম্ভব হবে না। নীলার চিঠিতে সে কথাটা লিখে দেওয়া দরকার। বেচারা আশা করে থাকবে। ভাববে, দেবে না বলে দাদা চিঠির উত্তরই দিল না।

শুয়ে শুয়ে প্রিয়ব্রত আবার ভাবল।

এভাবে মনীশের কথায় সাত তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে সে ভুলই

করেছে। বুধ আর শুক্র এই দুটো দিনের সঙ্গে রবিবারের সকালটা যোগ করলে অনায়াসেই একটা টিউশনির কাজ নিতে পারত। বাড়তি টিউশনি মানেই বাড়তি উপার্জন। সংসারকে স্বচ্ছল করার অমোঘ ওষুধ।

একটা একটা করে সারা সপ্তাহ কাটল। কলেজে সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু সেও কথা বলে নি, প্রিয়ব্রতও পরিচয় হয়েছে এমন কোন ভাব দেখায় নি।

সেদিন সকালে উঠে কথাটা মনে হ'তেই প্রিয়ব্রতর খুব ভাল লাগল। সারা সপ্তাহ ধরে এই বিশেষ দিনটিরই যেন সে প্রতীক্ষা করছিল। এত ঔৎসুক্যের উৎস কি মনে পড়তেই ভ্রূ কুঁচকে প্রিয়ব্রত কঠিন হয়ে গেল।

ছি ছি, কি সব নীচ চিন্তা তার মনকে অধিকার করেছে। আজ সুমিতার বাড়ী যাবার দিন, সেই জন্যই বুঝি মন এত উৎফুল্ল।

সুমিতার সঙ্গে তো প্রতিদিন দেখা হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে একক্লাশে দুজনে রয়েছে, কিন্তু সে দেখায় বুঝি মন তৃপ্ত নয়? এখানে অন্য ছাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুমিতাকে প্রিয়ব্রত পাবে, নিজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। মনের মধ্যে এই পাপ এতদিন লুকিয়ে রেখে বুঝি প্রিয়ব্রত বিদ্যাদান করেছে। শেলী, টেনিসন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর পুণ্যজীবনী, তাঁদের লোকাতীত রচনার বিশ্লেষণ করেছে।

প্রিয়ব্রত ঠিক করল, সে যাবে না। মনীশের সঙ্গে দেখা হ'লে কিছু একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে দেবে। সময় অভাব, নিজের পড়াশোনা রয়েছে।

কিন্তু কলেজে যদি মনীশের বোন না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে আসে! তাহলে প্রিয়ব্রত কি বলবে! বলবে সময়ের অভাব। কথা দেওয়া সত্বেও তার কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না।

কিছু বলবে না সুমিতা, শুধু আয়ত কাজল দুটি চোখ মেলে কিছুক্ষণ হয়তো চেয়ে থাকবে।

বিকেল হতেই আলনা থেকে প্রিয়ব্রত পাঞ্জাবিটা টেনে নিল। আজ আড়াইটে পর্যন্ত ক্লাশ ছিল। তারপর বসে বসে নিজের রিসার্চের কাজ করেছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে অনেক বই এনে জড় করেছে। আরও অনেক পুরনো বই ঘাঁটা দরকার, কিন্তু সে-সব বই বাড়ীতে আনা যাবে না, লাইব্রেরিতে বসে পড়তে হবে।

দরজায় তালা এঁটে প্রিয়ব্রত যখন বের হল, তখনও ঠিক ছিল সে মোড়ের দোকানে চা খেয়ে কোণের স্টলে দু-একটা কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে আবার ফিরে আসবে।

প্রিয়ব্রত তা করল না। চায়ের দোকানে ঢুকল না, সোজা ট্রামে এসে বসল। পথ খুব দূর নয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করল না। অন্তত ট্রামে বসে বসে ভাবা যাবে। সারা জীবনটা কেমন যেন শ্লথগতি হয়ে পড়েছে। আরো পরিশ্রম করতে হবে প্রিয়ব্রতকে। নিজের জন্য, সংসারের জন্য।

মনীশদের বাড়ীর সামনে এসে প্রিয়ব্রতর খেয়াল হল। সর্বনাশ, মনের অগোচরে সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। মনের অগোচরেই বা কেন, গোপনে মনের সায় না থাকলে পায়ের সাধ্য কি তাকে এভাবে বহন করে নিয়ে আসে!

সামনেটা একেবারে ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। এ দিকের জানলাও বন্ধ। প্রায় শুনতে না পাবার মতন করে প্রিয়ব্রত ডাকল, মনীশ।

কেউ এল না। এত নীচুগলার ডাক কারও কানে গেছে এমনও মনে হল না।

পিছন ফিরে চলে আসছে, এমন সময় খুট করে দরজার শব্দ।

প্রিয়ব্রত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দরজার একটা পাল্লা খুলে সুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে।

একি, আপনি চলে যাচ্ছেন ?

না, মানে, বাড়ীতে কেউ নেই মনে হল। প্রিয়ব্রত আমতা আমতা করল।

বারে, কোথায় যাব ? সুমিতা হাসল, আপনি ডাকেন নি ?

হ্যাঁ, প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়ল, মনীশকে ডেকেছিলাম তো।

ডেকেছিলেন, আশ্চর্য, আমরা কেউ তো শুনতে পাই নি। আপনি আসতে পারেন এই ভেবে আমি দরজাটা খুলেছিলাম। আসুন স্যর।

প্রিয়ব্রত ভিতরে ঢুকল। সেই দিনের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। মনে হল বাইরের ঘরটার ইতিমধ্যে একটু সংস্কার হয়েছে। টেবিলের ওপর থেকে স্তূপাকার বই অন্তর্হিত। পেরেক-কণ্টকিত দেয়ালে ছবির সংখ্যা অনেক কম। চেয়ারগুলোর ওপর ঢাকা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য চেয়ার মাত্র দুটি। একটি বেতের মোড়া।

চেয়ারে বসতে বসতে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, মনীশ কি করছে ?

দাদা তো এখনও ফেরে নি অফিস থেকে। বলে গেছে ফিরতে রাত হবে।

একটু থেমে সুমিতা বলল, গোল্ডেন ট্রেজারী বইটা নিয়ে আসি স্যর।

প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়ল।

টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার মনে হল, সুমিতা কলেজে যেন একটু আড়ষ্ট, কিন্তু বাড়ীতে বেশ সহজ। এখানে অন্য মেয়ের দৌরাত্ম নেই বলেই বোধ হয়। বিশেষ করে দীপিকা আর গৌরীর মতন মেয়েদের।

একটু পরেই সুমিতা ফিরল, কিন্তু হাতে তার গোল্ডেন ট্রেজারী নেই, পরিবর্তে একটা রেকাবিতে সন্দেশ আর নারকেল নাড়ু, আর এক হাতে জলের গ্লাস।

একি রোজ রোজ কি শুরু করলে?

রোজ রোজ আপনি যেন আসছেন। চকিতের জন্য সুমিতার দু গালে রক্তের ছোপ লাগল, দু চোখে বিদ্যুৎ-দীপ্তি।

প্রিয়ব্রত কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

একটু পরে পড়া শুরু হল। টেনিসনের 'টিয়ার্স আইড্‌ল্‌ টিয়ার্স'।

প্রিয়ব্রত পরিবেশ ভুলল। এটা যে ক্লাশরুম নয়, ছোট জীর্ণ একটা প্রকোষ্ঠ, তা বিস্মিত হল। সামনে অগণিত ছাত্রী নয়, মাত্র একটি লাবণ্যময়ী কিশোরী এ-কথাও মনে রইল না। ক্লাশে যে-ভাবে পড়ায়, গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে তেমনি ভাবে কবিতাটির ব্যাখ্যা করে গেল।

এটি একটি সঙ্গীত। টেনিসনের 'দি প্রিন্সেস' কবিতাটি থেকে গৃহীত। এর মর্মার্থ, যে প্রেম নিশ্চিহ্ন, চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত, তার জন্য শোক প্রকাশ। এটি সঙ্গীত নয়, নিশ্বাস। তারুণ্যের, যৌবনের, বসন্তের জন্য বিলাপ। লেখা আয়াম্বিক পেণ্টামিটারে, সব জায়গায় এ ছন্দ অবশ্য রক্ষিত হয় নি।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ধরে প্রিয়ব্রত একটানা বলে গেল। প্রেম সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিয়ে। আলোচনার সময় খেয়ালও করল না যে সামনে বসা কিশোরী লজ্জায়, সঙ্কোচে আরক্ত হয়ে উঠল ক্ষণে ক্ষণে।

পড়া শেষ করে প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে উঠল।

আমি চলি। আশা করি কবিতার মূল সুরটা বুঝতে পেরেছ?

সুমিতা ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, পেরেছে বুঝতে। তারপরই বলল, সামনের বুধবার আসবেন তো স্যর?

সামনের বুধবার? তার তো অনেক দেরী। আসব বৈ কি।

আমার তো ইচ্ছা হয় আপনাকে রোজ আসতে বলি। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। আপনি বুঝিয়ে দিলে আর পড়বার দরকারই হয় না। মনের মধ্যে সব কিছু গেঁথে যায়।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে সুমিতা লজ্জায় মাথা নীচু করল। প্রিয়ব্রতও আশ্চর্য হল। পরিমিত-বাক সুমিতার কাছ থেকে এত কথা সে-ও প্রত্যাশা করে নি।

ঘরের চৌকাঠের কাছে এসেই প্রিয়ব্রত থেমে গেল। সুমিতার দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা, তোমার এটা কি? ছাপা শাড়ী?

বিস্ময়ে সুমিতার ঠোঁটের দুটো পাশ কুঁচকে গেল। এমন একটা প্রশ্নের অর্থই তার বোধগম্য হল না।

শাড়ী?

হ্যাঁ, তোমার শাড়ীটা।

না, না, এটাতো ছাপা শাড়ী নয়, এটা তাঁতের শাড়ী। কেন বলুন তো?

প্রিয়ব্রত হাসল, আমার বোন আমাকে চিঠি লিখেছে তার জন্য একটা ছাপা শাড়ী নিয়ে যেতে। ছাপা শাড়ী কাকে বলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অবশ্য দোকানে গিয়ে বললেই হবে, তবু তার আগে জিনিসটা আমি চিনতে চাই, চোখে দেখতে চাই।

সুমিতাও হাসল, বেশ তো, যখন দরকার হবে বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে দোকানে গিয়ে পছন্দ করে দেব।

প্রিয়ব্রত আর দাঁড়াল না। চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে চলে গেল।

দিন দশেক পর। রাস্তার মোড়েই পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে প্রিয়ব্রতর দেখা।

কোথায় থাকেন বলুন দেখি মশাই, যতবার নীচে যাই দেখি তালা বন্ধ।

প্রিয়ব্রত মুচকি হেসে বলল, বুঝতেই পারছেন পেটের ধান্ধায় ঘুরতে হয়। কলেজ আছে, ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো আছে, আবার দু বেলা খেয়ে আসতে হয়।

আরে সেই সম্বন্ধেই তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বেশ বলুন।

এখানে দাঁড়িয়ে বলাটা কি ঠিক। চলুন আপনার ঘরেই যাই।

প্রিয়ব্রত ফিরল। পিছন পিছন পতিতপাবনবাবু।

আসতে আসতেই প্রিয়ব্রত ভেবে নিল। তার সঙ্গে পতিতপাবন-বাবুর কি কথা থাকতে পারে! লোকটা অবশ্য কারো ক্ষতি করে না। নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। কোথা থেকে হুটো পয়সা আসবে কেবল সেই চেষ্টায় ঘুরছে। সংসারে পয়সা এনে দিয়েই খালাস। তারপর আর তাকে দেখতে হয় না।

সব কিছু মেয়ে রত্নাই করে।

এ জন্য পতিতপাবনবাবুর গর্বের অন্ত নাই। প্রায়ই বলেন।

সংসার তো ছার, রত্না ইচ্ছা করলে একটা জমিদারি চালাতে পারে। এমন বুদ্ধি তার আছে। বরাত, মেয়েটার একটা ভাল পাত্র জুটল না।

এ খেদোক্তি এ-পাড়ার সবাইয়ের শোনা।

আবার উল্টো কথাও পতিতপাবনবাবু বলেন, তবে এ-ও বলি, রত্নার বিয়ে হ'য়ে গেলে সংসার অচল হয়ে যেত। আমি না খেয়ে মারা যেতাম। ওইতো একটা রোগিণী সম্বল। নিজেই ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারে না, সংসারের ভার নেবে কি!

দরজা খুলে, আলো জ্বেলে প্রিয়ব্রত ডাকল।

আসুন পতিতপাবনবাবু।

পতিতপাবনবাবু ঘরে ঢুকে চেয়ারের ওপর জাঁকিয়ে বসলেন।

বলুন কি কথা?

মানে, মারাত্মক কোন কথা নয়। কথাটা আমার মনে হয় নি, রত্নাই আমাকে বলল। এই যে আপনি হু বেলা বাইরে খেয়ে আসছেন, এতে কষ্টও হচ্ছে, পয়সাও যাচ্ছে, তার চেয়ে ওই ভাড়ার

সঙ্গে খাওয়ার খরচ বাবদ বাড়তি কিছু দিলে, আমার এখানেই ব্যবস্থা হ'তে পারে।

কথাটা-যুক্তি নির্ভর। বর্ষাকালে দুবেলা ছুটোছুটি করতে বেশ একটু অসুবিধাই হয়। তাছাড়া, ওখানকার রান্নার কথা না বলাই ভাল। অনেকদিন প্রিয়ব্রত তরকারি মুখে ঠেকিয়েই নামিয়ে রেখেছে। অত ঝাল তার সহ্য হয় না।

এ ব্যবস্থা মন্দ নয়, অবশ্য খরচটা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়।

সেদিক দিয়ে অসুবিধা হ'ল না। ঠিক হ'ল, মাসের এ-কটা দিন যেমন চলছে চলুক। সামনের মাস থেকে প্রিয়ব্রত পতিতপাবনবাবুর বাড়ীতেই খাবে।

পতিতপাবনবাবু হাসলেন, এ একেবারে বিলিতী ব্যবস্থা বুঝলেন, প্রিয়বাবু। পেয়িং গেস্ট যেমন থাকে না ?

প্রিয়ব্রত বুঝল। খরচ হয়তো সামান্য বেশী পড়বে, তবু আহার্যটা ভাল হবে। বাড়ীর রান্না আর হোটেলের রান্নায় অনেক প্রভেদ, তাছাড়া দু-বেলা ওই ছুটোছুটি থেকে পরিত্রাণ।

প্রিয়ব্রত সেই রাতেই নতুন ব্যবস্থার কথা বাড়ীতে লিখে দিল।

পরের দিন প্রিয়ব্রত কলেজে গিয়েই খবরটা পেল। আজ কলেজ ছুটি। কোন ক্লাশ হবে না। হরকুমারবাবু মারা গেছেন।

একেবারে হঠাৎ। কালও ক্লাশ নিয়েছেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর স্ত্রীকে বললেন, শরীরটা একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছে। স্ত্রী ভাবলেন, কদিন গুমোট গরম পড়েছে, সেই জন্যই হয় তো। হাতপাখা নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলেন। তারপর কখন যে হরকুমারবাবু শেষ হয়ে গেছেন, কিছুই জানতে পারেন নি।

অনাদিবাবু প্রস্তাব করলেন, চলুন আমরা যাই হরকুমারবাবুর বাড়ী, কলেজের তরফ থেকে শেষ মালা দিয়ে আসি।

নোটিশ টাঙানো হয়ে যেতে অধ্যাপকের দল বেরিয়ে পড়লেন।

স্যর, স্যর।

আচমকা কানের পাশে আওয়াজ শুনে প্রিয়ব্রত ঘাড় ফিরিয়েই অবাক।

একেবারে কাছে গৌরী এসে দাঁড়িয়েছে। উৎকট প্রসাধন। চোখে কাজল। দুটো মালার একটা দিয়েছে হরকুমারবাবুর দেহের ওপর, আর একটা দিয়ে নিজের কবরী সাজিয়েছে।

প্রিয়ব্রত মুখে কিছু বলল না। ভ্রূ-ভঙ্গী করে জিজ্ঞাসা করল, কি?

আমরা সঙ্গে যাব স্যর, শ্মশান পর্যন্ত?

প্রিয়ব্রত বিব্রত হ'ল। যতগুলো অধ্যাপক জমায়েত হয়েছে তার মধ্যে সে সর্বকনিষ্ঠ। তার কাছ থেকে এ-ধরনের অনুমতি চাওয়ার কোন মানে হয় না। বিশেষ করে একটু দূরেই প্রিন্সিপাল নিজে যখন দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

প্রিয়ব্রতকে উত্তর দিতে হ'ল না, উত্তর দিলেন রাজীববাবু। কেমেষ্ট্রীর অধ্যাপক। রাশভারী আর কড়া লোক বলে সারা কলেজে তাঁর নাম আছে।

না, না, তোমরা মেয়েরা শ্মশানে যাবে কি করতে? এই রোদে?

সঙ্গে গাড়ী ছিল স্যর। গৌরী উত্তর দিল।

রাজীববাবুর কণ্ঠ জলদগম্ভীর, মোটরে চড়ে যাওয়াকে শবানুগমন বলে না।

গৌরী সরে গেল।

হরকুমারবাবুর দেহ আবার ওঠানো হ'ল। প্রিয়ব্রত সকলের সঙ্গে চলতে শুরু করল।

হরকুমারবাবুর জায়গায় নতুন অধ্যাপক এল চিত্তবাবু। একেবারে ছোকরা। বয়সে বোধহয় প্রিয়ব্রতর চেয়েও ছোট। এম-এ পাশ।

এর আগে মফস্বল কলেজে ছিল। সেখানে অনেক অসুবিধা, তাই একটু কম মাইনেতেও এখানে যোগ দিয়েছে।

প্রথম আলাপেই চিত্তবাবুকে প্রিয়ব্রতর খুব ভাল লেগেছিল। একটু আলাপের পরেই চিত্তবাবু প্রিয়ব্রতকে বলল, একটা কথা বলব প্রিয়দা।

প্রিয়দা! সম্বোধনটা নতুন হ'লেও প্রিয়ব্রতর ভাল লাগল।

কি বল?

চিত্তবাবু কিছুতেই প্রিয়ব্রতকে আপনি বলতে দিল না।

মানে আপনার কবিতা-টবিতা আসে?

কবিতা? না ভাই।

সে কি কবিতা পড়ান আর লেখেন না।

পড়াই বলেই বোধহয় আর লিখতে পারি না। যখন ভাবি কারা সব এ-ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, বায়রণ, শেলী, কীট্‌স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, এদেশের ভারতচন্দ্র, হেম, নবীন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, তখন কলমের কালি শুকিয়ে যায়। কবিতা আর বেরোয় না।

প্রিয়ব্রতর কথায় চিত্তবাবু যেন একটু মুহ্যমান হয়ে পড়ল। খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি লিখি। না লিখে পারি না। তবে আধুনিক কবিতা নয়, রীতিমত অর্থবহ।

প্রিয়ব্রত হাসল, বেশ তো একদিন শুনিও।

চিত্তবাবু মহাখুশী। বলল, নিশ্চয়। তবে আমি যেখানে থাকি সেখানে আপনি যেতে পারবেন না। একেবারে হরিঘোষের গোয়াল।

আমি প্রাসাদে বাস করি এটা তুমি অনুমান করলে কি করে? প্রিয়ব্রত হেসে জিজ্ঞাসা করল।

প্রাসাদে থাকেন কি না জানি না, তবে প্রাসাদে থাকবার মতন চেহারা।

প্রিয়ব্রত আর কথা বাড়াল না। এখন কথা বাড়ালে চলবেও না। টিউশনির সময় হয়ে গেল।

যেতে যেতেই মনে হ'ল ফিকে সবুজ রঙের একটা মোটর পাশ কাটিয়ে গেল।

প্রিয়ব্রত চোখ তুলে দেখল। মনে হ'ল যেন গৌরী রয়েছে গাড়ীতে। শুধু গৌরী নয়, তার ক্লাশের আরও কিছু মেয়ে রয়েছে।

প্রিয়ব্রত ফুটপাথে উঠে পড়ল।

মাইনে পাওয়ার দিন দুয়েক পরেই প্রিয়ব্রত কথাটা বলল।

সেদিনও মনীশ ছিল না। ইদানীং মনীশ থাকেও না। তার অফিসে কাজের চাপ পড়েছে। অফিস থেকে সোজা চলে যায় মাড়োয়ারীর গদিতে। বাড়ীতে আসার সময়ই পায় না।

পড়তে বসবার আগেই প্রিয়ব্রত বলল।

সেদিন সেই যে ছাপা শাড়ীর কথা বলেছিলাম তার দাম কি রকম হবে সুমিতা ?

সুমিতা বলল, জিনিস হিসাবে দাম স্তর। যেমন জিনিস আপনি কিনবেন, তেমনই দাম পড়বে। পনেরো, কুড়ি টাকা।

আমার খুব সাধারণ দামের শাড়ীই দরকার।

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে দু' খানা দশটাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখল, তাহলে এ টাকাটা তুমি রেখে দাও। আমার জন্য সুবিধামাফিক একটা শাড়ী কিনে রেখ। এই শনিবার ভাবছি দেশে যাব, তখন সঙ্গে নেব।

নোট দুটোর ওপর সুমিতা বই চাপা দিল। বাইরে এলোমেলো হাওয়া বইছিল, পাছে উড়ে যায়, এই ভয়ে।

প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে বলল, আপনার বোনের শাড়ী আপনি পছন্দ করে কিনবেন না তা কি হয়।

আমার পছন্দের বালাই নেই, সুমিতা। তুমি পছন্দ করলেই হবে।

তার চেয়ে বরং একটা কাজ করি স্যার।

কি বল ?

চলুন আমরা দু' জনে বের হই। বড় রাস্তায় পাশাপাশি কতকগুলো কাপড়ের দোকান আছে, সেখান থেকে পছন্দ করে কিনে নেব।

কিন্তু তোমার পড়া ?

শাড়ী কিনতে আর কতটা সময় নেবে, ফিরে এসে পড়ব।

বেশ। প্রিয়ব্রত রাজী হ'ল।

একটু অপেক্ষা করুন, মাকে একবার বলে আসি।

সুমিতা ভিতরে চলে গেল, ফিরল প্রায় মিনিট পনেরো কাটিয়ে। ইতিমধ্যে শাড়ীটা পাল্টেছে। মুখেও হালকা প্রসাধনের প্রলেপ। চুল এলো ছিল, একটা খোঁপাও করেছে।

এতক্ষণ প্রিয়ব্রতর এতটা খেয়াল হয় নি, ঝোঁকের মাথায় হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু এখন সুমিতার পাশাপাশি পথ চলতে গিয়ে পদে পদে অসুবিধা বোধ করতে লাগল। নির্জন প্রকোষ্ঠে সুমিতাকে পড়ানো এক কথা। সেখানে প্রিয়ব্রত অধ্যয়নের মধ্যে ডুবে যায়। কোন জ্ঞান থাকে না। সে গুরু, সুমিতা ছাত্রী। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার পথচারীর কুটিলদৃষ্টির সামনে সঙ্কোচের কাঁটা বিঁধে থাকে। কথা বলতেও জড়তা আসে। তাছাড়া কি কথা বলবে প্রিয়ব্রত ভেবেই পায় না।

ভাগ্য ভাল দোকানটা কাছে। কিন্তু এক দোকানে পছন্দসই শাড়ী পাওয়া গেল না। পর পর তিনটে দোকান সুমিতা আর প্রিয়ব্রত ঘুরল।

একটা দোকানে শাড়ী পছন্দ করতে করতে সুমিতা জিজ্ঞাসা করল, আপনার বোনের গায়ের রঙ কেমন ? আপনার মতন ফর্সা ?

আচমকা এমন একটা প্রশ্নে প্রিয়ব্রত বিব্রত বোধ করল।

প্রিয়ব্রতর বিব্রতভাবটা সুমিতার চোখ এড়াল না। সে অন্যদিকে চেয়ে, দোকানের অন্য লোকের কান বাঁচিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, রঙটা জানলে, শাড়ী বাছাই করার সুবিধা হয়।

প্রিয়ব্রত মুচকি হাসল, বলল, রঙ মাঝামাঝি, খুব ফর্সা নয়।

ঠিক আছে, তা হ'লে এই শাড়ীটাতেই মানাবে।

শাড়ীর দাম আঠারো টাকা দিয়ে সুমিতাকে নিয়ে পথে পা দিতেই বিপর্যয়। একেবারে সামনে চিত্তবাবু। হাতে একটা বই। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়ব্রতর সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমা হল। কিছুতেই আর চোখ তুলতে পারল না। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

প্রিয়ব্রতর ধারণা হয়েছিল যে সুমিতা হয়তো চিত্তবাবুকে দেখে নি, কিন্তু সুমিতার কথাতেই তার ভুল ভাঙল।

সি-বি কিন্তু বেশ পড়ান, তবে—

সি-বি? সি-বি কে?

চিত্ত ব্যানার্জী। নতুন যিনি বাঙলা পড়াচ্ছেন, হরকুমার স্যারের জায়গায়।

ও চিত্ত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেলেটিও বড় ভাল। তুমি তবে কি বলছিলে?

বলছিলাম পড়ান ভাল, তবে নিজের কথা বড্ড বেশী বলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াতে পড়াতে নিজের লেখা কবিতাও দু' একটা শুনিয়ে দেন।

সুমিতা হাসল, কিন্তু প্রিয়ব্রত হাসতে পারল না। হঠাৎ সুমিতা যে চিত্তবাবুর কথা বলল, তার মানে লোকটাকে নিশ্চয় তার নজরে পড়েছে। চিত্তবাবু যে ওদের দেখেছে এ বিষয়ে প্রিয়ব্রতর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হয়তো চিত্তবাবু কালই কলেজে কথাটা তুলবে।

সুমিতাও তার অজানা নয়। কি জানি রঙ চঙ বুলিয়ে অলীক এক কাহিনীর সৃষ্টি করবে। সারা অধ্যাপকমহলে চাপা গুঞ্জন শুরু হবে।

কি দাঁড়ালেন কেন? আসবেন না?

সুমিতার কথায় প্রিয়ব্রতর খেয়াল হল। সুমিতাদের বাড়ীর সামনে এসে পোঁচেছে।

আজ থাক সুমিতা, আজ আর যাব না। একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল। চলি।

হন হন করে প্রিয়ব্রত এগিয়ে গেল। একবারও পিছন দিকে না চেয়ে।

সারাটা পথ প্রায় অন্যমনস্ক রইল। ঘরের তালাটা খুলতে গিয়েই মনে হল পিছনে সিঁড়িতে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিঁড়িটা অন্ধকার। বাতিটা দিন দুয়েক খারাপ।

কে?

আমি রত্না।

কিছু বলবে?

আপনার কাছে একটি লোক এসেছিলেন, মস্ত গাড়ীতে চড়ে।

গাড়ীতে চড়ে? প্রিয়ব্রত বিস্মিত হল। গাড়ীতে চড়ে দেখা রতে আসার মতন তার পরিচিত লোক আছে, অনেক ভেবেও ক করতে পারল না।

রত্না সিঁড়ির আর একধাপ নেমে এল।

এই যে একটা কার্ড দিয়ে গেছেন।

হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে প্রিয়ব্রত ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাতি ালল। আভাসে মনে হল, রত্না যেন তখনও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে াছে।

ঝকঝকে আইভরিফিনিশ কার্ড। নাম লেখা প্রবীর রায়। ারপর কতকগুলো ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি। এদেশের আর বিদেশের। াকটিকে প্রিয়ব্রত চিনতে পারল না।

একটু পরেই রত্না এসে আবার ঘরে ঢুকল। পিছনে চাকরের হাতে ভাতের থালা।

আগে প্রিয়ব্রত ওপরে গিয়েই খেয়ে আসত। পতিতপাবনবাবু বাড়ীতে থাকলে দুজনে পাশাপাশি বসত, কিন্তু অফিসের কাজে পতিতপাবনবাবু বাইরে গেলে রত্না প্রিয়ব্রতর খাবার নীচে পাঠিয়ে দিত। মাঝে মাঝে সে-ও নেমে আসত, মাঝে মাঝে আসত না।

আজকাল পতিতপাবনবাবু থাকলেও প্রিয়ব্রত নীচে বসেই খায়। এই অল্পক্ষণের জন্য আবার তাকে তালা লাগিয়ে ওপরে উঠতে হয়। তাছাড়া প্রিয়ব্রতর অনেকদিনের অভ্যাস খেতে খেতে পড়া। খাবার সময়ও একটা বই হাতে থাকে।

ভদ্রলোককে চিনতে পারলেন? রত্না প্রশ্ন করল।

খেতে খেতেই প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়ল, না।

বলে গেছেন আবার কাল আসবেন, একটু রাত করে।

কি দরকার কিছু বললেন?

না, সে আর আমাকে কি বলবেন।

রত্না একটু পরে ওপরে উঠে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে প্রিয়ব্রত নিজের পড়া নিয়ে বসল। যে-ভাবে এগোনো উচিত, পড়াটা মোটেই সে-ভাবে এগোচ্ছে না। শেলীর জন্ম পাশ্চাত্যদেশে হ'লেও, চিন্তায়, দর্শনে তিনি প্রাচ্য-দেশীয়। তাঁর কবিতা, তাঁর জীবনকর্ম বিশ্লেষণ করে এটা দেখানোই প্রিয়ব্রতর উদ্দেশ্য। তাঁর পূর্বসূরী এবং সম-সাময়িক কবিদের সঙ্গে চিন্তাধারা ও কবিমানসে তাঁর অনেক প্রভেদ।

পড়তে পড়তেই চিত্তর কথা মনে হ'ল। সে আর কি দেখেছে কতটুকু দেখেছে। একজন ছাত্রীকে নিয়ে কোন বস্ত্রালয় থেকে শাড়ী কিনে পাশা-পাশি হাঁটছে। এর বেশী তো আর নয়। এটা নিশ্চয় কোন অধ্যাপকের পক্ষে অপরাধজনক কিছু নয়।

অবশ্য যেটুকু দেখেছে, রঙ চড়িয়ে মুখরোচক করার পক্ষে

সেটুকুই যথেষ্ট। ওই শাড়ী যে ছাত্রীর জন্যই কেনা, এমন চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।

বিরক্ত হয়ে প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। দুটো হাত পিছনে রেখে পায়চারি করল কিছুক্ষণ, তারপর টেবিলের ওপর রাখা শাড়ীর মোড়কটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সাবধানে আবরণ খুলে ফেলল। দোকানের চেয়েও প্রিয়ব্রতর স্বল্পআলোকিত ঘরে শাড়ীটা যেন আরো সুন্দর, আরো কমনীয় দেখাচ্ছে। নীলাকে সত্যিই এটাতে মানাবে। সুমিতার পছন্দ আছে।

সুমিতাকেও মানাত। সুমিতার রঙও নীলারই মতন। কিন্তু সুমিতা অনেক লাবণ্যময়ী। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে, মুখের নিটোল গড়নে, অপরূপ দেহছন্দে শেলীর কবিতার মতন। শুধু ছন্দের বৈচিত্র্য নয়, ভাষায় মাধুর্য নয়, ভাবেরও গভীরতা আছে। অতলস্পর্শী দুটি চোখের দিকে চাইলে সে-কথা বোঝা যায়।

প্রিয়ব্রত হতাশ হয়ে তক্তপোষে বসে পড়ল। কোন চিন্তা থেকে কোন চিন্তায় সে এসে পৌঁছল। মনকে সুদৃঢ় না করতে পারলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্যায়, অসুন্দর এক চিন্তা তার সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে থাকবে। এ চিন্তা অধ্যাপকের কাছে পাপ। অন্তত নিজের ছাত্রী সম্বন্ধে।

আবার প্রিয়ব্রত নিজের লেখাপড়ায় মনসংযোগ করল।

পরের দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েই প্রিয়ব্রত গাড়ীর শব্দ শুনল। বড় রাস্তায় ফটকের সামনেই যেন এসে দাঁড়াল।

প্রিয়ব্রতর হাতে একটা বই ছিল, সেটা টেবিলে রেখে সে উৎকর্ণ হয়ে বসল। মনে মনে আর একবার সতীর্থদের মুখ আর নামগুলো স্মরণ করল। প্রবীর রায়কে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ।

উঠে প্রিয়ব্রত দরজাটা খুলে দিল।

দরজার ওপারে নিখুঁত সাহেবীপোশাকপরা একটি ভদ্রলোক। একহাতে সিগারেটের টিন। চেহারা আভিজাত্যের দ্যোতক।

আপনি প্রিয়ব্রতবাবু?

প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়ল।

আমি আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছি।

আসুন। প্রিয়ব্রত একটু পিছিয়ে একটা চেয়ার টেনে দিল।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসল। এদিক ওদিক চেয়ে ঘরের নগ্নতা দেখে বোধ হয় শিউরে উঠল, তারপর সিগারেটে গোটাদুয়েক টান দিয়ে বলল, আমি প্রবীর রায়। কাল সন্ধ্যার দিকে একবার এসেছিলাম, আপনি বাড়ী ছিলেন না।

হ্যাঁ, আপনার কার্ড আমি পেয়েছি।

আর একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত বলল।

আমি গৌরীর দাদা। আপনাদের কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে গৌরী রায়।

জমাট ধোঁয়াটা এতক্ষণ পরে বেশ তরল হয়ে গেল। আর কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন অসুবিধা নয়।

ও, নমস্কার। প্রিয়ব্রত হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

প্রবীর একটা হাত আলগোছে নিজের কপালে ছোঁয়াল।

গৌরীর জন্য একজন 'কোচ'-এর দরকার। বাংলা আর ইতিহাসের জন্য আছে, ইংরাজীর ভারটা আপনাকে নিতে হবে। কবে থেকে যেতে পারবেন বলুন?

প্রিয়ব্রত দুটো হাত জোড় করে এবার বুকে ঠেকাল, মাপ করবেন, আমার নতুন কোন টিউশনি নেওয়া এখন সম্ভব নয়। সপ্তাহের প্রায় প্রত্যেকদিনই আমি ব্যস্ত, তাছাড়া আমি নিজে ডি ফিল-এর জন্য তৈরী হচ্ছি, তার পড়াশোনাও রয়েছে।

প্রবীর দুটো চোখ কুঁচকে প্রিয়ব্রতর দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বোধহয় লোকটার নির্বুদ্ধিতার পরিমাপ করল। তারপর হেসে বলল, সে-সব টিউশনি ছেড়ে দিন স্যর, আর্থিক যা ক্ষতি হবে, এইটেতেই পুষিয়ে দেব।

কথার ভঙ্গীতে প্রিয়ব্রত রীতিমত অপমানিত বোধ করল। একটা কড়া উত্তর মুখে এসেছিল, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার পক্ষে কোন টিউশনি ছাড়া সম্ভব নয়। আপনি বরং অন্য কাউকে দেখুন।

এই আপনার শেষ কথা। চেষ্টা সত্বেও প্রবীরের কণ্ঠ যেন একটু রুক্ষ হয়ে উঠল।

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু এগিয়ে এসে হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করল।

দামী জুতোর কঠিন শব্দটা গলিতে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রিয়ব্রত তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ীর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। যান্ত্রিক গর্জন।

আস্তে আস্তে প্রিয়ব্রত তক্তপোষে এসে বসল, একহাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে। কপালের দু' পাশের শিরা দুটো দপ দপ করছে। দু' চোখে অসহ্য জ্বালা।

এর কি অর্থ হতে পারে!

সুমিতা নিশ্চয় সহপাঠিনীদের বলেছে যে প্রিয়ব্রত তাকে পড়ায়। সেইজন্যই গৌরী সাহস পেয়ে দাদাকে পাঠিয়েছে। বেশী টাকার টোপ ফেলে। অন্য আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেবে গ্লানিকর এই ইঙ্গিতের একটাই অর্থ হয়। কত টাকা আর দেয় সুমিতারা। কতটুকু ওদের সাধ্য!

কিন্তু যদি শোনে প্রিয়ব্রত একেবারে বিনা দর্শনীতে সুমিতাকে পড়ায়, তাহলে? তাহলে গৌরী বোধ হয় রাগে ক্ষোভে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।

শনিবার রাত্রে প্রিয়ব্রত দেশে রওনা হল। সুটকেশের একেবারে তলার দিকে শাড়ীটা রাখল। তাছাড়া ভাইয়ের জন্যও টুকিটাকি কিছু কিনল।

গ্রামের স্টেশনে যখন নামল তখন রাত সাড়ে আটটা। কলকাতায় সন্ধ্যা, কিন্তু গ্রামের পক্ষে বেশ রাত।

প্রিয়ব্রত একা নয়, সঙ্গে আরও অনেকে নামল। এরা প্রত্যেক শনিবারই দেশে আসে। দুটো রাত বাড়ীতে কাটিয়ে সোমবার ভোরে কর্মস্থলে ফিরে যায়। সকলের হাতেই পোঁটলা।

প্রিয়ব্রত যে আসবে এ খবর বাড়ীতে দিয়েছিল। দূর থেকেই দেখতে পেল রোয়াকে লণ্ঠনের ম্লান দীপ্তি। তার মানে মা অপেক্ষা করছে।

কাছে গিয়ে দেখল শুধু মা নয়, পাশে নীলাও বসে আছে। নীলার দিকে চাইলেই প্রিয়ব্রতর যেন বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে। প্রায় মাসে মাসে প্রিয়ব্রত আসে, ওর মনে হয় ত্রিশদিন অন্তরই যেন মেয়েটা বেড়ে চলেছে।

প্রণামের পালা শেষ হল। খাওয়া দাওয়া চুকল।

প্রিয়ব্রত শুতে যাবার আয়োজন করতে গিয়েই দেখতে পেল চৌকাঠের ওপর মা দাঁড়িয়ে। অবশ্য এ সময়টা মা এসে দাঁড়ায়। প্রিয়ব্রতর যদি কিছু দরকার লাগে।

প্রিয়ব্রত ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, নীলা শুয়ে পড়েছে ?

কেন রে ? মার কণ্ঠ যেন স্বাভাবিক নয়।

ঠিক আছে, কাল সকালেই ওকে শাড়ীটা দেব।

কিসের শাড়ী ? মা আরো কয়েক পা এগিয়ে এল।

একটা ছাপা শাড়ী চেয়েছিল আমার কাছে। জিনিসপত্রের আজকাল যা দাম হয়েছে।

এবার মা একেবারে তক্তপোষের ওপর বসল। গম্ভীর গলায় বলল, তোর সঙ্গে কথা আছে প্রিয়। দরজাটা বন্ধ করে দে।

কথা মার প্রত্যেকবারই থাকে। সংসারের হাজার অভাব অনটনের কথা। কি করে সামান্য ক্ষীণবল রজ্জু দিয়ে গোটা সংসারটা বাঁধবে তারই সমস্যা।

কিন্তু তবু মার আজকের কণ্ঠস্বর প্রিয়ব্রতর কানে যেন বড় কঠিন ঠেকল।

তোকে শাড়ী আনতে লিখেছিল নীলা? মা পুনরুক্তি করল। সহজ কথাটা বুঝতে যেন তার অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে।

প্রিয়ব্রত হাসল, তাতে আর কি হয়েছে। আর কার কাছে চাইবে বল? ওর চাইবার আর কে আছে?

প্রিয়ব্রত ভেবেছিল ব্যাপারটা কোমল করে দিলে মার হৃদয় একটু দ্রব হবে। কোন কারণে নীলার ওপর যদি চটেও থাকে, সেটা ভুলে যাবে।

কিন্তু ফল হল বিপরীত।

কম্পিত অথচ কঠোর কণ্ঠে মা বললে, সব কাজ ফেলে তুই নীলার বিয়ের একটা সম্বন্ধ দেখ, প্রিয়।

প্রিয়ব্রত প্রমাদ গনল। চাপা গলায় বলল, কি ব্যাপার বলতো মা?

নীলার রকম সকম আমার ভাল লাগছে না। গরীবের সংসার, কি ভাবে চলছে সেটা বোঝবার মতন বয়স হয়েছে। অথচ দিনরাত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যের লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি।

তুমি শাসন কর না কেন, মা?

আমায় কত গ্রাহ্য করে। মেয়ের কত গুণ। একটা কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দেয়। কেবল সাজগোজের দিকে নজর। সকালের শাড়ী বিকালে পরবে না। তোকে চুপি চুপি ফ্যাশানের শাড়ী আনতে লিখেছে, আমায় কিছু জানায় নি। এত বড় মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার পোষাবে না। তুই ওর জন্য একটা সম্বন্ধ দেখ প্রিয়।

সম্বন্ধ দেখা কি এত সোজা মা। ভাল পাত্র বাঁধবার মতন রুপোর দড়ি কই আমাদের।

ভাল পাত্রে আর দরকার নেই। স্বজাত হয়, দু' বেলা দু' মুঠো আনে এই হ'লেই যথেষ্ট। নইলে কোনদিন কি কেলেঙ্কারি করে বসবে, ভগবান জানেন!

মা আর দাঁড়াল না। দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। যেটুকু বলে গেল সারারাত প্রিয়ব্রতর নিদ্রা দূর করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রিয়ব্রত বিছানায় এ পাশ ও পাশ করতে করতে প্রতিজ্ঞা করল, যেমন করেই হোক নীলার একটা পাত্র দেখতেই হবে।

পরের দিন প্রিয়ব্রতর গম্ভীর মুখ দেখে নীলা আর ধারে কাছে এগোল না। শাড়ীর কথা তো বলতেই পারল না।

শাড়ীটা প্রিয়ব্রত মার হাতে তুলে দিল।

সকালের দিকে প্রিয়ব্রত দেবব্রতকে পাকড়াও করল। দেবব্রত-ও দাদার ধারে কাছে আসে না। দূরে দূরে বেড়ায়।

তারপর দেবুবাবু, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

দেবব্রত মাথা চুলকাল, ওই হ'চ্ছে এক রকম।

এক রকম হ'লে তো হবে না, বেশ ভাল রকম করতে হবে। ভাল না হ'তে পারলে দুনিয়ায় ঠাঁই নেই। মাঝারিরা একেবারে অপাংক্তেয়। মন দিয়ে লেখাপড়া কর, বুঝলে?

দেবব্রত বুঝল। পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে উঠান থেকে সরে পড়ল।

কাউকে কিছু বলবার, প্রিয়ব্রত মন থেকে যেন জোর পায় না। নিজের এম-এ পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার পর থেকে কেমন একটু মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।, তার মনে হয়, কাউকে সদোপদেশ দেবার এক্তিয়ার তার নেই।

পরের দিন দুপুরে যা কিছু কথা হ'ল মার সঙ্গে। নীলার একবার খোঁজ করেছিল, দেখা পায় নি। মার কাছে শুনল, নীলা

রবিবার দুপুরে কোথায় নারী-মঙ্গল সমিতির ক্লাশে যায়। সেখানে সেলাই ফোঁড়াই, চামড়ার কাজ আরো কি সব শেখানো হয়।

বিকেলের গাড়ীতে প্রিয়ব্রত রওনা হ'ল। কাল ভোরে টিউশনি আছে।

রাস্তায় কিছুটা গিয়েই প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়াল। কে যেন দাদা বলে ডাকল।

একটু দাঁড়াতেই নজরে পড়ল। পথের বাঁকে দেবব্রতকে দেখা গেল। সে জোরে জোরে পা চালিয়ে আসছে।

কিরে?

দাও তোমার পোঁটলাটা দাও আমাকে।

দেবব্রত প্রিয়ব্রতর হাত থেকে পোঁটলাটা নিজের হাতে নিল। প্রত্যেকবারই আসবার সময় এই রকম একটা পোঁটলা প্রিয়ব্রতর সঙ্গি হয়। শাকপাতা থেকে শুরু করে মার তৈরি নারকেল নাড়ু, মুড়ির মোয়া, পাটালি সব কিছু থাকে। মাঝে মাঝে নানা রকমের বড়িও মা দেয়। আহা বিদেশে কি কষ্টেই ছেলেটা থাকে!

দুই ভাই পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করল।

দেবব্রতই প্রথম কথা বলল, তুমি তো ঘর থেকে বেরই হও না দাদা, ঘুরে ঘুরে দেখোও না গ্রামটা।

কেন দেখবার মতন গ্রামে কি হল?

দাদার অজ্ঞতায় দেবব্রত বিস্মিত হল, বা, সাগরদীঘির পশ্চিম দিকে কি কাণ্ড হচ্ছে জান না?

কি কাণ্ড হচ্ছে?

বিরাট একটা পাখার কারখানা হচ্ছে। রোজ লরী করে সব যন্ত্রপাতি আসছে, বিরাট টিনের চালা তৈরী হয়ে গেছে। একদল জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ঘোরাঘুরি করে। জানো, ওই কারখানাটা হয়ে গেলে এখানকার খুব উন্নতি হবে!

কি রকম?

প্রিয়ব্রতর মনে গোল্ডস্মিথের Deserted Village-এর কয়েকটা লাইন ভেসে উঠল। শিল্প-বিপ্লবের মুখোমুখি গ্রামীন জীবনের অবলুপ্তির ইতিকথা।

অনেকেরই ওই কারখানায় চাকরি হয়ে যাবে। মালিক বলেছে এখানকার লোকদেরই আগে কাজে নেবে।

দূরের তাল নারিকেলের ঘন সন্নিবদ্ধ পাতার আড়ালে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল। ট্রেন আসছে। যে দু' একজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মের ওপর অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল, তারা সচেতন হয়ে উঠল। নিজেদের জিনিসপত্র সামলে দাঁড়িয়ে উঠল সবাই।

প্রিয়ব্রত দেবব্রতর কাঁধে একটা হাত রাখল, দেবু, যেমন করেই হোক, আমাদের মানুষ হতেই হবে। মার দুঃখ ঘোচাতে হবে, সংসারের দুঃখ ঘোচাতে হবে। আমাদের বাবা দেবোপম চরিত্রের লোক ছিলেন। আমাদের তাঁর মতন হতে হবে। এছাড়া অন্য চিন্তা আমাদের থাকতে নেই।

ট্রেনে উঠে বসে প্রিয়ব্রতর প্রথম মনে হল অযথা এত উপদেশ দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা বোধহয় অধ্যাপনারই দোষ। কথায় কথায় নীতিকথা বিলানো। সৎ হও, সুন্দর হও, প্রতিষ্ঠিত হও।

সাহস হয় না প্রিয়ব্রতর। মাকে আর নীলাকে এভাবে ফেলে রেখে দেবব্রতকে তার নিজের কাছে নিয়ে যেতে। নইলে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, নিজের তাঁবে, নিজের চোখের সামনে রেখে ভাইটাকে মানুষ করবে।

নীলার কথা প্রিয়ব্রত খুব বেশী ভাবল না। মাকে সে ভাল করেই চেনে। নিজে যেভাবে মানুষ হয়েছে অন্তঃপুরের চৌহদ্দির মধ্যে, মেয়েকেও সেই ভাবে মানুষ করতে চায়। কিন্তু তা কি সম্ভব। আজকালকার মেয়েরা অনেক এগিয়েছে। অবরুদ্ধ জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে তাদের। একটু বাইরে বের হবে, সমবয়সী দু'

একজনের সঙ্গে কথাও বলবে, তাতে পাপ হয় না, অপরাধ হয় না। কিন্তু এই সামান্য বেচালটুকুও মার চোখে অসহ্য।

পরের দিন কলেজে গিয়েই প্রথমে চিত্তর সঙ্গে দেখা হল।

তার অভিযোগ ছিল।

আপনার একটা দেশ আছে, তাতো বলেন নি?

প্রিয়ব্রত চমকে উঠল। দেশ একটা ছিল, এখন আর কিছু নেই। প্রিয়ব্রতকে লেখাপড়া শেখানোর খেসারত দিতে সব গেছে। কিন্তু চিত্তর মুখে একথা কেন?

কি হল?

না হয় নি কিছু। শনিবার বিকেলে মেসে বসে বসে একলা ভাল লাগছিল না, তাই ভাবলাম আপনার কাছে চলে যাই। সঙ্গে অবশ্য কবিতার খাতাটাও নিয়ে গিয়েছিলাম। বিধি বাম। গিয়ে শুনলাম আপনি দেশে গেছেন, রবিবার রাত্রে ফিরবেন।

তাহলে ফাঁড়া গেছে বল চিত্ত?

কেন ফাঁড়া কেন?

থাকলে বসে বসে এই দারুণ গ্রীষ্মে তোমার বসন্তের কবিতা শুনতে হত। কবিদের তো সময় অসময় নেই। ভাব এলেই হল।

চিত্ত হেসে উঠল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, সত্যি দেশে গিয়েছিলেন? ওপরের ভাড়াটে একটি মহিলা বললেন।

মূর্খ, উনি ভাড়াটে নন, বাড়ীওয়ালার মেয়ে। ওঁরই আশ্রয়ে আছি।

হাত দিয়ে চিত্ত নিজের নাক কান স্পর্শ করল, অপরাধ হয়ে গেছে প্রিয়দা, জানতাম না।

প্রিয়ব্রত ছাতিটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখে বলল, দেশ ঠিক নয়, বাবা চাকরি করতেন মুক্তিগড়ে, সেখানেই একটু ভদ্রাসন করে গেছেন। মা, বোন আর ভাই থাকে। তাদের এখানে

আনবার সামর্থ নেই, তাই মাঝে মাঝে আমি গিয়ে দেখে আসি।

সেটাই তো দেশ। শহরের চড়া রোদ থেকে তবু একটা দিন গাছের ছায়ায় কাটিয়ে আসেন।

তোমার দেশ কোথায় চিত্ত ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তর সারা মুখ পাংশু, বেদনার্দ্র হয়ে উঠল। দুটি চোখ ছল ছল। কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিতে পারল না। তারপর আবেগ একটু সংযত করে বলল, আমার দেশ নেই প্রিয়দা। আমাদের এখন ইহুদীদের অবস্থা। যাযাবরের মতন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হবে। যেটা একদিন আমাদের দেশ ছিল, আমাদের সাতপুরুষের ভিটে, কার পাপে জানি না, সে ভূমি এখন পররাষ্ট্র কবলিত। তার নামও মুছে ফেলা হয়েছে।

আশ্চর্য, চিত্তর ব্যথিত করুণ মুখের দিকে চেয়েই প্রিয়ব্রতর কথাটা মনে পড়ে গেল।

নীলার সঙ্গে চিত্তর একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না ? এবার যখন প্রিয়ব্রত দেশে যাবে তখন চিত্তকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বলবে, একটা দেশ হারিয়েছে, এটাকেই নতুন দেশ করে নাও।

পাত্র হিসাবে চিত্ত হয়তো খুব লোভনীয় নয়। সবে চাকরিতে ঢুকেছে। তাও বেসরকারি কলেজ। প্রিয়ব্রতর তবু চোখের সামনে ডি ফিলের রঙীন একটা ফানুস দুলছে। একদিন করায়ত্ত হলে, উন্নতির আশা আছে। তবে চিত্তর টিউশনি আছে, বড় হবার আকাঙ্খা আছে। সব চেয়ে বড় কথা, অর্থলোলুপ অভিভাবক নেই। এর চেয়ে ভাল পাত্র নীলার পক্ষে আশা করা যায় না।

ঠিক আছে চিত্ত, এবার যখন দেশে যাব, তোমাকে আগে থেকে বলে রাখব, তুমি সঙ্গে যেও।

চিত্তর আর উত্তর দেবার অবকাশ হল না। তার আগেই ঘন্টা বেজে উঠল।

পড়া শুরু হবার আগেই প্রিয়ব্রত কথাটা বলল। সুমিতা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। মনীশ এসে বেরিয়ে গেছে। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করে গেছে।

সুমিতা।

স্যর। প্রিয়ব্রতর আচমকা কণ্ঠস্বরে সুমিতা চমকে উঠল।

আমি তোমাকে পড়াতে আসি একথা কি তুমি কাউকে বলেছ? ক্লাশের কোন মেয়েকে?

নাতো। সুমিতা ঘাড় নাড়ল।

কিন্তু কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে।

জানাজানি হয়ে গেছে? সুমিতার ছু' চোখে শঙ্কার ছায়া।

হ্যাঁ, গৌরী রায়ের ভাই আমার বাসায় গিয়েছিলেন তাঁর বোনকে পড়াতে পারব কিনা জিজ্ঞাসা করতে। অবশ্য তিনি তোমার কথা কিছু উল্লেখ করেন নি, কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে যা বললেন, তাতে মনে হল আমি যে তোমাকে পড়াই সেটা গৌরীর অজানা নেই।

সুমিতা কোন উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে রইল।

কি, তুমি বলেছ কাউকে?

সুমিতা মুখ তুলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যর। একদিন ভুলে বাড়ীর খাতাটা বইয়ের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার একটা লেখা আপনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন, সেটা ইরার চোখে পড়েছিল।

ইরা কে?

ওই যে রোগা মতন মেয়েটি গৌরীর পাশে বসে।

তাহলে সম্ভবতঃ ইরাই গৌরীকে বলে থাকবে। খুব মৃদুকণ্ঠে প্রায় স্বগতোক্তি করল প্রিয়ব্রত।

আমার অন্যায় হয়ে গেছে স্যর। আমি ভবিষ্যতে খুব সাবধান হব।

সুমিতার ভীত সন্ত্রস্তভাব দেখে প্রিয়ব্রত হেসে ফেলল, না, না, ন্যায় অন্যায়ের কি আছে। তোমাকে পড়ানো নিশ্চয় পাপ কাজ নয়। আমি কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম কারণ জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই হয়তো পড়তে চাইবে।

একটু পরে, পরিস্থিতি শান্ত হলে সুমিতা প্রশ্ন করল, আপনি গৌরীকেও পড়াচ্ছেন স্যর ?

না, না, আমার সময় কোথায়! এতেই আমার নিজের কাজ হচ্ছে না। থিসিসটা শেষই করতে পারছি না, অথচ ওই থিসিসটার ওপর আমার সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

বিড় বিড় করে সুমিতা বলল, আপনার ভবিষ্যত!

হাত তুলে প্রিয়ব্রত তাকে থামিয়ে দিল, ব্যস, আর নয়, আজ অনেক বাজে কথা হয়েছে। বই খোল।

প্রিয়ব্রত গম্ভীর গলায় শুরু করল।

কবিতাটির নাম, ব্রেক, ব্রেক, ব্রেক। কবির বন্ধু আর্থার হেনরি হালামের মৃত্যুর ন' বছর পরে এই কবিতাটি রচিত হয়। এটি একটি শোকগাথা বলে উল্লিখিত হলেও নিছক বেদনা আর হতাশায় এর পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যুর প্রতি বিয়োগ-গাথা নয়, এটি জীবনস্তোত্র। শুধু আর্থার হেনরি হালামের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শোক নিবেদন নয়, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, আশা আগ্রহ—একি তুমি কিছু শুনছ না সুমিতা ?

প্রিয়ব্রত টেবিলের ওপর রাখা সুমিতার একটা হাত ধরে সজোরে নাড়া দিল। সুমিতা অন্যমনস্কই ছিল। জানলার ওপারে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে কি ভাবছিল।

প্রিয়ব্রত তার হাতটা ছুঁতেই সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

সারা শরীরটা শিউরে উঠল থর থর করে তারপর দু' হাতে মুখটা ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হতভম্ব প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, কি হল কি ?

শরীরটা বড় খারাপ লাগছে স্যর। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুমিতা উত্তর দিল।

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, তা হলে আজ আমি যাই। তুমি বিশ্রাম কর।

সুমিতার দিক থেকে কোন উত্তর নেই। চুপচাপ বসে রইল।

একটু অপেক্ষা করে প্রিয়ব্রত বাইরে চলে গেল।

সোজা বাড়ী ফিরল না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াল।

মনে মনে ভাবল, কি হল কি সুমিতার ? এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়বার মতন কি এমন ঘটল !

সুমিতার হাত ছুঁয়ে কি অন্যায় করেছে প্রিয়ব্রত ? কিন্তু ঈশ্বর জানেন তার মনে কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না। শুধু অন্যমনস্ক ছাত্রীকে সচেতন করে দেবার জন্যই সে তার হাতটা ধরেছিল।

মুহূর্তের জন্য হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখেছিল, কিন্তু নিজের দেহ মনও যে একটুও বিচলিত হয় নি, এমন কথা প্রিয়ব্রতও হলফ করে বলতে পারবে না। বিদ্যুৎদাহের মতন একটা জ্বালা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আঙুলের প্রান্তগুলো কেঁপে উঠেছিল। তেমনই একটা অনুভূতি কি সুমিতারও হয়েছিল ?

এর আগে এ ভাবে যৌবনবতী মেয়েদের প্রিয়ব্রত কোনদিন অঙ্গস্পর্শ করে নি। এই প্রথম। এত জ্বালা, এত দাহ, তবু সব কিছুর অন্তরালে মধুর একটা স্বাদও রয়েছে। যে স্বাদ অনির্বচনীয়, তুলনারহিত।

ইট কাঠ লোহার ঘনিষ্ঠ অভিসন্ধি। কোথাও একটু শ্যামলতার

আভাস পর্যন্ত নেই। অগণিত জনস্রোত সূর্যের প্রখর কিরণপাত থেকে শুরু করে রজনীর মধ্যযাম অবধি।

জব চার্নকের ডোবা জঙ্গল চালাঘর সমাকীর্ণ জায়গাটার এমন একটা দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন যেন আশা করা যায় না। পাশাপাশি প্রসার লাভ করার অসুবিধা, তাই উদ্ধত অট্টালিকার পর অট্টালিকা উঠেছে আকাশকে লেহন করার স্পর্ধা নিয়ে। ছোট ছোট কোটরে মানুষ এখনও তার পুরনো হিংসা, পাপ, ঈর্ষা, দ্বেষ নিয়ে জীবিকা অর্জনের নামে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

শহর বদলেছে, মানুষ বদলায় নি।

এই জনাকীর্ণ শব্দ-সর্বস্ব শহরের রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিচিত্র সব চিন্তা প্রিয়ব্রতর মনে উদয় হয়।

শহর নির্মম ভাবে গ্রামকে গ্রাস করে চলেছে। রুক্ষতা কুক্ষিগত করেছে সজীবতাকে।

চলতে চলতেই প্রিয়ব্রতর আর একটা কথা মনে পড়ল।

আজ সন্ধ্যাটা তার নিজস্ব। টিউশনির ভার নেই। সপ্তাহে যে কটা দিন মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়, আজ তার একটি দিন।

টিউশনি দুটি, কিন্তু দুটি টিউশনিতে পার্থক্য আকাশ আর পাতালের।

একটি ধনীর সন্তান। আজন্ম সযত্ন-লালিত। দুঃখের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। পড়াশোনাটা যেন বিলাসের পর্যায়ের। শুধু সময় নষ্ট করার অছিলা। বাপ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। চেষ্টায় আছেন, সুযোগ-সুবিধা পেলেই ছেলেকে একটা মানানসই পদে বসিয়ে দেবেন। সেটা না হওয়া পর্যন্ত ছেলে পড়ুক।

বার দুয়েকের চেষ্টায় ছেলে বি-এ পাশ করেছে তাও একেবারে কোণ ঘেঁষে। প্রায় অধ্যাপকদের হাত ধরে। দুটো বছর কাটাবার জন্য ছেলে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হ'ল। অধমতারণ

গৃহশিক্ষক প্রিয়ব্রত। ভাষার প্রতি একটু মমতাবোধ নেই, কোন আকর্ষণ নেই। ফলে, প্রিয়ব্রত পড়ায়, ছাত্র পড়ে। এর বেশী আর কেউ অগ্রসর হ'তে পারেনি।

আর একটা টিউশনি, সে টিউশনির কথা মনে হ'তেই প্রিয়ব্রত একটু আরক্ত হয়ে উঠল। এ টিউশনি অর্থবহ নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের। প্রিয়ব্রতর পক্ষে এ বিলাসিতা অর্থহীন। তবু এখানে যেতে-আসতে প্রিয়ব্রত ভাল লাগে।

তার কারণ কি প্রিয়ব্রত? এটি ছাত্রী, সেইজন্যই কি?

মনে মনে প্রিয়ব্রত নিজেকে প্রশ্ন করল। প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থে নিজেই শিউরে উঠল।

এদিক-ওদিক চেয়ে রাস্তা পার হ'ল।

নিজেই উত্তর দিল। না, সে জন্য নয়। মেয়েকলেজে প্রিয়ব্রত অধ্যাপনা করে, কাজেই ছাত্রী পড়ান তার অদৃষ্টের লিখন। তৃপ্তি ছাত্রীর অধ্যয়ন নিষ্ঠা দেখে, তার গ্রহণ ক্ষমতা দেখে।

শান্ত, সমাহিত চিত্ত শুমিতা তুলনা-রহিত। কি কলেজে, কি বাড়ীতে। যতটুকু দেয় প্রিয়ব্রত অতি নিষ্ঠাভরে অঞ্জলি পেতে সে গ্রহণ করে।

অনেকখানি সবুজের বিস্তার। ইঁট, কাঠ লোহার হাত থেকে অব্যাহতি।

প্রিয়ব্রত ময়দানে নেমে পড়ল। কোনাকুনি পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। এখানে ওখানে কিছু কিছু লোকের জটলা। বেশীর ভাগই অন্য প্রদেশের।

প্রিয়ব্রত আরো এগিয়ে চলল।

এখান থেকে সার সার জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। নানা দেশের পতাকা উড়ছে বাতাসে।

প্রিয়ব্রত হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল।

এখানে কিছু ভিড় রয়েছে। স্বাস্থ্যান্বেষী নরনারীর দল।

জেটির কোণে কোণে কিশোর-কিশোরী গোপন সান্নিধ্য খোঁজায় মগ্ন।

নমস্কার স্যার।

নারীকণ্ঠে প্রিয়ব্রত চমকে মুখ ফেরাল।

জেটির ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের ধূম্রকলঙ্কিত আকাশের দিকে চেয়েছিল। অস্তসূর্যের স্পর্শে আকাশে একটা বিষণ্ণ আভা।

প্রিয়ব্রত একটু অন্যমনস্কই ছিল, তাই এ ধরণের সম্বোধনে প্রথমে একটু চমকে উঠেছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়েই আশ্চর্য হ'ল।

ঠিক সামনে হাতজোড় করে গৌরী রায়। তার পিছনে আরও গুটি কয়েক মেয়ে। তাদের মুখগুলোও খুব চেনা চেনা মনে হ'ল। সম্ভবত তারা গৌরীর সহ-পাঠিনী।

আপনি এখানে রোজ আসেন স্যার ?

গৌরী প্রশ্ন করল।

এই মুখরা মেয়েটিকে প্রিয়ব্রত মনে মনে বেশ ভয় করে। স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান নেই। লঘুগুরু মানে না।

হাসবার ভান করে প্রিয়ব্রত বলল, রোজ এতদূরে আসা কি আর সম্ভব। কলেজের পর টিউশনি করতে হয়।

কথাটা বলেই প্রিয়ব্রত সামলে নিল। এখনই হয়তো গৌরী জিজ্ঞাসা করে বসবে, কটা টিউশনি করেন ? কোথায়, কোথায় ?

সুস্মিতাকে যে প্রিয়ব্রত পড়ায় এটা তার মুখ থেকে জানাজানি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা'হলে ক্লাসে চাপা হাসির ঢেউ উঠবে। বাঁকা চাউনি আর গা টেপাটেপি। সুস্মিতা বেচারির হেনস্তার অবধি থাকবে না।

তার ওপর একথাটা যদি মেয়েদের কানে আসে যে এই বিদ্যাদানের জন্য প্রিয়ব্রত কোন কাঞ্চনমুদ্রা নিচ্ছে না, তা'হলে

শুধু ক্লাসে নয়, সারা কলেজে হৈ চৈ পড়ে যাবে। সব কিছুর কদর্থ করবে। টিটকারিতে কান পাতাই দুষ্কর হবে।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, তোমরা বুঝি মাঝে মাঝে আস এখানে? গঙ্গার ধারে?

এবারেও গৌরী কথা বলল। গৌরী দলে থাকলে অন্য মেয়েরা কথা বলার সুযোগই পায় না।

না স্যার, আমাদের এদিকে আসা হয়ে ওঠে না। ছুটির দিন আমি কোন সিনেমা হলে গিয়ে বসে থাকি।

এটা প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করেছে, গৌরীর মনে কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। কতটুকু বলবে আর কতটুকু ঢাকবে সে চিন্তাও করে না। যা মনে আসে তাই বলে।

সিনেমা যাওয়াটা একটা মারাত্মক অপরাধ নয়, কিন্তু অন্য মেয়ে হলে এমন নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলতে পারত না।

আজ স্যার রমার গান আছে রেডিয়োতে। তাই আমরা সঙ্গে এসেছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী হাত দিয়ে কৃষ্ণা লাজুক একটি তরুণীকে দেখিয়ে দিল।

এ মেয়েটিকে ক্লাসে দেখেছে কি না প্রিয়ব্রত মনে করতে পারল না। হয়তো দেখেছে, হয়তো দেখেনি। মোট কথা, কতকগুলো মেয়ে রূপে, গুণে, মেধায়, আচরণে এত সাধারণ স্তরের যে তারা সকলের মধ্যে মিশে থাকে। তাদের আলাদা করে চেনা যায় না।

কিছু একটা বলা উচিত সেই ভাবেই প্রিয়ব্রত বলল, তুমি ভাল গান কর বুঝি?

কথাটা বলেই প্রশ্নের অযৌক্তিকতাটা প্রকট হয়ে উঠল। ভাল না গাইলে আর বেতার থেকে ডাক আসবে কেন?

কথাটা একটু ঘুরিয়ে প্রিয়ব্রত আবার জিজ্ঞাসা করল, কি গান গাও তুমি? রবীন্দ্র সঙ্গীত?

না, আধুনিক। রমা খুব কোমল কণ্ঠে উত্তর দিল।

ইতিমধ্যে গৌরী এক কাণ্ড করল।

হাতছানি দিয়ে এক মাঝিকে ডাকল। মাঝি নৌকা নিয়ে জেটির কাছেই ঘুরছিল, ইঙ্গিত মাত্রই নৌকা জেটি বরাবর নিয়ে এল।

আসুন দিদিমণি, বেশ ফুর ফুরে হাওয়া আছে। একটু পরেই চাঁদ উঠবে।

মাঝির বলার ভঙ্গীতে মেয়ের দল আরক্ত হয়ে উঠল। প্রিয়ব্রত অস্বস্তি বোধ করল।

চলুন স্যার, একটু ঘুরে আসি।

গৌরী শাড়ী সামলে ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকার ওপর। যৌবনের ভারে নৌকা টলমল করে উঠল।

আর একটি মেয়ে, নাম বুঝি মাধবী। সেও নৌকায় গিয়ে উঠল। তবে খুব সাবধানে পা ফেলে। গৌরীর মতন লাফালাফি করে নয়।

প্রিয়ব্রত চিন্তায় পড়ল।

ছাত্রীদের সঙ্গে এক নৌকায় একটু বেড়ালে অধ্যাপকের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে, গ্লানিকর কিছু হতে পারে, এমন চিন্তা এ যুগে কেউ করে না। বিশেষ করে মেয়ের সংখ্যা যখন একাধিক।

তবু কোথায় একটু অসুবিধাও ছিল। অন্য কেউ দেখতে পেলে এ জলবিহারকে সহজভাবে নাও নিতে পারে। চড়া রং ফলিয়ে সম্পূর্ণ অন্যরূপ দেবে। অধ্যাপক আর ছাত্রীদের দেখা হওয়াটা যে আকস্মিক, তাও মানতে চাইবে না।

অথচ এ ভাবে এড়িয়ে যাওয়াটাও ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

প্রিয়ব্রত রমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যাবে না?

রমা ঘাড় নাড়ল, না, আমি সাঁতার জানি না।

সাঁতার তো আমিও জানি না। প্রিয়ব্রত হাসল।

ভীরু চোখ দুটি তুলে রমা চেয়ে দেখল। তার উত্তর করুণ দৃষ্টিতেই ফুটে উঠল।

স্যার, আসুন।

গৌরী আবার তাড়া দিল।

প্রিয়ব্রত জলের দিকে চেয়ে দেখল। একটু দূরে একটা স্টিমার চলেছে। অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গে গঙ্গা উচ্ছল, কলনাদিনী। ঢেউয়ের দোলায় নৌকা নাচছে। গৌরী আর মাধবী পাটাতনের ওপর পাশাপাশি বসেছে।

প্রিয়ব্রত রমার দিকে একবার চেয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে নৌকার ওপর গিয়ে উঠল।

একেবারে এদিকের কাঠের ওপর প্রিয়ব্রত বসল।

মাঝি জলে দাঁড় ডোবাল। তারপর আস্তে আস্তে নৌকার মুখ ঘুরল। জল কেটে কেটে রাজহংসীর মতন স্বচ্ছন্দ গতিতে নৌকা মাঝগঙ্গার দিকে চলতে শুরু করল।

রমা আসবে না আমরা জানতাম স্যার।

চারদিকে ঢেউয়ের কলরোল, তাই গৌরীকে গলা চড়াতে হ'ল।

বলছিল সাঁতার জানে না।

প্রিয়ব্রত ঘোলা জলের আবর্তের দিকে চোখ রেখে বলল।

না, না, সে জন্যে নয়, গৌরী আর মাধবী দুজনেই হেসে উঠল।

তবে? বিস্মিত প্রিয়ব্রত এবার ওদের দিকে দেখল।

গৌরী বলল, রমার বিয়ের ঠিক হয়েছে সামনের মাসে, তাই ওর প্রাণের মায়া খুব বেড়ে গেছে। বুঝলেন স্যার?

প্রিয়ব্রত বুঝল। কিন্তু আর মাথা তুলল না।

গৌরীর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

নৌকা প্রায় মাঝ নদীতে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু অন্তর্হিত। নৌকার খোলে, জাহাজের কেবিনে কেবিনে আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোর হাজার প্রতিবিম্ব তরঙ্গের শিখরে শিখরে।

সুমিতা কোথাও বের হয় না স্যার, আমরা অনেক বলেছি।

প্রিয়ব্রত চমকে গৌরীর মুখের দিকে চোখ ফেরাল। এক দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে গৌরী জলের মধ্যে হাত ডোবাচ্ছে। অঞ্জলি ভরে জল তুলছে আর ফেলছে।

একথা কেন বলল গৌরী? সুমিতার আসা-না-আসার সঙ্গে প্রিয়ব্রতর কি সম্পর্ক।

মেয়েদের চোখ ভুল দেখে না। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে কোন রকম অন্যায় পক্ষপাতিত্ব কি লক্ষ্য করেছে? অসংযত দৃষ্টি বার বার গিয়ে পড়েছে আবেগটলমল দুটি চোখের দিকে? জ্ঞানত প্রিয়ব্রত এমন পাপ করে নি।

ঝুঁকবেন না দিদিমণি, নৌকা বেসামাল হয়ে যাবে।

মাঝির সতর্কবাণী শোনা গেল।

এ সতর্কবাণী বুঝি শুধু গৌরীকেই নয়। এভাবে এই চটুল, প্রগলভা তরুণীর সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে, সকলের পক্ষেই ভরাডুবি হওয়া আশ্চর্য নয়।

নৌকা ফেরাও মাঝি, আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

প্রয়োজনের চেয়েও গলার স্বর প্রিয়ব্রত গম্ভীর করল।

গৌরী আর মাধবী ফিসফিস করে কি বলল। হাসা-হাসি করল দুজনে।

কি বলল তার একটি বর্ণও কানে গেল না প্রিয়ব্রতর। যাবার কথাও নয়, কিন্তু সন্দিগ্ধ মন অনেক কিছু কল্পনা করে নিল।

হয়তো গৌরী মাধবীর কানে কানে এমন একটা কথাই বলে থাকবে। সুমিতার কথা বলাতে অমনি স্যারের নৌকা ফেরাবার কথা মনে পড়ে গেল। কিংবা আরো কাব্যিক উপমা।

এতক্ষণ অথই জলে ভাসছিলেন স্যার আমাদের সঙ্গে, সুমিতার নাম কানে যেতেই তটভূমির কথা স্মরণে এল। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কথা।

গৌরী আপত্তি করল না। কেবল মাঝি বলল, আর একটু থাকবেন না বাবু? একটু পরেই চাঁদ উঠবে।

এবার গৌরী হাসল না। দুটো হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে নিষ্পলকনেত্রে প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে রইল।

নৌকা ফিরল। অন্য নৌকার ভিড় কাটিয়ে, দাঁড়ের আঘাতে ঢেউগুলো শায়েস্তা করতে করতে।

নৌকা তীরে লাগতে প্রিয়ব্রত আগে নামল। খুব সন্তর্পণে কাদামাটির ওপর পা ফেলে।

একটু ধরবেন স্যার, নৌকাটা ভীষণ দুলছে।

এতটার জন্য প্রিয়ব্রত প্রস্তুত ছিল না। হয়তো আপাত দৃষ্টিতে কথাটা খুবই নিরীহ। সত্যিই নৌকাটা অল্প অল্প দুলছে। গৌরীর হাত ধরে নামিয়ে দিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবার কথা নয়, কিন্তু প্রিয়ব্রত পারল না।

গৌরীর চোখের কোণে বিদ্যুৎ-দাহ, অধরের চাপা-হাসি বাদ সাধল। কিছু বলা যায় না, এইটুক মূলধন করেই গৌরী সারা ক্লাশে হয়তো আলোড়ন তুলবে।

প্রিয়ব্রত একটু পিছিয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, নৌকা এমন কিছু দুলছে না। এত ভয় পেলে চলবে কেন?

তাহ'লে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ি স্যার?

সঙ্গে সঙ্গে গৌরী প্রশ্ন করল।

কি ভেবে প্রশ্ন করল গৌরীই জানে। কিন্তু প্রিয়ব্রতর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল।

প্রিয়ব্রত জেটিতে এসে উঠল। একবার ফিরেও দেখল না পিছন পিছন গৌরী আর মাধবী আসছে কি না।

জেটির এক কোণে রমা দাঁড়িয়েছিল।

প্রিয়ব্রতকে দেখে প্রায় ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, ওরা?

আসছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী আর মাধবী এসে পৌঁছাল।

গৌরী রমাকে জিজ্ঞাসা করল, কিরে, দেরী হয়ে গেছে নাকি?

রমা চোখ কুঁচকে একবার মণিবন্ধে আঁটা ঘড়ির দিকে দেখার চেষ্টা করল, তারপর বলল, এইবার চল আস্তে আস্তে।

এবার গৌরী প্রিয়ব্রতর দিকে ফিরল, আপনিও চলুন না স্যার, আমার সঙ্গে গাড়ী রয়েছে। আপনাকে আপনার বাড়ীতে নামিয়ে দেব। অবশ্য রেডিও স্টেশনে আধঘণ্টা দেরী হবে।

প্রিয়ব্রত হাত নাড়ল, না, না, আমায় এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা।

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখল অন্ধকারে তিনটি ছায়া জেটি পার হয়ে রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই চোখ ধাঁধাঁনো মোটরের হেডলাইটের তীব্র দ্যুতি। হয়তো গৌরীদেরই মোটর, সঠিক কিছু বলা যায় না। এখানে প্রচুর মোটর দাঁড়িয়েছে।

আবার সরে এসে প্রিয়ব্রত জলের ধারে দাঁড়াল।

বোধ হয় জোয়ার আসছে। তরঙ্গের আয়তন আর গর্জন দুই বাড়ছে। প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে তটের বুকে, আবার খল খল হাস্যে ফেনার ফুল ছড়িয়ে সরে যাচ্ছে।

আশ পাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার, বিষণ্ণ আকাশের গায়ে জাহাজের বিরাট বিরাট কাঠামো। মাঝি-মাল্লাদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। দিনের দীপ্তি নিষ্প্রভ। রাত্রি আসছে।

বিচিত্র সব চিন্তা প্রিয়ব্রতকে আচ্ছন্ন করল।

কি হ'ত সুমিতা এখানে এলে। গৌরী আর মাধবীর মতন হয়তো টলমলে নৌকায় চড়ত, কিংবা রমার মতন পারের নিশ্চিন্ত আশ্রয় আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এর বেশী কি আর হ'তে পারত!

গৌরীদের জন্য মুখরোচক এক কাহিনীর সৃষ্টি হ'ত। নিজেদের

মনের রং মিশিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এ কাহিনী তারা সারা ক্লাশে পরিবেষণযোগ্য করে তুলত।

কিন্তু সুমিতা যদি একলা আসত? শহরের ক্লেদ আর আবর্জনা পার হয়ে এই মুক্ত আকাশের তলায়, কল-নাদিনী তটিনীর উপকূলে আলোঅন্ধকারের রোমাঞ্চিত পরিবেশ। আয়ত দুটি চোখে অথই কৌতূহল, দুর্জ্ঞেয় রহস্যের স্বপ্ন নিয়ে।

প্রিয়ব্রত সাবধান হয়ে গেল। এ সে কোথায় নেমে চলেছে? অপবিত্র এক চিন্তা পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে কোন অতলে নামাবার চেষ্টা করছে?

প্রিয়ব্রত অধ্যাপক। প্রিয়ব্রত রুচিবান। সে শিক্ষা বিতরণ করবে, ছাত্রীরা গ্রহণ করবে। পবিত্র এই সম্পর্কের মধ্যে কলুষচিন্তা আসাই অন্যায়, অপরাধ।

পরের দিন ক্লাশে প্রিয়ব্রত খুব সাবধান হয়ে রইল। চোখ তুলে কোন দিকে দেখল না। সারাক্ষণ বইয়ের পাতাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। এমন কি সুইনবার্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময়ও মুখ তুলল না।

বলা যায় না, ক্লশের সব মেয়ের মুখে না হোক, অন্তত গৌরীর পাশাপাশি যারা বসে তাদের মুখে হাসির আভাস দেখা যাবে। গৌরী নিশ্চয় বলেছে অধ্যাপকের সঙ্গে জলবিহারের কথা।

নিজের ওপর প্রিয়ব্রতর রাগ হ'ল। অনায়াসেই গৌরীকে এড়িয়ে যাওয়া যেত। তাই করাই উচিত ছিল। কোন একটা অছিলায় সরে গেলেই হত।

সুইনবার্ণ ছন্দের রাজা। সমালোচকরা বলেন তাঁর কবিতা টাঙিয়ে দোল খাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিচিত্র ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন।

স্যার।

প্রিয়ব্রত থেমে গেল। বাধ্য হয়েই এবার মুখ তুলে দেখতে হল। বিরক্তির আঁচড় মুখে-চোখে ফুটে উঠল।

অন্যদিন হলে প্রিয়ব্রত স্পষ্টই বলত। এভাবে অধ্যাপনার মাঝখানে বাধা দেওয়া অনুচিত, অসৌজন্যের নামান্তর।

কিন্তু আজ কোন রকম মেজাজ দেখাতে তার সাহস হ'ল না।

বিশেষ করে প্রশ্নকর্ত্রী যেখানে গৌরী।

কি বল ?

খুব গম্ভীর গলায় প্রিয়ব্রত প্রশ্ন করল।

সুইনবার্ণের সঙ্গে আমাদের সত্যেন দত্তের তুলনা করা যায় না ?

একেবারে মামুলি প্রশ্ন। বাজারে প্রচলিত নোট বইতে এ ধরনের প্রশ্ন থাকে। সম্ভবত তেমন কোন বই থেকেই গৌরী এ আহরণ করেছে। পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুলভ প্রয়াস।

ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে কিছু মিল হয়তো আছে। দুজনেই নানাপ্রকার ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। অন্য কিছুতে বিশেষ সাদৃশ্য নেই। থাক, এ বিষয়ে অন্য এক সময়ে আলাপ করব। এখন যে কথা বলছিলাম শোন।

প্রিয়ব্রত আবার নিজের বক্তৃতায় ফিরে গেল।

শুরু করার আগে দৃষ্টি নিজের থেকেই সুমিতার দিকে চলে গেল।

একটি হাত গালের ওপর, আর একটি হাতে পেন্সিল। সামনে খোলা খাতা। সুমিতা তন্ময় হয়ে শুনছে। মাঝে মাঝে প্রয়োজন-মত লিখেও নিচ্ছে।

সুমিতা কোন দিন ক্লাশে কোন প্রশ্ন করে না। বাড়ীতেও না। এ নিয়ে প্রিয়ব্রত দু একবার জিজ্ঞাসাও করেছে।

আচ্ছা সুমিতা অন্য মেয়েদের মতন তুমি তো ক্লাশে কোন দিন আমাকে কোন প্রশ্ন কর না ?

লজ্জার ছায়া নেমেছে সুমিতার দুটি চোখে। গণ্ড আরক্তিম হয়ে

উঠেছে। খুব মৃদু কণ্ঠে বলেছে, আমি, আমি আর কি প্রশ্ন করব?

কেন তোমার কোনি জিজ্ঞাসা নেই।

মাথাটা নীচু করে বইয়ের আড়ালে নিজেকে লুকোতে লুকোতে সুমিতা বলেছে, প্রশ্ন করার মতন বিদ্যা আমার কোথায়। আমি কতটুকু বুঝি।

প্রিয়ব্রত আর কিছু বলেনি। বুঝতে পেরেছে অত্যধিক সঙ্কোচের জন্য প্রশ্ন থাকলেও সুমিতা এক ক্লাশ মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে উঠে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। বাড়ীতে পারে না— কারণ সুমিতা জানে প্রিয়ব্রত যে বিদ্যাদান তাকে করে তার জন্য কোন মূল্য গ্রহণ করে না।

কাজেই যতটুকু পায়, ততটুকুই আকণ্ঠ সুমিতা পান করে। প্রশ্ন করে জল ঘোলা করে না। তৃষ্ণার পথে কোন প্রতিবন্ধক তার কাম্য নয়।

প্রিয়ব্রত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

গৌরীর কিছুই অসাধ্য নেই। হয়তো সুমিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলেছে। সব কিছুর ওপর চড়া রংয়ের প্রলেপ দিয়ে। প্রিয়ব্রতই গৌরী আর মাধবীকে নিয়ে নৌকায় উঠেছিল। গোধূলি-লগ্নে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর বুকে নৌবিহার।

সুমিতার দু' চোখে ঈর্ষার নীল শিখা জ্বলে উঠুক, অধ্যাপকের ওপর সে আস্থা হারাক, এই বুঝি গৌরীর অন্তরের কামনা।

কয়েকটা মেয়ের কাশির শব্দে প্রিয়ব্রত সচেতন হয়ে উঠল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক প্রিয়ব্রত বক্তৃতা থামিয়ে অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। বইয়ের ওপর হাত রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল।

এবার তাড়াতাড়ি বইটা মুখের কাছে টেনে নিল।

কবিতাটা পড়ছি। কবিতার নাম A Farewell।

সম্পূর্ণ কবিতাটা শেষ হবার আগেই ঘণ্টা পড়ে গেল।

প্রিয়ব্রত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অন্য দিন দু' এক মিনিট অপেক্ষা করে, সেদিন ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এখন কোন ক্লাশ নেই। কমনরুমে নিশ্চিন্ত অবকাশ। লজিকের অধ্যাপক অমিয়বাবু ধুতির কোঁচা দিয়ে নিজের জুতো-জোড়া পালিশ করছিলেন, প্রিয়ব্রতকে ঢুকতে দেখে, মৃদু হাস্যে বললেন, কি ব্যাপার ব্রাদার, তুমি কি ক্লাশে কোন কবির বর্ষা সম্বন্ধে কোন কবিতা পড়ছিলে?

প্রিয়ব্রত বিস্মিত হ'ল। বলল, বর্ষা সম্বন্ধে? নাতো। সুইন-বার্ণের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছিলাম। কেন, বলুন তো?

তোমার ক্লাশের পাশ দিয়ে আসবার সময় মালক্ষীদের সম্মিলিত কাশির আওয়াজ পেলাম কিনা। ভাবলাম একযোগে বুঝি সব ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

প্রিয়ব্রত একটু অপ্রস্তুত হ'ল। ক্লাশে ছাত্রীরা অমনোযোগী হওয়া মানেই অধ্যাপক ঠিক ভাবে ক্লাশ পরিচালনা করতে অসমর্থ।

একটু পরে অমিয়বাবু বললেন, তোমার ক্লাশে কিছু অশিষ্ট ছাত্রী আছে। তাদের তুমিও জান, আমিও জানি। আগে আমার ধারণা ছিল, ছাত্ররাই বুঝি গণ্ডগোলে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এখন দেখছি মেয়েদের কাছে তারা শিশু। গৌরীকে তো আমি রুদ্রাণী বলে ডাকি।

অমিয়বাবু হাসলেন। প্রিয়ব্রত কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না।

একটু দূরে অনাদিবাবু বসে বসে মোটা খাতায় কি একটা লিখছিলেন। এদিকে ফিরে বললেন, ওসব ছাত্রছাত্রীতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কথা ভাবুন। দিনগত পাপক্ষয় করে যান, কিন্তু নজর থাক অন্য ভাল চাকরির দিকে। সেটি করায়ত্ত হ'লেই পাকা ফলের মতন খসে পড়ুন।

প্রিয়ব্রত একটু বসে থেকে উঠে পড়ল। সময়টা এভাবে নষ্ট না করে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করাই সমীচীন। তাতে অশান্ত হৃদয়টাও কিঞ্চিৎ স্থির হবে। এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে অন্তত রেহাই পাবে।

এ কলেজ যেমন ছোট, অনুপাতে লাইব্রেরি আরো ছোট। তাছাড়া অধ্যাপকদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রীদের পাশে বসেই পড়াশোনা করতে হয়। এই কারণেই বোধহয় অধ্যাপকরা লাইব্রেরির ধারে কাছে ঘেঁসেন না।

লাইব্রেরির দরজাতেই দেখা হয়ে গেল।

গৌরী আর দীপিকার সঙ্গে। কি একটা ব্যাপার নিয়ে দুজন তর্ক করতে করতে আসছে।

প্রিয়ব্রতকে দেখেই গৌরী থামল।

আপনার কাছে একদিন যাব স্যার।

কি ব্যাপার ?

ব্যাপার কিছু নয়, সুইনবার্ণ সম্বন্ধে আরো একটু জানতে চাই।

সুইনবার্ণ সম্বন্ধে বলা আমার শেষ হয়নি। পরের দিন ক্লাশেই বলব। শুনে নিও।

গৌরী আড়চোখে দীপিকার দিকে চেয়ে দেখল, তারপর প্রিয়ব্রতকে বলল, আপনি বুঝি আলাদা করে কাউকে কিছু বলবেন না স্যার ? এত ইমপারশিয়াল হ'লে আমরা যে মারা যাই।

গৌরীর কথার কোন আগঢাক নেই। যে কোন কথা অনায়াসেই সে যাকে তাকে বলতে পারে। তাছাড়া, গৌরীর ধারণা হয়েছে প্রিয়ব্রতকে ঘায়েল করার তীক্ষ্ণতম আয়ুধ তার করায়ত্ত। নৌকা বিহারের প্রসঙ্গটা মূল্যবান হিসাবেই বোধ হয় সে হাতে রাখতে চায়।

প্রিয়ব্রত পাশ কাটাল।

চলি, আমার লাইব্রেরিতে একটু দরকার আছে।

প্রিয়ব্রতর মনে হ'ল দীপিকা আর গৌরী যেন একসঙ্গে হেসে উঠল। এ হাসির উৎস তাদের নিজেদের কোন কথাকে কেন্দ্র করে হওয়াও সম্ভব, কিন্তু হাসির সুর প্রিয়ব্রতর কানে হুল ফোটাল।

লাইব্রেরিরুমেও সুবিধা হ'ল না।

মেয়ের পাল কলকাকলীতে জায়গাটা সরগরম করে রেখেছে। অনেকেরই সামনে বই খোলা, কিন্তু সে বই যে পাঠ্য পুস্তক নয়, সেটা কাছে না গিয়েও প্রিয়ব্রত বলে দিতে পারে।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর কয়েকজন ভারিকি চেহারার মেয়ে বসে বসে আলোচনা করছে। সে আলোচনা সম্ভবতঃ নিজেদের জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে। তারা প্রিয়ব্রতকে দেখেও দেখল না।

প্রিয়ব্রত একটা কোণে একমাত্র খালি চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। পাশে যে দুটি মেয়ে কলস্বরে চীৎকার করে যাচ্ছিল, তারা শুধু চীৎকারই থামাল না, এদিক-ওদিক দেখে উঠে গেল।

কলরব কিছুটা স্তিমিত হ'ল।

কিন্তু ক্রমেই লাইব্রেরি-রুম ফাঁকা হয়ে গেল। প্রিয়ব্রতর মনে হ'ল সে যেন এখানে অবাঞ্ছিত,—ছাত্রীদের এলাকায় অযাচিত প্রবেশ করেছে।

একটু বসেই প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল।

সারা দিনে ক্লাশ খুব কম কিন্তু এই অবসর সময়টুকু কোন কাজে লাগাতে পারে না। একেবারে নিষ্ফলা যায়।

অধ্যাপকদের কমনরুমে ঘোরতর অর্থকরী আলোচনা চলে, সেখানে কিছুক্ষণ বসলে নিজের সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে প্রিয়ব্রত হতাশ হয়। অধ্যাপনার কাজে না এসে গুড়ের কারবারে ঢুকলে প্রিয়ব্রত কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত, সে বিষয়ে চোখে আঙুল দিয়ে অর্থ-নীতির অধ্যাপক দেখিয়ে দেন। প্রিয়ব্রতর বয়স কম, সামনে বিপুল ভবিষ্যত, ফেরবার এখনও সময় আছে।

শেলীর থিসিস গুড়ের কলসীর মধ্যে হাবুডুবু খায়।

আর একটি লেখাপড়ার জায়গা আছে লাইব্রেরি। কিন্তু সেখানেরও তো এই অবস্থা। লাইব্রেরী তো নয়, ছাত্রীদের আর একটা কমনরুম, কিংবা প্রসাধনকক্ষও বলা যায়।

প্রিয়ব্রত এসে বারান্দায় দাঁড়াল।

সামনে রুক্ষ, ধূসর রাজধানীর পথ। হাজার মানুষ আর যান বাহনের পায়ের চাপে দলিত, নিষ্পেষিত। সকাল থেকে রাত্রির মধ্যযাম পর্যন্ত মানুষের ছোটাছোটির অন্ত নেই। অন্ন চিন্তা, এ ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। কেবল বাঁচার জন্য সংগ্রাম।

কোন এক মনীষী বলেছিলেন, Man does not live by bread alone. সে মনীষী হয়তো জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর আত্মাকে টেনে এখানে আনতে ইচ্ছা করে। এই শহরের বুকে, তাঁর আপ্ত-বাক্যের অসত্যতা প্রমাণের জন্য।

কিছু মেয়ে বাইরে দেবদারু গাছ তলায় জটলা করছে।

প্রিয়ব্রত ঝুঁকে পড়ে দেখল। বেশীর ভাগ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর। এরা কলেজের ইট-কাঠের অবরোধের মধ্যে বন্দী থাকতে রাজী নয়। এদের পরিক্রমার ক্ষেত্র আরো দূর। মোড়ের রেঁস্তরা। পাশের পার্ক।

এদের কয়েকজনের জন্য দু' একটি ছেলেও অপেক্ষা করে। হাতে বইয়ের বাহার দেখে মনে হয় হয়তো অন্য কোন কলেজের ছাত্র।

যেতে-আসতে প্রিয়ব্রত অনেকবার লক্ষ্য করেছে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এতে প্রিয়ব্রত বিস্মিত হয়ও নি।

শুধু ভেবেছে আজকের নিছক বিলাসের সঙ্গীরা কজন সত্যি জীবনের সঙ্গী হতে পারবে। চলার পথে, পায়ে পায়ে উৎক্ষিপ্ত ধূলায় কত মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে।

এই হয়। এই পৃথিবীর চিরন্তন খেলা।

ঘণ্টার শব্দ কানে আসতেই প্রিয়ব্রত সরে এল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাশ আছে একতলায়।

প্রিয়ব্রত যখন সুমিতার বাড়ীর দরজায় গিয়ে পৌঁছাল তখনও সন্ধ্যা নামেনি, তবে তার আয়োজন চলছে।

সুমিতার পড়ার ঘর অন্ধকার।

একটু লজ্জিত হ'ল প্রিয়ব্রত। বোধ হয় একটু আগেই এসে গেছে। এভাবে আগে আসাটাই অন্যায়।

এই ব্যাকুলতা, এই আগ্রহ এটা প্রিয়ব্রত মোটেই ক্ষমার চোখে দেখতে পারল না। ছাত্রকে পড়াতে যাবার সময় তো এতটা উৎসাহ দেখা যায় না।

প্রিয়ব্রত ঠিক করে ফেলল। মাঝে মাঝে কামাই করবে। একটু অনাসক্তি দেখাবে। বিনা দর্শনীতে এতটা উদ্যম দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই।

ঘরের চৌকাঠে একটু দাঁড়িয়ে থেকে প্রিয়ব্রত ডাকল, সুমিতা। পাশের ঘর থেকে সুমিতা বেরিয়ে এল। আঁচলটা গলায় জড়ানো; হাতে প্রদীপ।

ওঃ, আপনি এসে গেছেন স্যার।

প্রদীপ সামলে সুমিতা পড়ার ঘরে ঢুকল। বাতিটা জ্বালিয়ে, চেয়ারটা একটু টেনে দিয়ে বলল, একটু বসুন স্যার, আমি এখনই আসছি।

প্রিয়ব্রত চেয়ারে বসল। একটু রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারল না। বলল, কি ব্যাপার পরীক্ষা তো দূর অস্ত।

প্রদীপের আভায় সুমিতার সারা মুখ যেন আরও আরক্ত দেখাল। লজ্জাজড়িত দৃষ্টি তুলে বলল, তুলসীতলায় প্রদীপ আমি রোজই দিই স্যার।

সুমিতা একটু অপেক্ষা করল। ভাবল, প্রিয়ব্রত হয়তো আর কিছু বলবে।

কিন্তু প্রিয়ব্রত হাতের বইটা খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে দেখে সুমিতা বাইরে চলে গেল।

ফিরল মিনিট দশেকের মধ্যে।

এতক্ষণ প্রিয়ব্রত সামনে খোলা বইটা পড়বার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু একটি লাইনও পড়তে পারেনি।

পাশাপাশি হুটো ছবি বারবার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। একটা ছবি বর্ণাঢ্য, উজ্জ্বল। গালে মুখে রং মাখা, কেশে বেশে উগ্র আভিজাত্যের ছোপ, ইঙ্গবঙ্গ ধরণের মেয়ের সার। যাদের অনেকের মুখোমুখি কলেজে প্রিয়ব্রতকে দাঁড়াতে হয়।

আর একটা ছবি অনেক কোমল, অনেক স্তিমিত। শান্ত, সমাহিত রূপ। গলায় আঁচল, আঁচলের পাশ দিয়ে খোলা চুলের রাশ। ধীর পায়ে তুলসী মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে, বাতাসের অত্যাচার থেকে প্রদীপের শিখা বাঁচাতে বাঁচাতে।

এ হুটো ছবিই এ দেশের মেয়েদের। কিন্তু কোনটা তাদের আসল রূপ। এই বহির্মুখী জীবন, উগ্র বিলাসিতার চোখ ঝলসানো দীপ্তি, হাজার প্রলোভনের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া, না এই নিজেকে নিবেদন করার পবিত্র ভঙ্গী।

সুমিতার একহাতে চায়ের কাপ আর একহাতে একটা ডিশে হুটো সন্দেশ।

সেগুলো প্রিয়ব্রতর সামনে রাখতেই সে আপত্তি করল।

রোজ রোজ তুমি কি আরম্ভ করেছ বলতো?

সুমিতা লজ্জায় যেন কুঁকড়ে গেল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, কেন, আপনি এ ভাবে বলেন। বিকালে যে কোন লোক এলেই এক কাপ চা দেওয়া উচিত।

আর এই জোড়া সন্দেশ।

প্রিয়ব্রত আঙুল দিয়ে সন্দেশের ডিশের দিকে দেখাল।

সুমিতা কোন উত্তর দিল না।

প্রিয়ব্রত চা সন্দেশ শেষ করে পাশে-বসা সুমিতার দিকে চেয়ে বলল, ভোজনপর্ব শেষ। এবারে লেখাপড়া আরম্ভ করা যাক, কি বল?

সুমিতা বই খুলল। ইংরাজী কবিতার বই।

আজ সুইনবার্ণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ক্লাশের লেকচার তুমি শুনেছিলে?

সুমিতা ঘাড় নাড়ল।

কেমন লেগেছিল?

ভালই তবে—

তবে?

মেয়েরা বড় বাধার সৃষ্টি করে। আজে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্ন কিছু থাকলে লেকচারের পরে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়?

তাতো নিশ্চয়ই উচিত। তাছাড়া প্রশ্নটাও অত্যন্ত সস্তাধরণের। এ ধরণের তুলনা অর্থহীন। শুধুমাত্র ছন্দ বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে একজন কবির সঙ্গে আর এক কবির আলোচনা চলে না। আমার মনে হয় সত্যেন দত্তের অনেক কবিতায় আমরা যথেষ্ট গভীরতার স্বাদ পাই। কিন্তু সুইনবার্ণ সম্বন্ধে সমালোচকদের অভিযোগ অনেক। একই শব্দের বারংবার প্রয়োগ, অস্পষ্টতা, অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের সুষমার জন্য তিনি নিরর্থক শব্দও ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর ছন্দের হাত এত মর্মস্পর্শী যে সমালোচকরা এ কথাও বলেছেন,

"Often the reader is lost in the maze of rhythms and lulled into a state of uncritical stupor."

দু' গালে দুটি হাত—সুমিতা নিবিষ্ট চিত্তে শুনছে। এটাই তার শোনার বিশেষ ভঙ্গী।

টেনিসন ' সুইনবার্ণ সম্বন্ধে চমৎকার একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, He is a reed through which all things blow into music.

টেনিসন আর সুইনবার্ণ কি সমসাময়িক?

মৃদু কণ্ঠে সুমিতা প্রশ্ন করল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রিয়ব্রত একটু ভাবল, তারপর বলল, হ্যাঁ, একই সময়ে দু' জনে ছিলেন। টেনিসনের জীবিতকাল ১৮০৯ থেকে ১৮৯২, আর সুইনবার্ণ ১৮৩৭ থেকে ১৯০৯। যাক, এবারে কবিতাটা শুরু করা যাক। কবিতাটির নাম Soul Supreme.

প্রিয়ব্রত সমস্ত কবিতাটি একবার পড়ে গেল। তারপর বলল, আমাদের চার্বাক দর্শনের গোড়ার কথা, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ', এমন কি তাতে ঋণ করে ঘৃত সেবনের বিধিও আছে। এরকম একটা ধারণা ওমর খৈয়ামেরও ছিল। একে বলা যায় বর্তমান-সর্বস্ব জীবন দর্শন। কিন্তু কবি এখানে একটু স্বতন্ত্র কথা বলছেন। এই যে আনন্দ, এই উন্মাদনা, জীবন বিলাস, এসব কিছুই শাশ্বত নয়, চিরস্থায়ীও নয়। বসন্ত ঋতু পরিমিত-পরমায়ু, প্রেম-পাত্র বদলায়, পাত্রী বদলায়, প্রেমের সংজ্ঞাও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ একদিন পৃথিবী-বিজয়ের ঘোষণা করে, কালের প্রভাবে তাও একদিন ক্ষীণ, শীর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার মৃত্যু নেই, পরিবর্তনও নেই।

এই কবিতাটি তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, বস্তুনিষ্ঠ একমাত্র ছন্দ নির্ভর নয়। এই কবিতাটিতে যে চিন্তাধারা অনুসৃত হয়েছে তা ভারতীয় চিন্তাধারার অনুপন্থী।

কবিতাটির সারাংশ, সুইনবার্ণের রচনার বৈশিষ্ট্য, ইংরাজ কবিদের মধ্যে তার স্থান নির্দেশ সব বলে প্রিয়ব্রত যখন থামল, দেখল ছাত্রীর দুটি চোখে প্রগাঢ় মুগ্ধ দৃষ্টি।

আমি যা বললাম সেটা লিখে রেখ, আমি যেদিন আসব সেদিন দেখব।

সুমিতা ঘাড় নাড়ল।

উঠতে গিয়েও প্রিয়ব্রত বসে পড়ল।

সুমিতার চোখে চোখ রেখে বলল, সেদিন একটা মজা হয়েছে।

স্বল্পবাক সুমিতা কোন কথা বলল না। চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফোটাল।

আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে গৌরী মাধবী আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর একটি মেয়ের নামটা মনে আসছে না। কি নাম বলতো, ওদের সঙ্গে ঘোরে?

দীপিকা? আস্তে আস্তে সুমিতা উচ্চারণ করল।

না, না, দীপিকা নয়. প্রিয়ব্রত মাথা নাড়ল। তারপর একটু পরেই বলল, রমা রমা।

রমা পালিত? খুব ফর্সা আর মোটা?

না তো। এ মেয়েটি কালো রঙের। রেডিয়োতে গান করে।

ও, এবার সুমিতা মাথা নাড়ল, রমা বসাক। থার্ড ইয়ারের। গৌরীর বাড়ীর কাছে থাকে।

তাই হবে।

প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একবার ভেবে নিল বাকি ঘটনাটা কি ভাবে শুরু করবে। আদৌ বলবে কিনা। তারপর ভাবল, শুরু যখন করেছে, তখন বলে ফেলাই ভাল। আজ নয় কাল, কথাটা হয়তো গৌরীই বলে দেবে। তার আগে প্রিয়ব্রতর কাছ থেকেই শুনুক।

গৌরী আর মাধবী নৌকা ভাড়া করল। রমা জেটিতেই দাঁড়িয়ে রইল। ওরা আমাকেও ডাকল নৌকায় ওঠবার জন্য। আমি উঠলাম। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করে আবার ফিরে এলাম।

কথাটা বলে প্রিয়ব্রত মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল। এ আবার কি একটা ঘটনা যে ছাত্রীকে বলতে হবে। সুমিতার শোনা দরকার। আসল কথা, ভয় রয়েছে প্রিয়ব্রতর মনে। কি জানি গৌরীর দল সব ঘটনাটা কি ভাবে চিত্রিত করবে।

প্রিয়ব্রত মনে হ'ল একটু যেন অভিমানের মেঘ নামল সুমিতার মুখে। দুটি ঠোঁট থর থরিয়ে কেঁপে উঠল।

কিন্তু ওইটুকুই। সুমিতার তরফ থেকে একটি কথাও উচ্চারিত হল না। দুটো হাত টেবিলের ওপর রেখে চুপচাপ একভাবে বসে রইল।

হাত ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল।

ইস্ অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সুমিতাও উঠল। প্রিয়ব্রতর পিছন পিছন চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সুমিতাদের ফটকটা পার হবার মুখেই মনীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনীশ বাড়ী ফিরছে।

কি, যাচ্ছ? মনীশ জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। তোমার এত দেরী?

অফিসের পর এক জায়গায় গিয়েছিলাম। একটু থেমে মনীশ বলল, সুমিতার একটা সম্বন্ধর ব্যাপারে।

প্রিয়ব্রত এক পা এগিয়েছিল, মনীশের কথা কানে যেতে ঘুরে দাঁড়াল।

সুমিতার সম্বন্ধ?

হ্যাঁ, ছেলেটি কাস্টম্স্-এ কাজ করে। নিজের বাড়ী আছে শ্রীরামপুরে। দেখতে শুনতে মাঝামাঝি।

কিন্তু সুমিতার এখনই বিয়ে দেবে?

মনের মতন আর পাচ্ছি কোথায়। আজ বছর খানেক ধরে তো চেষ্টা করছি। পেলে তো এখনই দিয়ে দিই।

ওতো পড়ছে। অন্তত আই-এ. পরীক্ষাটা দিতে দাও।

মনীশ হাসল। আমার অবস্থা সবই তো তুমি জান। একটু একটু করে দায় উদ্ধার তো হ'তেই হবে। সুমিতাকে পার করতে পারলে তবু কিছুদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি।

প্রিয়ব্রত আর কথা বাড়াল না। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মনীশকে এভাবে আটকে রাখাটা সমীচীন নয়।

চলি মনীশ।

প্রিয়ব্রত জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

গলিটা পার হতেই চোখে পড়ল। নিওন-শোভিত দোকানের সার। ক্রেতায় ঠাস বোঝাই। তার পাশে আলোকমালায় সজ্জিত সিনেমা গৃহ। কি এক ছবির রজত জয়ন্তী সপ্তাহ চলেছে। সামনে সুবেশ, আপাতদৃষ্টিতে সুখী জনতা।

এদিকে ফুটপাতে ফুলের আসর বসেছে। বেল, গোলাপ, রজনীগন্ধা। সেখানেও খদ্দেরের ভিড়।

শহরের এই বাইরের ছবিটা দেখলে মনেই হয় না, এই উচ্ছ্বাস, এই উৎসব-মুখরতার অন্তরালে কোথাও মধ্যবিত্ত সংগ্রাম চলেছে। এক মুষ্টি অন্নের জন্য মানুষ বিবেক বিক্রি করছে, সংসারের রথ-চক্রের তলায় অযুত প্রাণ নিঃশেষে বলি হচ্ছে।

শহরের বিলাসিনী রূপ দেখতে দেখতে ভিড় ঠেলে ঠেলে প্রিয়ব্রত এগিয়ে চলল।

পতিতপাবনবাবু প্রিয়ব্রতকে যথেষ্ট দেখা শোনা করেন। তবে সব কিছু পতিতপাবনবাবু নিঃস্বার্থভাবে করছেন এটা ভাবতে পারলে ভালই হত। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহের একটা সাপ ফণা তোলে। প্রিয়ব্রত শঙ্কিত হয় এই পর্যন্ত, তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়।

পতিতপাবনবাবুর ওই একটি মাত্র মেয়ে রত্না। স্ত্রী বছরের বেশীর ভাগ 'দিন রোগ শয্যায় কাটান, কাজেই সংসারের যাবতীয় ভার রত্নার ওপর।

মাঝে মাঝে পতিতপাবনবাবু নেমে আসেন নীচেয়। প্রিয়ব্রতর আহারের তদারক করার ছুতোয় সামনে বসে মেয়ের প্রশংসা করতে

শুরু করেন। যে ব্যঞ্জন প্রিয়ব্রত মুখে তুলছে, তার বেশীর ভাগই রত্নার তৈরী সে কথা জানাতে ভোলেন না। শুধু রান্নাবান্নাই নয়, যাবতীয় গৃহকর্মে রত্না যে কি পরিমাণ পারদর্শিণী তার ফিরিস্তি দেন।

এসব শুনতে প্রিয়ব্রতর কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে বিচলিত হয় পরের কথাগুলোয়।

পতিতপাবনবাবুরা যে প্রিয়ব্রতদের পাল্টা ঘর এমন কথারও আভাস দেওয়া হয়। রত্না যখন পতিতপাববাবুর একমাত্র সন্তান তখন তারা রোডের দুতলা এই বাড়ী এবং বাপের যাবতীয় টাকা পয়সা সবই তার হবে। কাজেই পাত্রী হিসাবে রত্না কত লোভনীয় সে ইঙ্গিতও পতিতপাবনবাবু দিতে ছাড়েন না।

বিপদের মেঘ খুব ঘনীভূত হ'লে খাওয়া শেষ না করেই প্রিয়ব্রত উঠে পড়ে।

পতিতপাবনবাবু চীৎকার করে ওঠেন।

আরে একি, তরকারি ভাত ফেলে উঠে পড়লেন যে?

জলে চুমুক দেওয়া শেষ করে প্রিয়ব্রত বলে, পেটটা ভাত আছে। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে রেঁস্তোরায় কিছু খেতে হয়েছে। তাছাড়া, কাজও একটু রয়েছে। থিসিসটা মোটেই এগোচ্ছে না, আজ থেকে ভাবছি জোর করে লাগব।

বেগতিক দেখে পতিতপাবনবাবুকে উঠে পড়তে হয়।

ঠিক গলির মোড়ে পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি হন হন করে এগিয়ে চলেছেন।

প্রিয়ব্রতকে দেখে একটু থামলেন।

এই ফিরছেন?

অনাবশ্যক প্রশ্ন। উত্তরের প্রয়োজন নেই। তবু প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়ল।

চলতে চলতে পতিতপাবনবাবু বললেন, এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে আছে শ্যামবাজারে। অফিসের বন্ধু। তাই যাচ্ছি সেখানে।

প্রিয়ব্রত আর দাঁড়াল না।

গলির মধ্যে ঢুকে পকেট হাতড়ে বাড়ীর চাবিটা বের করে এগিয়ে গেল।

প্রথমে তালাটা খুলল, তারপর ভিতরে ঢুকে বাতিটা জ্বালাল। পাশেই বাথরুম। বালতি ভরা জল রাখা আছে। মুখ হাত ধুয়ে নিল।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার কাছে বসল। এ ঘরে অসহ্য গরম। জানলা দিয়ে তবু কিছুটা হাওয়ার ছিটে আসছে।

মনে মনে প্রিয়ব্রত ঠিক করে ফেলল। সামনের মাসে কলেজের মাইনে আর টিউশনির টাকাটা হাতে এলেই সে একটা পাখা ভাড়া করে ফেলবে। নয়তো সারাটা রাত তাকে ছটফট করতে হবে গরমে।

আপনার খাবার নিয়ে আসব ?

রত্না দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রিয়ব্রত মুখ ফেরাল।

রত্না নিজের বেশ-বাসের দিকে যেন একটু বিশেষ নজর দিয়েছে। ঘাড়টা ঘোরাতে খোঁপায় একটা বেল কুঁড়ির মালাও দেখা গেল।

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।

বাপ না থাকলে রত্না খেতে দেবার ব্যবস্থা করে। জিজ্ঞাসা করে, তারপর পাচক আসে থালা নিয়ে।

প্রিয়ব্রত নিজেই আসনটা পাতল। এক গ্লাস জল গড়িয়ে পাশে রাখল। এ দুটো কাজ তাকে করতে হয়।

আসনের ওপর বসে প্রিয়ব্রত অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই রত্না ঘরে ঢুকল। একহাতে থালা। থালার ওপর গোটা দুয়েক বাটি সাজানো।

প্রিয়ব্রত শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

একি তুমি বয়ে আনছ কেন? তোমাদের ঠাকুর কোথায় গেল?

ঠাকুরের এক দেশোয়ালী ভাই আসবে দেশ থেকে, তাকে আনতে ঠাকুর হাওড়া স্টেশন গেছে।

থালা আর বাটি দুটো নামাতে নামাতে রত্না বলল।

আমাকে বললে না কেন, আমি না হয় ওপরে গিয়ে খেয়ে আসতাম?

তাতে কি হয়েছে? আপনি বুঝি আমাকে অত অকর্মণ্য ভাবেন? এটুকু কাজ আর করতে পারি না?

প্রিয়ব্রত আর কথা বাড়াল না। খেতে আরম্ভ করল। রত্না প্রিয়ব্রতর সামনে একটু দূরে বসল।

অন্যদিন পতিতপাবনবাবু না থাকলে রত্না একবার নেমে খাওয়ার কথা বলে তারপর ওপরে উঠে যায়। পাচকের হাত দিয়েই সব পাঠিয়ে দেয়। কি নেবে, না নেবে পাচকই তার তদারক করে।

আজ পতিতপাবনবাবু আর পাচক দুজনেই নেই, কাজেই রত্না নিজেই নেমেছে দেখাশোনা করতে।

কিন্তু এভাবে খেতে প্রিয়ব্রতর ভারি অসুবিধা হচ্ছে।

খেতে খেতে যতবার সে মুখ তুলল, আর এক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টির মুখোমুখি পড়ে গেল।

কিন্তু সে দৃষ্টিতে কি শুধু কৌতূহল!

রত্না সুদর্শনা নয়। রূপের মাপকাঠিতে তাকে কুৎসিত বলাই চলে। কালো রং, দেহে সৌষ্ঠব নেই, চোখ মুখের গঠনও সুন্দর নয়।

তাছাড়া উগ্র প্রসাধনে তাকে আরও যেন বিশ্রী দেখাচ্ছে।

আজ বোধ হয় আপনার মার চিঠি এসেছে?

রত্না কথা বলল।

মার চিঠি? কোথায়?

পোস্টম্যান দরজার গোড়ায় দিয়ে গিয়েছিল, আমি তুলে জানলার মধ্য দিয়ে আপনার টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি।

ঘরে ঢুকে প্রিয়ব্রত আর টেবিলের কাছে যায়নি। খেতে খেতেই মুখ তুলে একবার টেবিলের দিকে দেখল। বইখাতার আড়ালে পোস্টকার্ডটা দেখা গেল না।

এইবার একটা বিয়ে-থা করে ফেলুন।

রত্নার আচমকা কথায় প্রিয়ব্রতর গলায় ভাত বেধে গেল। তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিঃশেষে চুমুক দিল।

রত্না উঠে পড়ল। কুঁজোর মুখে আর একটা পাত্র ছিল, সেটা জল ভর্তি করে এনে প্রিয়ব্রতর গ্লাসে ঢেলে দিল।

নীচু হয়ে ঢালবার সময় রত্নার আঁচলটা খুলে প্রিয়ব্রতর কাঁধের ওপর পড়ল। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এ বিষয়ে প্রিয়ব্রত নিঃসন্দেহ। কিন্তু বেশ অসুবিধা হ'ল। গ্লাসে জল ঢেলে আঁচলটা গুছিয়ে নেবার সময় রত্নার হাতটা প্রিয়ব্রতর দেহ ছুঁল।

আর কিছু নয়। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ ঘরে ঢুকলে এ অন্তরঙ্গতার অন্য অর্থ করবে।

রত্না নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আর একটু ভাত নিয়ে আসি আপনার জন্যে?

না, না, বিব্রত প্রিয়ব্রত ঘন ঘন মাথা নাড়ল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল।

রত্না ওপরে উঠে গেল।

মুখ-হাত ধুয়ে প্রিয়ব্রত যখন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল, তখন ঝি থালা বাটি গ্লাস তুলে নিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করছে।

গামছায় হাত মুছে প্রিয়ব্রত টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিশেষ খুঁজতে হ'ল না। টেবিলের এক কোণে পোষ্টকার্ডটা পড়ে রয়েছে। বোধ হয় বাইরে থেকে ছুঁড়ে ফেলার দরুণ।

পোস্টকার্ডটা তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করতেই প্রিয়ব্রত বাধা পেল।

এই নিন।

পিছন ফিরে দেখল আবার রত্না এসে দাঁড়িয়েছে। তার প্রসারিত হাতে এক জোড়া পান।

আমি তো পান খাই না।

আজ অন্তত খান। আমি নিজে হাতে করে এনেছি।

রত্না চটুল ভঙ্গী করে হাসল।

নিজে হাতে করে আনার জন্য পানদুটো কি বিশেষ মর্যাদালাভ করেছে, প্রিয়ব্রত বুঝতে পারল না। কিন্তু তর্ক করে লাভ নেই। কথায় কথা বাড়বে। রত্নার থেকে পান দুটো নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

তারপর রত্না চলে যেতেই প্রিয়ব্রত দরজাটা বন্ধ করে দিল। আর কোন ছুতোয় সে ফিরে আসতে না পারে।

চেয়ারের ওপর বসে পোস্টকার্ডে মনোনিবেশ করল।

দরিদ্র এক সংসারের ছবি। কালি দিয়ে নয়, মনে হয় মা যেন চোখের জলে চিঠিটা লিখেছে। প্রতি ছত্র।

মার সব চেয়ে বড় চিন্তা নীলা। পেটের মেয়ে নয়, শত্রু। চোখের সামনে যে ভাবে বেড়ে উঠেছে, তাতে ভয় পাবারই কথা। কি করে এ মেয়ে যে পার হবে ভগবান জানেন।

প্রিয়ব্রত শহরে থাকে। ইতিমধ্যে অনেক লোকের সঙ্গে নিশ্চয় তার জানাশোনা হয়েছে। নীলার জন্য সে একটু চেষ্টা করুক।

পুনশ্চ দিয়ে কিছু টাকা পাঠাবার কথা লেখা আছে। দুটো বালিসই ফেঁসে গেছে। একটা একটা করে করিয়ে নেওয়া দরকার।

পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে প্রিয়ব্রত বিছানায় শুয়ে পড়ল। পোস্টকার্ডে কোন আবরণ থাকে না। সবটুকুই অবারিত। রত্না সাধারণ কৌতূহলবশেই হয়তো পোস্টকার্ডের ওপর চোখ বুলিয়েছে। নিছক মেয়েলী কৌতূহল। দারিদ্র্যের ছাপ পোস্ট-কার্ডের প্রতি ছত্রে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটা সংসার থেকে প্রিয়ব্রত শহরে এসে উঠেছে, একথাটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না। সেই জন্যই হয়তো একটু দরদ দেখাবার জন্য রত্না কাছে এসে বসেছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্ন করেছিল।

পোস্টকার্ডটা বালিশের তলায় রেখে প্রিয়ব্রত হাই তুলল। না, এসব নাও হ'তে পারে। সাধারণ ভদ্রতা হিসাবেই রত্না এসে বসেছিল। এর পিছনে অন্য কোন অভিসন্ধি খুঁজতে যাওয়া অন্যায়।

প্রিয়ব্রত চোখ বুজল।

আর চোখ বোজার সঙ্গেই অদ্ভুত এক ছবি ভেসে উঠল মুদ্রিত নয়নপটে।

আসন পাতা, সামনে থালা, গ্লাস,। আসনের ওপর প্রিয়ব্রতই বসে আছে, কিন্তু অদূরে বসে দুটি চোখে মমতা মিশিয়ে যে মেয়েটি তদারক করছে তার মুখের সঙ্গে রত্নার মুখের মিল খুব কম।

কার মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী মনে হ'তেই প্রিয়ব্রত বিছানার ওপর উঠে বসল। একি অশালীন চিন্তা মাথায় বাসা বেঁধেছে। ছাত্রী আর অধ্যাপকের পবিত্র সম্পর্কের মাঝখানে কুৎসিত একটা ছায়া দুলছে। এ ছায়া প্রিয়ব্রতর কুটিল অন্তরের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কি!

বিছানা থেকে নেমে প্রিয়ব্রত আবার চেয়ারে বসল। এখান থেকে তারাভরা আকাশের কিছুটা দেখা যায়। শহরের আকাশ খণ্ডিত, গ্রামের মতন অবারিত, উদার নয়। এখানে আকাশ দেখতে হলে অনেক কসরৎ করতে হয়।

নীলাকে পাত্রস্থ করতে হবে। ডি-ফিল. পেতে হবে।

ভাইকে মানুষ করতে হবে। দারিদ্র্যের করাল-গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে সংসারকে। এছাড়া প্রিয়ব্রতর অন্য কোন চিন্তা থাকতে পারে না। আর কোন চিন্তা করা তার পক্ষে পাপ।

নিজের জীবন! সংগ্রামী মানুষের নিজের জীবনের দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ কম। মধ্যবিত্ত জীবনে মধুর আবেশের স্থান নেই, কল্পনার বিলাসিতাও শোভা পায় না। বন্ধুর কঙ্করময় পথে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে। কর্তব্যের পথ থেকে একটু বিচ্যুত হ'লে চলবে না।

খাতা বই খুলে প্রিয়ব্রত লিখতে শুরু করল।

Philosophy of Shelley। শেলীর কবিতার ছত্র তুলে তুলে তাঁর জীবন দর্শনের বিশ্লেষণ। প্রাচ্য চিন্তা-ধারার সঙ্গে শেলীর কবিমানসের কি অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য তাঁর কাব্যের কণা খুঁটে খুঁটে তার প্রমাণ দেখানো।

প্রিয়ব্রত রসের সাগরে ডুবে গেল।

এত রাত অবধি কি করছেন মশাই?

জানলার ওপারে পতিতপাবনবাবুকে দেখা গেল। নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছেন।

টেবিলের ওপর খুলে রাখা হাতঘড়িটার দিকে প্রিয়ব্রত উঁকি দিয়ে দেখল। এগারোটা পঁয়ত্রিশ। সাধারণ লোকের পক্ষে হয়তো অনেক রাত, কিন্তু এর চেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত প্রিয়ব্রত কাজ করেছে।

পতিতপাবনবাবু আরো এগিয়ে একেবারে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মনোযোগ দিয়ে কি লিখছিলেন মশাই? বিয়ে-থাও তো করেন নি, যে সেরকম কিছু সন্দেহ করব।

প্রিয়ব্রত চেয়ার সরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। পতিতপাবনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, থিসিসটা নিয়ে একটু বসেছিলাম।

ও, আচ্ছা, আচ্ছা, পতিতপাবনবাবু ঘাড় নাড়লেন, তবু যা করবেন, নিজের শরীর বাঁচিয়ে মশাই। এত রাত জাগাটা ঠিক নয়। স্বাস্থ্যই সম্পদ।

পতিতপাবনবাবু সরে যাচ্ছিলেন, কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো? আমি খাওয়াদাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করছি।

অসুবিধা? না, না, রত্না নিজে বসে থেকে আমায় খাইয়েছে।

পতিতপাবনবাবু দুটো চোখ প্রায় বন্ধ করে ফেললেন। আমি বাপ, আমার নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। ওরকম মেয়ে হাজারে একটা মেলে না। রংটা একটু চাপা, নাহ'লে অন্য সব বিষয়ে ওর তুলনা নেই। ওকে যে নেবে সে সুখী হবে।

এর পর কি কথা উঠবে তা প্রিয়ব্রতর একেবারে অজানা নয়। এর আগেও কয়েকবার পতিতপাবনবাবু তার অভাস দিয়েছিলেন। এই বাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকা সব রত্নার স্বামীর। দরিদ্র এক অধ্যাপকের কাছে বিরাট প্রলোভন। অন্তত পতিতপাবনবাবু তাই মনে করেন।

সেই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি বলল, আপনি আর দাঁড়াবেন না। রাত হয়েছে। ওপরে চলে যান। রত্না হয়তো জেগে বসে আছে।

তা সত্যি। খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতে দেরী হয়ে গেল। রাস্তাটাই কি আর কম। চলি তাহ'লে প্রিয়ব্রতবাবু।

আসুন।

পতিতপাবনবাবু সরে যেতেই প্রিয়ব্রত সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিল।

সেদিন কলেজে করিডর দিয়ে প্রিয়ব্রত যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে এল, স্যার।

ভীরু, শঙ্কিত কণ্ঠ।

প্রিয়ব্রত ফিরে দাঁড়াল।

সুমিতা এগিয়ে আসছে। একহাতে বইগুলো বুকের ওপর চেপে ধরেছে।

প্রিয়ব্রত আশ্চর্য হল। মিতভাষী সুমিতা পারত-পক্ষে তার সঙ্গে কলেজে কথা বলে না।

প্রিয়ব্রত এদিক-ওদিক চোখ ফেরাল। এধারে ওধারে কয়েকটা মেয়ে জটলা করছে, কিন্তু সুমিতার ক্লাশের কোন মেয়ে নেই।

একটু দূরে এসে সুমিতা থামল।

চাপা গলায় বলল, আজ সন্ধ্যায় পড়াতে যাবেন না স্যার।

কেন, থাকবে না তুমি?

অবশ্য এটা প্রিয়ব্রতর অহেতুক কৌতূহল। যাতে মিছামিছি প্রিয়ব্রতর কষ্ট না হয়, সেজন্য সুমিতা আগে থেকেই তাকে বারণ করতে এসেছে। নিশ্চয় সুমিতা থাকবে না। এটা জানা কথা।

প্রিয়ব্রতর নতুন করে এ প্রশ্ন করা অর্থহীন।

থাকব।

কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে মাথা নীচু করে সুমিতা বলল।

থাকবে? তবে?

আজ পড়ার সুবিধা হবে না স্যার। আমাকে দেখতে আসবে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটদুটো চেপে ধরে কোন রকমে সুমিতা কথাগুলো উচ্চারণ করল। তারপর আর দাঁড়াল না। দ্রুত প্রিয়ব্রতর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখতে অসুবিধা হয়নি। সুমিতার দুটি চোখ জলটলমল।

দেখতে আসবে তো জল কেন সুমিতার চোখে?

হয়তো যেখান থেকে দেখতে আসবে তাদের সুমিতার পছন্দ

নয়। পুরোনো ধরণের বনেদী বাড়ী। বিয়ের পরই একেবারে হারেমে নির্বাসিত হবে।

মাঝ পথে পড়াশোনা ছাড়তে হবে বলেই বোধহয় চোখে জল।

এত কথা প্রিয়ব্রত ভাবল বটে, কিন্তু মন মানতে চাইল না। মনের গোপনে যে মন প্রায় তৃতীয় চক্ষুর সামিল, সে মন অদ্ভুত এক কল্পনার সৌধ রচনা করল।

সে সৌধের স্বরূপ দেখে প্রিয়ব্রত রীতিমত ভীত হ'ল।

কি প্রিয়দা, এখানে দাঁড়িয়ে ?

প্রিয়ব্রত চমকে উঠল।

চিত্ত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাবছি চিত্ত।

কি ভাবছেন ?

ভাবছি, কত বছর অধ্যাপনা করলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়।

হঠাৎ এসব তত্ত্ব কথা নিয়ে মাতলেন যে ?

চিত্ত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল।

মাতি নি, হঠাৎ মনে হ'ল। এই 'প্রাণ ধারণের গ্লানি' আর সহ্য হয় না। পরিশ্রম করে নোট তৈরী করে আনি, ক্লাশে বিতরণ করি, পরীক্ষা পাশ করার হজমিগুলি। প্রকৃত জ্ঞানের সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। কেবল বলে, পরীক্ষায় আসতে পারে বেছে বেছে প্রশ্নের আলোচনা করুন। এই তো শিক্ষার ধারা।

প্রিয়ব্রতর কথা শেষ হবার আগেই চিত্ত কপট শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখল।

কি দেখছ চিত্ত ?

দেখছি প্রিয়দা, আপনার এই সব কথা কোন অধ্যাপকের কানে গেল কিনা। গেলে তাঁরা ভাববেন, এমন ছেলে কোন মঠে-আশ্রমে যোগ না দিয়ে এ পথে এসেছে কেন!

দুজনেই হেসে উঠল।

তারপর চিত্তই বলল।

প্রিয়দা, আপনি যেখানে থাকেন সেখানে বোধহয় খাওয়া-দাওয়া ভাল, তাই না?

কেন বল তো?

আপনার এ সব চিন্তা হচ্ছে বদ হজমের লক্ষণ। হেলান দেবার পৈত্রিক সম্পত্তি যাদের আছে, এ বিলাসিতা তাদেরই সাজে। আমাদের গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া আর পথ নেই।

চিত্ত আর দাঁড়াল না। বোধহয় ক্লাশ আছে। পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেল।

প্রিয়ব্রত আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ পিরিয়ডে তার ছুটি।

হঠাৎ সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ কি।

সব শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি শুধরে, শিক্ষার চিন্তাধারার নতুন স্রোত আনবে এমন ভাগীরথ সাজার ইচ্ছা তার কোন কালেই ছিল না।

এ বিক্ষোভ তবে কি কেবল একটি মাত্র ছাত্রী হারাবার ভয়ে? সুমিতা সীমান্তে সিঁদুরের রেখা টেনে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে অন্য মানুষের হাত ধরে আর এক জগতে গিয়ে বাসা বাঁধবে, এ কলেজে আর আসবে না, সেই বিরাট শূন্যতা অনুভব করেই বুঝি তার অধ্যাপকসত্তা সব কিছুর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

এক বিন্দু চোখের জল এতটা আলোড়ন তুলবে এটা প্রিয়ব্রতর কল্পনাতীত ছিল। নেমে নেমে সে কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে, ভাবতেই শিউরে উঠল।

প্রিয়ব্রত ফিরল। লাইব্রেরিরুমে গিয়ে বসবে ভেবেছিল, তা আর গেল না।

অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষের দিকে পা চালাল। একলা থাকতে

প্রিয়ব্রতর সাহস হচ্ছে না। তার চেয়ে অন্য অধ্যাপকদের কথা-বার্তার মধ্যে সময়টা কেটে যাবে।

ঠিক অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষের চৌকাঠেই দেখা হয়ে গেল।

আপনাকেই খুঁজছিলাম স্যার।

গৌরী আর দীপিকা।

কি ব্যাপার, তোমাদের ক্লাশ নেই ?

না স্যার, এ পিরিয়ড ছুটি। 'দি হাউণ্ডস অফ স্প্রিং' কবিতাটি একবার বুঝিয়ে দেবেন ?

ক্লাশে তো বুঝিয়ে দিয়েছি একবার।

কিছু মাথায় ঢোকেনি স্যার, তাই আবার বিরক্ত করতে এলাম। আপনার অসুবিধে থাকলে অবশ্য দরকার নেই।

প্রিয়ব্রত খুব দ্রুত চিন্তা করে নিল। ছাত্রী সবাই সমান। তাদের জ্ঞানের পিপাসার নিবৃত্তি করা প্রতি অধ্যাপকের অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া, কিছুক্ষণের জন্য প্রিয়ব্রত নিশ্চিন্ত। কুৎসিত, অবক্ষয়ী চিন্তাটা অযুত বাহু দিয়ে তাকে নিষ্পিষ্ট করতে এগিয়ে আসবে না।

এস।

প্রিয়ব্রত বিশ্রামকক্ষে ঢুকে পড়ল। পিছন পিছন গৌরী আর দীপিকা।

এ কক্ষ প্রায় খালি। কেবল একেবারে কোণে বসে গণিতের অধ্যাপক অনাদিবাবু নিদ্রা যাচ্ছেন। তারই সরব ঘোষণা এদিকেও শোনা যাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত বসল। পাশের দুটি চেয়ারে গৌরী আর দীপিকা।

এই কবিতাটি শিকারের গ্রীক দেবী আর্টিমিস-এর প্রতি একটি স্তোত্র। শিকার সাধারণত বসন্ত কালের উৎসব। কঠিন রিক্ত শীত ঋতুর পর বসন্তের আবির্ভাব। রিক্ততার পরিবর্তে পূর্ণতা। শ্বেত বর্ণের পরিবর্তে শ্যামলতা। এই সময় পত্রে পুষ্পে, পাখীর কাকলীতে পৃথিবীকে যৌবনবতী মনে হয়। এই কাব্যে এক

উৎসবময়তা, উচ্ছলতার চিত্র বিধৃত হয়েছে। কবিতাটির ছন্দ আয়াম্বিক।

এই কবিতাটির সঙ্গে সুইনবার্ণ একাত্ম হতে পেরেছিলেন কারণ সুর আর ছন্দ তাঁর কাব্যের প্রাণ, এই কবিতাটির বিষয়বস্তুও পৃথিবীর সুর আর ছন্দের হিল্লোল। বসন্তের নিখুঁত একটি ছবি আমরা—

প্রিয়ব্রত থেমে গেল।

মনে হল বিশ্রাম-কক্ষের বাইরে দিয়ে কে একজন চলে গেল। খুব মৃদু মন্দগতিতে। গোলাপী রংয়ের একটা আভা তার চোখে পড়ল।

সুমিতার পরণে গোলাপী রংয়ের শাড়ীই ছিল।

সুমিতারও এ পিরিয়ডে ক্লাশ নেই। সুমিতাই হয়তো গেল করিডর দিয়ে। নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে গৌরী আর দীপিকাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে প্রিয়ব্রত পড়াচ্ছে। অবশ্য এতে সুমিতার আপত্তি করার কি আছে? তার মনোবেদনার কোন কারণই থাকতে পারে না।

এমন কিছু অলিখিত চুক্তি প্রিয়ব্রত কোন দিন করেনি যে সুমিতাকে বাড়ীতে পড়ায় বলে কলেজের আর কোন মেয়ে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে, কোন্ বিশেষ কবিতা বুঝতে চাইলে, বোঝাতে পারবে না, আলোচনা করতে পারবে না।

কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে সুমিতা তার কাছেই আসছিল। আরো কিছু তার বলবার ছিল। নিজের সম্বন্ধে, নিজের জীবন সম্পর্কে।

চলি স্যার। এখনই ঘণ্টা পড়বে।

দীপিকা উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী।

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না। দু হাতে মাথাটা টিপে ধরে চুপচাপ বসে রইল।

কথা বললেন অনাদিবাবু। তিনি কখন ঘুম থেকে উঠে বসেছেন, নাসিকাধ্বনি বন্ধ হয়েছে, প্রিয়ব্রত খেয়ালই করে নি।

আপনিই আমাদের সর্বনাশ করবেন প্রিয়ব্রতবাবু।

সর্বনাশ করব ?

নির্ঘাৎ।

কেন বলুন তো ?

ক্লাশের পরেও ছাত্রীদের নিয়ে যদি কমনরুমে এভাবে অধ্যাপনা করেন তাহ'লে এরা আর প্রাইভেট টিউটর রাখবে কেন ? প্রত্যেক দিন ছুটির পিরিয়ডে ছলছুতো করে আপনার কাছে এসে বসবে। ব্যস, আমরা যারা টিউশনির অন্ন খুঁটে খুঁটে খাই তাদের অবস্থা কাহিল।

প্রিয়ব্রত হাসল, কিন্তু আপনার ভয় কি ? আপনি তো গণিতের প্রফেসর। আপনার টিউশনির অন্ন তো বাঁধা।

কোথায় আর বাঁধা। আপনার দেখাদেখি গণিতের আর এক প্রফেসর নারায়ণবাবু বিনামূল্যে বাড়িতে বিদ্যাদান করলেই তো হয়ে গেল।

অনাদিবাবু আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঘণ্টার শব্দ কানে যেতেই তীর বেগে বেরিয়ে গেলেন।

বিকাল বেলা খাতাটা হাতে করে চৌরাস্তার মোড় অবধি গিয়ে প্রিয়ব্রতর খেয়াল হ'ল।

আজ সুমিতার বাড়ি পড়াতে যাওয়া বারণ। আজ তাকে কোথা থেকে দেখতে আসবে।

কিছু বলা যায় না প্রিয়ব্রতকে সুমিতাদের বাড়ী আর হয়তো যেতেই হবে না। যদি এখানে সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়, তাহলে সুমিতা সম্ভবত আর কলেজেই যাবে না।

মণীশের কাছে কিছু কিছু প্রিয়ব্রত শুনেছে। বনেদী ঐতিহ্যের এইটুকুই অবশিষ্ট আছে। ইঁট, কাঠ, লোহা ধসে পড়ছে, তবু নীরস

আভিজাত্যের কাঠামোটা প্রাণপণে সবাই আঁকড়ে ধরে আছে, এ তালপুকুরে ঘটিও ডোবে না, তবু অন্য সায়রে গা ডোবাতে কেউ রাজী নয়।

মেয়েকে আরো অল্প বয়সে মা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পারেন নি দুটি কারণে।

প্রথম সুমিতার বাপের অকালমৃত্যুতে সমস্ত সংসার টলমল করে উঠেছিল। তলাফুটো পানসীতে জল ওঠার সামিল।

দ্বিতীয় কারণ, অর্থের অভাব। তখনও মণীশ কিছু জোটাতে পারেনি। বাড়ীও টুকরো টুকরো হয়ে চার ভাগ হয়েছে। শুধু সামান্য ভাড়াটুকুই সম্বল।

তাই সুমিতা পড়বার স্বাধীনতা পেয়েছিল। যতদিন না পাত্রের জোগাড় হয় পড়ুক মেয়েটা। সমর্থ বয়সের মেয়ে চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকাটাও নিরাপদ নয়।

প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যানবাহন দেখল। জনতার চাপে ক্লিষ্ট নগরীর চেহারা।

এই মুহূর্তে বাড়ী ফিরে যেতে তার ভাল লাগছে না। ফিরে গেলেই নির্জন কক্ষে নিজের জীবনের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে। সারাটা দিন জীবিকার চাপে জীবন চাপা পড়ে যায়, কর্মব্যস্ততার প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু একটু অবসর পেলেই মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার হাজার প্রশ্ন, হাজার সমস্যা নিয়ে।

মাঝে মাঝে মা অবশ্য লিখেছে। বিয়ে-থা করে প্রিয় সংসারী হোক। দরকার হলে মা দু একদিন শহরে এসে থাকবে। প্রিয়ব্রতর সংসারে।

কিন্তু প্রিয়ব্রত জানে এ গুলো মার মনের কথা নয়। বিদেশে ছেলের থাকতে হয়তো কষ্ট হচ্ছে একথা অনুমান করেই এসব স্তোকবাক্য লেখার প্রয়োজন হয়েছে।

প্রিয়ব্রত সংসার পাতলে আর একটা সংসারের অবস্থা কি হবে

সেটা নিশ্চয় মার অজানা নয়। এভাবে মাসে মাসে অর্থসাহায্য করাও হয়তো সম্ভব হবে না। নতুন মানুষ যে প্রিয়ব্রতর সংসারে আসবে সে কি ভাবে দেখবে পুরোনো সংসারকে সেটাও একটা সমস্যা।

প্রিয়ব্রতরা এ সংসারে শুধু রক্ত দিতে আসে! নিজেদের নিঃশেষ করে সংসারের অন্য শরিকদের পুষ্টি সাধন করার কথা ভাবতে হয়।

নিজেদের কথা চিন্তা করা প্রিয়ব্রতদের পাপ, অন্যায়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রিয়ব্রত মোড়ের স্টলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বইয়ের স্টল। কিছু লোক ভিড় করেছে। সম্ভবত আজ বিয়ের দিন। আশার কথা যে কিছুলোক এসব অনুষ্ঠানে বই উপহার দেবার কথা চিন্তা করে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত দেখল।

শো-কেসে বইয়ের মেলা। উত্তেজক মনের খোরাক চটুল বিদেশী সাহিত্যর নিকৃষ্ট অনুবাদ। ভাল জিনিসের কদর এখানেও কম। সাজানোর মধ্যেও কোন রুচির স্পর্শ নেই। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্র।

জাতির জীবনে যেন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। সর্বক্ষেত্রে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবাহ।

প্রিয়ব্রত সরে এসে দাঁড়াল। সামনে একটা বাস থামতেই কিছু না ভেবে উঠে পড়ল।

বাস ছেড়ে দেবার পর, ভিড়ের চাপ থেকে সরে সরে একটু দাঁড়াবার মতন জায়গা করে প্রিয়ব্রতর কথাটা মনে হ'ল। অযথা এ ভ্রমণ-বিলাস তার মত লোকের সাজে না। এখন যে নেমে যাবে সে পথও বন্ধ। ভিড় ঠেলে নামা যথেষ্ট পরিমাণে দুঃসাধ্য।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত নিজেকে তিরস্কার করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই খেয়াল হ'ল অনেকগুলো লোক নেমে যাচ্ছে। বাস একটু ফাঁকা। ভাড়া দিয়ে প্রিয়ব্রত ত্বরিত পায়ে নেমে পড়ল।

লেক। শহরের বিক্ষুব্ধ আত্মা এখানে বুঝি মুক্তির নিশ্বাস নিতে আসে। বেঞ্চে, গাছের তলায়, ঘাসের ওপর মানুষের জটলা। জলেও কিছু নৌকা ভাসছে। এ জীবনের সঙ্গে প্রিয়ব্রতর কোন পরিচয় নেই। মধ্যবিত্ত জীবন তাকে ক্ষণেকের অবকাশ দেয়নি, সাময়িক বিরতি নয়। এক মুষ্টি অন্নের জন্য, এক টুকরো কার্পাসের জন্য তাকে দুর্নিবার সংগ্রাম করতে হয়েছে। আকাশের নীল, বনানীর শ্যামলীমা, সায়রের মৃদুজল-কল্লোল, এ সব অন্য জগতের, অন্য মানুষের।

অন্ধকার নামতে প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আজ কাজ শুরু করতে হবে। ডি. ফিল, ডিগ্রিটা আহরণ করতে পারলে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে হয়তো কিছু সুবিধা হবে। অর্থ আর পরমার্থ দুদিক দিয়েই।

প্রিয়ব্রতর ঘরে ঢোকবার মুখে অনেকটা জায়গা জুড়ে অন্ধকার। রাস্তার আলো এতদূরে এসে পৌঁছায় না। আশ-পাশের বাড়ীর কোন আলোর রেখাও নেই।

প্রিয়ব্রতর কোন অসুবিধা হয় না। আসা-যাওয়া করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

সে রাতে কিছুটা এগিয়েই থেমে গেল। সামনে অন্ধকার যেন আরো ঘন, আরো জমাট।

এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন?

রত্নার গলা। গলার স্বরে চেষ্টাকৃত কোমলতা।

প্রিয়ব্রত দু এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, আজ পড়াতে যাইনি। শরীরটা খারাপ লাগছে।

এ কথার পরই রত্না এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। একটা হাত রাখল প্রিয়ব্রতর গায়ে।

জ্বরটর হয়নি তো? চারদিকে ভীষণ অসুখ বিসুখ হচ্ছে।

শরীরে আচমকা একটা ভুজঙ্গের স্পর্শ পেলেও প্রিয়ব্রত এতটা শিউরে উঠত না।

প্রিয়ব্রত নিজেকে সংযত করল। কঠোর কঠিন গলায় বলল, শরীর আমার খুব ভালই আছে। সর, রাস্তা ছাড়।

এতটা নির্লিপ্তি বোধ হয় রত্না আশা করেনি। সহৃদয়তার পরিবর্তে তুহিন শীতল ঔদাসীন্য।

আস্তে আস্তে সরে গেল, কিন্তু চলে গেল না সেখান থেকে।

প্রিয়ব্রত দরজা খুলল। বাতি জ্বালাল। সেই বাতির দীপ্তি বাইরে এসে পড়ল। রত্নাকে এবার স্পষ্ট দেখা গেল।

কবরী ঘিরে লাল গোলাপের মালা। পরনে মহার্ঘ বসন। প্রসাধনের উগ্রতাও নজর এড়াল না।

জানেন আজ আমাকে দেখতে এসেছিল।

রত্না চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়াল।

অ। টেবিলের ওপর বই খুঁজতে খুঁজতে প্রিয়ব্রত নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিল।

পাত্র নিজে এসেছিল।

রত্না একটু হাসবার চেষ্টা করল।

তাই বুঝি? এবারেও প্রিয়ব্রতর নিরুত্তেজ নিরুদ্বেগ স্বর।

কি বিশ্রী যে দেখতে কি বলব আপনাকে? বিশেষ করে আপনার কাছে দাঁড়ালে আপনার চাকর মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

তুলনায় প্রিয়ব্রত বিস্মিত হ'ল। ধাপে ধাপে রত্না এগিয়ে চলেছে। এই বেলা নিজে না সাবধান হলে প্রিয়ব্রতই বিপদে পড়বে।

আচমকা গামছাটা নিয়ে প্রিয়ব্রত বাথরুমের দিকে চলে গেল। দ্রুত পায়ে, রত্নার পাশ কাটিয়ে।

টিনের দরজাটা বন্ধ করে প্রিয়ব্রত অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় নিশ্বাস রোধ করে। যেন একটা বিভীষিকা থেকে সে আত্মগোপন করতে চাইছে। ভয়ের আওতা থেকে নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে যাবার দুর্বার চেষ্টায় গলদঘর্ম।

অনেক সময় পার করে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে এল। ভীত, চকিত দৃষ্টি এদিক-ওদিক ফেরাতে ফেরাতে।

না, রত্না ধারে কাছে কোথাও নেই। শুধু চৌকাঠের ওপর তার কবরীচ্যুত একটি গোলাপ পড়ে রয়েছে। গাঢ় রক্তবর্ণ। রত্নার হৃদয়ের ক্ষরিত শোণিত বিন্দুর মত।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই প্রিয়ব্রত দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

প্রিয়ব্রত বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন করছে। রত্নার সঙ্গে এতটা নির্মম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিজের শঙ্কিত, অতৃপ্ত হৃদয়ের মাপকাঠি দিয়ে প্রিয়ব্রত সকলের বিচার করছে।

সে রাতে রত্না আর নামল না। একটু পরে বাইরে থেকে পতিতপাবনবাবু ঢুকলেন, খুব ব্যস্ত আছেন নাকি ?

প্রিয়ব্রত একটা ইংরাজী প্রবন্ধের বই পড়ছিল, বইটা সরিয়ে রেখে বলল, না, না, আসুন ভিতরে।

পতিতপাবনবাবু ভিতরে এসে তক্তপোশের ওপর চেপে বসলেন।

আজ বালী থেকে এক ভদ্রলোক রত্নাকে দেখতে এসেছিল। ভদ্রলোকের রত্নাকে খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু রত্নার একেবারে পছন্দ হয়নি। মেয়ে এমন মুখ ফিরিয়ে বসল, আমি মশাই অপদস্থের একশেষ।

প্রিয়ব্রত কোন কথা বলল না। তার মনে পড়ল এই শহরেরই আর এক প্রান্তে এমনি দেখা-দেখির পালা চলেছে। সেখানেও মেয়ে এমন মুখ ফিরিয়ে থেকেছে কিনা সে সংবাদ প্রিয়ব্রতর কাছে আসেনি। সে মেয়ে এত প্রগলভা, এমন চটুল নয়, মাথা নীচু করে যূপকাষ্ঠে নিজেকে সঁপে দিতে দ্বিধা করবে না। আগে জাত তারপর হৃদয়।

এসব কি অবাস্তর কথা প্রিয়ব্রতর মস্তিষ্কে বাসা বেঁধেছে ভেবেও তার মেজাজ তিক্ত হয়ে গেল। হৃদয়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। দু চোখের দু বিন্দু জলকে আশ্রয় করে শূন্যে প্রসাদ নির্মাণ মুর্খতার নামান্তর।

আপনার যে মশাই ধনুক ভাঙা পণ, বোনের বিয়ে না হ'লে বিয়ে করবেন না, তা না হলে আর আমার ভাবনা কি। রত্নার আপনাকে খুব পছন্দ। আর আপনি তো রত্না কি ধরণের মেয়ে দেখছেনই।

দুটো হাতের মধ্যে থুতনিটা রেখে প্রিয়ব্রত চুপচাপ বসে রইল। পতিতপাবনবাবুর কথাগুলো কানে গেল বটে কিন্তু কথাগুলো কোন অর্থবহ বলে মনে হ'ল না। পৃথিবীর অন্যসব পরিচিত, অর্ধপরিচিত শব্দের মতন, এগুলোও যেন শব্দের সমষ্টি মাত্র।

আজ রত্না কি নিজেকে উন্মোচিত করতে এসেছিল প্রিয়ব্রতর কাছে? কাউকে ভাল লাগা অপরাধ নয়। নিজেকে নিবেদন করার মধ্যেও অশালীন কিছু নেই।

সাহসের অভাবে, অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য যা করতে প্রিয়ব্রতর মন দ্বিধাদ্বন্দ্বে অগ্রসর হতে পারেনি, রত্না তা পেরেছে। প্রিয়ব্রতকে যদি তার ভাল লেগে থাকে, হাবে-ভাবে সে কথা জানাতেই সে এগিয়ে এসেছিল।

রত্নার বাইরের নির্মোকটুকু দেখে প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়েছিল, তার নারীত্বকে সম্মান দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছে।

কি ক্ষতি ছিল, রত্নাকে সোজাসুজিভাবে বুঝিয়ে বলতে, প্রিয়ব্রতর মন অন্যত্র বাঁধা, তাই প্রিয়ব্রত রত্নার এ আহ্বানে সাড়া দিতে অক্ষম।

কিছুক্ষণ পরে পতিতপাবনবাবু উঠে গেলেন।

যন্ত্রচালিতের মতন প্রিয়ব্রত দরজায় খিল তুলে দিল। অন্ধকার করে দিল ঘর।

এই অন্ধকারে, নির্জন প্রকোষ্ঠে সে নিজের অন্তরের মুখোমুখি দাঁড়াবে। ভীরু, দ্বিধাগ্রস্থ, দুর্বল অন্তর।

কলেজে সুমিতা আসেনি।

পড়াতে পড়াতে প্রিয়ব্রতর চোখ বার বার সুমিতা সাধারণতঃ যেখানে বসে সেখানে ঘুরে ফিরে গেল। অনেকবার প্রিয়ব্রত আলোচনার খেই হারাল। পরিচিত কবিতাগুলোর লাইন, খ্যাতনামা সমালোচকদের উদ্ধৃতিগুলো ঘুলিয়ে ফেলল। গৌরী দীপিকার দল মুখ টিপে হাসাহাসি করল, তবু প্রিয়ব্রত আত্মস্থ হ'তে পারল না।

পিরিয়ড শেষ হ'তে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে পার্কে গিয়ে নামল।

পার্ক জনবিরল নয়। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভার। ধরিত্রী প্রথম বর্ষণ বুকে নেবার জন্য উন্মুখ।

কলেজের দু একটি ছাত্রী ইতস্তত বিচরণ করছে।

প্রিয়ব্রত একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল।

সুমিতা আসেনি। হয়তো যারা দেখতে এসেছিল, তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে, একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে তারা ফিরে গেছে।

সুমিতা আর আসবে না।

পঁয়তাল্লিশটি মেয়ের জায়গায় এখন থেকে চুয়াল্লিশ। কিন্তু শুধু কি একটি মেয়েরই সরে যাওয়া? কলেজের খাতায় হয়তো তাই।

কিন্তু প্রিয়ব্রতর কাছে একটা জীবন তার দুঃসহ যন্ত্রণা, অপরিসীম সম্ভাবনা, বিচ্ছুরিত আনন্দের দীপ্তি নিয়ে সরে যাবে একটা মধ্যবিত্ত, কাপুরুষ অধ্যাপকের আয়ত্বের বাইরে।

পদচারণরত ছাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন জাগল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জুঁইফুলী ধারায়।

ছুটতে ছুটতেই কে একজন দেখল, প্রিয়ব্রত তখনও তন্ময় হয়ে বেঞ্চের ওপর বসে রয়েছে।

ছু এক মুহূর্তের দ্বিধা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ছাত্রীটি বলে উঠল, বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে স্যার।

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। বসে থাকতে ভাল লাগছিল। এই নম্র, শীতলধারায় মনের সঙ্কোচ বাধা সব কিছু ধুয়ে মুছে যাক। অধ্যাপক প্রিয়ব্রতকে পুরুষ করে তুলুক।

কলেজের দিকে পা চালাতে চালাতে প্রিয়ব্রত প্রতিজ্ঞা করল। দেরী নয়, দ্বিধা নয়। সুমিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে প্রিয়ব্রত। নিজের পরিপূর্ণ জীবন অঞ্জলি দেবে। নিজেকে উপঢৌকন দেবে প্রেমের দরবারে।

বৃষ্টি আরো জোরে এল। অযুত ধারায়। এতদিনে বুঝি মাটির তৃষ্ণা মিটল। হাজার ফাটল দিয়ে জলকণা শুষে নিচ্ছে মেদিনী।

প্রিয়ব্রতর পিপাসার্ত মন কবে শান্তি পাবে, তৃপ্তি পাবে!

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে প্রিয়ব্রত আবৃত্তি করল,—

Take all my loves, my love, yea, take them all ;
What hast thou then more than thou hadst
before ?

আশপাশের ছাত্রীদের ভ্রূকুটি, কুটিল দৃষ্টি, চাপা হাসি সব উপেক্ষা করল প্রিয়ব্রত, অন্তর্লোকের অপূর্ব মহিমান্বিত শাশ্বত আনন্দের স্পর্শে।

রাত্রে খেতে বসার সময় পতিতপাবনবাবু এসে হাজির হলেন। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক আসেন। খোঁজখবর নেন। নিজের খবরও দেন।

কেমন আছেন প্রিয়বাবু? চৌকাঠ চেপে পতিতপাবনবাবু বসলেন।

এই চলে যাচ্ছে। আমাদের আর ভাল থাকাথাকি কি।

নিস্তরঙ্গ জীবন। জীবনের দুটি প্রান্ত দুটি খুঁটিতে বাঁধা। টিউশনি আর অধ্যাপনা।

শরীর দুলিয়ে পতিতপাবনবাবু হাসলেন, বেশ কথা বলেন মশাই আপনি। লেখাপড়াজানা লোক তো, কথাবলার কায়দাই আলাদা। যাক, একটা কাজের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

বলুন। প্রিয়ব্রতর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে জলের গ্লাসে চুমুক দিল।

মেয়েটার কথা বলছিলাম। আপনার তো নানা জায়গায় যাতায়াত আছে, অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা, দেখুন না মেয়েটার যদি একটা সম্বন্ধ ঠিক করে দিতে পারেন। অনেক কষ্টে একটা সম্বন্ধ এনেছিলাম, সে তো হল না। মেয়েটা সংসার মাথায় করে রয়েছে, সেইজন্য তার বিয়ে দিলে আমার ক্ষতি অনেক, তা জানি, কিন্তু সমর্থ মেয়েকে পাত্রস্থ না করাও তো একটা অপরাধ। ঠিক কিনা বলুন, প্রিয়ব্রতবাবু?

ঠিক কি বেঠিক প্রিয়ব্রতবাবু কিছু বলল না, শুধু ঘাড় নাড়ল, আচ্ছা, আমি দেখব এখন।

মেয়ে দেখতে একটু খারাপ, তা বাঙালীর ঘরের মেম আর কোথায় পাচ্ছেন বলুন, তবে মেয়ের আমার গুণের তুলনা নেই।

পতিতপাবনবাবু আরো কিছুক্ষণ হয় তো চালাতেন, কিন্তু তাঁকে থামতে হ'ল। ওপর থেকে রত্নার গলার আওয়াজ, বাবা।

কিরে?

শোবে না? কত রাত হয়েছে খেয়াল আছে।

প্রিয়ব্রত টেবিলের ওপর খুলে রাখা নিজের হাতঘড়ির দিকে দেখে বলল, দশটা।

দশটা? উঠি তাহ'লে। আপনার তো আবার পড়াশোনা আছে। দেখবেন যা কিছু করবেন, শরীর সামলে। ছেলেবেলায় শরীরের দিকে নজর দিয়েছি, তাই এখনও স্বাস্থ্য অটুট রয়েছে।

শরীর গেলে বাঁচা মরা সমান। আমার স্ত্রীকে দেখুন না। বার মাস শয্যাগত।

পতিতপাবনবাবু যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, রত্নার কথাটা মনে রাখবেন।

পতিতপাবনবাবু বেরিয়ে যেতেই সুমিতা এসে ঘরে ঢুকল। তেমনই অশ্রুসজল দুটি চোখ। কম্পান্বিত ওষ্ঠাধর।

কি চায় সুমিতা? কিছু যেন বলতে চায়। প্রিয়ব্রতকে বলবার তার কি থাকতে পারে?

প্রিয়ব্রত পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। হাতের কাছে যে বইটা এল সেটাই প্রিয়ব্রত খুলল। সব বইগুলোই শেলীর সম্বন্ধে। লাইব্রেরি থেকে একরাশ বই এনেছে, কিন্তু পড়া হচ্ছে না।

যেটা হাতে উঠল সেটা শেলীর একটা কাব্যগ্রন্থ। শেলী না এলে সুমিতা যাবে না।

Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed!

এই জীবনযন্ত্রণা থেকে কারও বুঝি অব্যাহতি নেই! মুক্তি নেই কোন মানুষের।

মোটা একটা খাতা খুলে প্রিয়ব্রত লিখে চলল। শেলীর দর্শন প্রাচ্যদর্শন, তাঁর জীবনকে দেখার ভঙ্গীও প্রতীচ্যের অনুরূপ নয়। কাঠামো পাশ্চাত্যের, কিন্তু তার মধ্যে প্রাচ্য মন, এই হচ্ছে শেলীর সঠিক বিশ্লেষণ।

সেদিন কলেজের কাছাকাছি গিয়েই প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল।

গেটের কাছে মেয়েরদল চাক বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে অধ্যাপকের দল। অধ্যক্ষও রয়েছেন। তাঁরা ছাত্রীদের কি বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

পায়ে পায়ে প্রিয়ব্রত এগিয়ে গেল।

কোথায় কোন ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হয়েছে। তমলুকে বোধহয়। তারই প্রতিবাদে হরতাল পালিত হচ্ছে। মেয়েরা ক্লাশে যাবে না। অধ্যাপকদেরও যেতে দেবে না।

চেয়ে চেয়ে প্রিয়ব্রত দেখল। ফোর্থ ইয়ারের প্রিয়ম্বদা সেন রয়েছে সামনে। মনে হ'ল আজকের এই ব্যাপারে সেই নেত্রী। তার সঙ্গে আলাপ নেই, কিন্তু তার সম্বন্ধে প্রিয়ব্রত অনেক শুনেছে। কলেজের যে কোন ব্যাপারেই সে এগিয়ে আসে। সামান্য ঘটনাকে অসামান্য করে তোলার কাজে তার অসীম শক্তি। ইতিমধ্যেই পার্কে ময়দানে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। সংবাদপত্রে তার বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। মোট কথা, প্রিয়ম্বদা একজন হোমরা চোমরা ছাত্রনেত্রী।

তার পাশে আরো কয়েকজন মেয়ে রয়েছে। সকলকে প্রিয়ব্রত চেনে না। কেউ থার্ড ইয়ারের, কেউ ফোর্থ।

দেখতে দেখতে গৌরীর ওপর চোখ পড়ল। অধ্যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে সে হাত মুখ নেড়ে উত্তেজিত কণ্ঠে কি বলছে।

তার আজকের সাজের তুলনা নেই। ঘাড়ের দু' পাশে বেণী দুলিয়েছে। গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ, কপালে লম্বা ফাগের টিপ। শরীর ঘিরে আঁটসাঁট শাড়ী। হাতে জয়পুরী বটুয়া। হাতমুখ নাড়ার ফাঁকে ফাঁকে সামনের অপেক্ষমান জনতার দিকে বিলোল-কটাক্ষে দেখছে।

পথ চলতি লোক ছাড়া, বই হাতে অন্য স্কুল কলেজের ছেলেরাও এসে জুটেছে। তারাও মাঝে মাঝে শ্লোগান তুলছে। অন্যায়ের, অবিচারের, অত্যাচারের প্রতিকার চাই।

প্রিয়ব্রত এবার দু' তলার দিকে চোখ ফেরাল। অনেকগুলো মেয়ের মাঝখানে সুমিতাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। অসীমা রয়েছে, দীপিকাও। ফার্স্ট ইয়ারের বাণী, মীরা, মৈত্রী এদেরও চিনতে পারল। সুমিতা তাহলে এসেছে কলেজে।

প্রিয়দা।

প্রিয়ব্রত ঘুরে দাঁড়াল। একটু দূরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিত্ত বাদাম মুখে দিচ্ছিল। প্রিয়ব্রত তার কাছে যেতে বলল, কেন আর ভীড় বাড়াচ্ছেন। এদিকে সরে আসুন। নিন গরম বক্তৃতার সঙ্গে গরম বাদামভাজা খারাপ লাগবে না।

হাত পেতে বাদাম নিতে নিতে প্রিয়ব্রত বলল, এ সব কি তমলুকের সেই ছেলেটার জন্য বুঝি?

চিত্ত কপট বিস্ময় প্রকাশ করল, কি বলছেন আপনি? ওরা কি আওয়াজ তুলছে শোনেন নি? আজকাল ও-সব ভেদাভেদ আছে নাকি? তমলুক্-টোরাণ্টো-টোকিয়ো সব এক। এই সব অধ্যাপক-দেরও অন্যায়। যদি একদিন ক্লাশে না গেলে অত্যাচার, অবিচারের প্রতিকার হয়, তাহলে যাবার দরকারটা কি!

প্রিয়ব্রত কিছু বলল না। চুপচাপ বাদাম মুখে ফেলল।

কিন্তু বেশীক্ষণ প্রিয়ব্রত চুপচাপ থাকতে পারল না।

হঠাৎ ফুটপাতে দাঁড়ানো জনতার মধ্যে একটা চীৎকার, তার-পরই সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিকে ছুটতে আরম্ভ করল। পলায়মান জনতার মুখ থেকেই দু' একটা কথা ছিটকে এল, পুলিশ, পুলিশ।

প্রিয়ব্রতর কলেজ জীবন কলকাতায় কেটেছে। এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে সে অল্পবিস্তর পরিচিত।

পাশ ফিরে দেখল চিত্ত নেই। ভীড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

প্রিয়ব্রত পাশের সরু গলিটার মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে মুখ ফিরিয়ে দেখল কলেজের সামনে দুটো কালো গাড়ী এসে থামল। তারপরই দরজা খুলে পুলিশের দল লাফিয়ে পড়ল ফুটপাতের ওপর। তাদের ভারি বুটের শব্দের সঙ্গে মেয়েদের তীক্ষ্ণকণ্ঠস্বর শোনা গেল। ছত্রভঙ্গ জনতা একটু দূরে গিয়ে জমাট বাঁধল।

চলতে চলতেই প্রিয়ব্রত ভাবল, কে করলে এমন বোকামি। এ ভাবে পুলিশকে খবর দেবার কি প্রয়োজন ছিল। ছোট একটা ব্রণকে খুঁটে খুঁটে ক্ষত করার দুর্বুদ্ধি। মেয়েরা কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে

ক্লান্ত হয়ে যে যার বাড়ীতে ফিরে যেত। বড় জোর একটা দিন কলেজ বন্ধ রাখতে হত, তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

এবার বাঘে ছোঁয়া মানেই আঠারো ঘা।

কলেজের পিছনেই বিরাট একটা বস্তি। তার পাশে গিয়ে প্রিয়ব্রত থামল। না, আর কোন গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। মেয়েদের কণ্ঠ নীরব। প্রিয়ব্রত আবার কলেজের দিকে ফিরে এল।

পুলিশরা সার দিয়ে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা সব দু' তলায় উঠে গিয়েছে। সেখান থেকে দু' পক্ষে কথা হচ্ছে।

অধ্যাপকদেরও ধারে কাছে দেখা গেল না।

আবার প্রিয়ব্রত ফিরে এল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। রাস্তার ওপরে জনতা জমাট বেঁধে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে পুলিশকে টিটকারি দিচ্ছে। এদের মধ্যে থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে দু একটা ইঁট পাটকেল ছোঁড়া কিছুই বিচিত্র নয়।

এখানে দাঁড়ানো সমীচীন নয়। কলেজের পাশের গলি দিয়ে প্রিয়ব্রত আবার ফিরে চলল।

কিছুটা যেতেই থামতে হল।

স্যর, স্যর। ভীত, সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

প্রিয়ব্রত পিছন ফিরে দেখেই আশ্চর্য হল। একটা কাঠ চেরাইয়ের কারখানা। চারদিকে কাঠের টুকরো ছড়ানো। তার এপাশে সুমিতা আর অসীমা।

সুমিতা আঁচলটা বুকে চেপে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়ব্রত কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কি ব্যাপার, তোমরা এখানে?

সুমিতা ঢোঁক গিলল। কথা বলার চেষ্টা করেও পারল না।

অসীমা কথা বলল, পুলিশের গাড়ী আসতেই কলেজের পিছনের দরজা দিয়ে আমরা ছুটে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু সুমি আর চলতে পারছে না। ওর শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।

প্রিয়ব্রত সুমিতার দিকে চোখ তুলে দেখল।

নিমীলিত চোখ, নীরক্ত মুখ, সমস্ত শরীর যেন বেতসপাতার মতন কাঁপছে।

প্রিয়ব্রত চিন্তিত হয়ে পড়ল। অসীমার দিকে চেয়ে বলল, আমি দেখি যদি একটা ট্যাক্সি জোগাড় করতে পারি।

বরাত ভাল প্রিয়ব্রতর। মোড়ের পেট্রোল পাম্পের সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

ট্যাক্সি নিয়ে যখন ফিরল, তখন সুমিতা একটা বেঞ্চির ওপর বসেছে, কিন্তু তার মুহ্যমানভাবটা কাটে নি।

সুমিতা আর অসীমা ট্যাক্সিতে উঠল।

একটু ইতস্তত করে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, তোমরা যেতে পারবে না?

সুমিতা বিহ্বল দুটি চোখ তুলে দেখল। অসীমা বলল, আপনি একটু সঙ্গে চলুন স্যর।

অগত্যা, প্রিয়ব্রতকে উঠতে হল।

মাঝখানে সুমিতা, একপাশে অসীমা, আর একপাশে প্রিয়ব্রত।

একটু এগোতেই বিপর্যয় ঘটল।

দূরে একটা টায়ার ফাটার শব্দ। সুমিতার সারা দেহ শিউরে উঠল, তারপর দুটো হাত দিয়ে সে সবলে প্রিয়ব্রতকে আঁকড়ে ধরে মুখটা তার বুকের ওপর গুঁজে দিল।

প্রিয়ব্রতর অবস্থা অবর্ণনীয়। পাশে অসীমা রয়েছে। প্রখর দিনের আলো। প্রকাশ্য রাজপথ। এমন নয়নমনোহর দৃশ্য দেখার চোখের অভাব নেই।

প্রিয়ব্রত উঠে যে সামনের সীটে যাবে সে উপায় নেই। ড্রাইভারের পাশে বিপুলকায় তার এক সহকারী আসীন।

অসীমা ব্যাপারটা বুঝল। বাইরের দিকে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল,

সুমির সাড় নেই। ভীষণ নার্ভাস মেয়ে। ও কি করছে নিজেই জানে না। খুব ভয় পেয়েছে।

প্রিয়ব্রত কিছু বলল না, শুধু একটু সরে বসবার চেষ্টা করল, তাও পারল না।

অসীমা সুমিতার মাথাটা ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিল, সুমি, এই সুমি। সুঁমি।

সুমিতা ক্লান্ত দুটি চোখ মেলল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

সুমিতার বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামল। খুব সাবধানে সুমিতাকে ট্যাক্সি থেকে নামানো হল। একটা হাত অসীমা ধরল আর একটা হাত প্রিয়ব্রত। বোধ হয় কোন জানলা থেকে দৃশ্যটা সুমিতার মা দেখে থাকবেন, এরা দরজার কাছ বরাবর যেতেই তিনি ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন।

কি হয়েছে সুমিতার, কি হয়েছে?

কিছু হয়নি, প্রিয়ব্রত আশ্বাস দিল, আপনি ভয় পাবেন না। ওর বিছানাটা ঠিক করে দিন আর বাড়ীতে যদি দুধ থাকে তো গরম করে খাইয়ে দিন।

সুমিতার মা আবার পাগলিনীর মতন ভিতরে ছুটে গেলেন।

সুমিতাকে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। মা মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগলেন। অসীমা পাশে বসল। প্রিয়ব্রত বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুমিতাকে পড়াতে আসতে যেতে লক্ষ্য করেছে মোড়ে একটা ডিসপেনসারি আছে। একজন ডাক্তারও বসেন।

সেই ডাক্তারকে নিয়ে প্রিয়ব্রত ফিরল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডাক্তার পরীক্ষা করলেন তারপর বললেন, কিছু হয় নি, একটু শুধু দুর্বল। ঘুমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। বাড়ীতে ব্র্যাণ্ডি আছে?

সুমিতার মা ঘাড় নাড়লেন। নেতিবাচক।

ঠিক আছে গরম দুধ তো দিয়েছেন, আমি ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, যদি ঘুম এসে যায় কিছু আর দেবেন না। না হলে, আর একবার একটু গরম দুধ খাইয়ে দেবেন।

প্রিয়ব্রত পকেটে হাত দিতে গিয়েই থেমে গেল, তার আগেই সুমিতার মা বালিশের তলা থেকে দুটো নোট বের করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাড়ীর ঝি গেল একটু পরে।

প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সুমিতার মা মেয়ের শিয়রে বসে বাতাস করছেন।

এতদিন ধরে প্রিয়ব্রত এ বাড়ীতে পড়াচ্ছে, কোনদিন সুমিতার মা সামনে আসেন নি। তাঁর অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় নি।

চেহারা দেখলেই বংশের আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘ, ঋজু দেহ। সূর্যমুখীর কাণ্ডের মতন। শঙ্খশুভ্র রঙ। এ বয়সেও আয়ত চোখ, উন্নত নাসা, রক্তিম অধর। যৌবনের অপরাহ্ণ, তবু তার অস্তরাগ এখনও দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতেই প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আজ আমি আসি মা। সুমিতার জন্য ভয়ের কিছু নেই। আপনি অসীমার কাছে নিশ্চয় সবই শুনেছেন। কিছুই হয় নি, শুধু ভয় পেয়েছে।

মনে হ'ল, মা ডাক সুমিতার মাকেও বিচলিত করল। তিনি আরক্ত হলেন, তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন, আপনার বড় কষ্ট হ'ল।

উত্তর দিতে গিয়েই প্রিয়ব্রত থেমে গেল। সুমিতা কি একটা বলছে।

স্যর, কাল কি কলেজ খোলা? খুব অস্পষ্ট গলায় সুমিতা প্রশ্ন করল কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

প্রিয়ব্রত হেসে ফেলল, সেজন্য তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। কলেজের খবর অসীমা তোমায় দিয়ে যাবে।

বেরোবার মুখে প্রিয়ব্রত অসীমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি এখন আছ তো কিছুক্ষণ ?

হ্যাঁ স্যর, সুমিকে ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে তবে যাব।

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসেই বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করল। মনে হ'ল নিজের খুব দামী একটা জিনিস যেন পিছনে ফেলে এসেছে।

পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে লুকোচুরি চলে কেবল নিজের মনের সঙ্গে নয়। নিজেকে প্রিয়ব্রত যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক যে সম্পর্কটা গুরু শিষ্যের, কাম-গন্ধহীন, কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে তিল তিল করে বিচিত্র এক অনুভূতি হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে। সুমিতা পরিব্যাপ্ত সারা অন্তরে।

নিজের রক্তকণা, নিজের অস্থিমজ্জাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অস্বীকার করা যায় না সুমিতার গোপন সম্পর্ক।

আজ নিবিড় স্পর্শ দিয়ে সেই সত্যই বুঝি সুমিতা প্রমাণ করে দিল!

প্রিয়ব্রতর চেয়ে চিত্তর উৎসাহই যেন বেশী। আজকাল দু জনেই সময় পায় না। পরীক্ষা সামনে। ছাত্রছাত্রীদের পড়ার চাপ বেশী, তার ওপর কলেজের অধ্যাপনা তো রয়েইছে।

ইতিমধ্যে চিত্ত বার তিনেক প্রিয়ব্রতর বাসায় গিয়ে তাকে কবিতা শুনিয়ে এসেছে। মারাত্মক আধুনিক কবিতা নয়। ছন্দ আছে, মিল আছে, প্রাণ আছে।

তারপরই তাগিদ দিয়েছে, কই প্রিয়দা, আপনাদের দেশে নিয়ে গেলেন না? প্রিয়ব্রত হেসেছে, আমি যে যাবার সময়ই পাচ্ছি না।

পড়ানোর চাপ পড়েছে, তার ওপর থিসিস নিয়ে প্রাণান্ত। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

আর দেরী করবেন না, যত দিন যাবে আপনি ততই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। শুনলাম এর পরের বছর থেকে বি-এ ক্লাশেও আপনি পড়াবেন।

প্রিয়ব্রত হাসি থামাল না, যদি ডি-ফিল জুটে যায় তাহ'লে অন্য কোন কলেজে বরাত ঠুকে দেখব। এই অম্বা অম্বালিকাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।

চিত্ত কিছু বলল না, কেবল দুটি চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে প্রিয়ব্রতর আপাদমস্তক দেখল।

প্রিয়ব্রত কিন্তু কথা রাখল। দিন পনেরো পরেই চিত্তকে সঙ্গে নিয়ে দেশে রওনা হ'ল।

তার আগেই মাকে চিঠি লিখে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল নীলাকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে আর চিত্তর পরিচর্যার ভারটা নীলার ওপরই যেন দেওয়া হয়। উদ্দেশ্যটাও সবিস্তারে লিখেছিল।

সবই ঠিক হ'ল। সেজেগুজে নীলা সামনে এল, চায়ের কাপ, জলখাবারের ডিশ এগিয়ে দিল, ভাতের থালাও, কিন্তু তার হাবভাব কেমন নিষ্প্রাণ। নেহাৎ যেন করতে হবে বলেই করছে।

দুটি তরুণ তরুণীর সান্নিধ্যে দু' পক্ষে যে লজ্জার জড়িমা, আবেশ-ময়তা জাগে তার কিছুই দেখা গেল না। চিত্ত তবু কিছুটা সঙ্কুচিত হ'ল, কিন্তু নীলা যেন কলের পুতুল।

মার কিন্তু ছেলেটিকে বেশ পছন্দ। প্রিয়ব্রতকে আড়ালে ডেকে খোঁজখবর নিল। অমন ছেলে মূর্খ মেয়েকে বিয়ে করবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করল।

প্রিয়ব্রত চিত্তর সঙ্গে কথা বলল পরের দিন ফেরার সময়। ট্রেনে।

নীলাকে কেমন লাগল ?

চিত্ত একটু অন্যমনস্ক ছিল। সম্বিত পেয়ে প্রিয়ব্রতর দিকে ফিরে বলল, আপনার বোন ? ভালই তো ? কিন্তু লেখাপড়া শেখান নি কেন ? আজকাল তো ঘরে ঘরে মেয়েরা গ্র্যাজুয়েট।

প্রিয়ব্রত বলল, নীলা স্কুলে কিছুদিন পড়েছিল। মার শরীর খারাপ বলে ওকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়ীতে রাখা হয়েছে, মাকে সাহায্য করার জন্য। অবশ্য বাড়ীতেও পড়ে। ওর জন্য একটা পাত্র খুঁজছি। সে-রকম পাত্র তোমার সন্ধানে আছে নাকি ?

আজকাল পাত্র পাওয়াই যে কঠিন প্রিয়দা। কেউ বিয়ে করতে চায় না। যা দিনকাল।

তুমি বিয়ে করছ না কেন চিত্ত ? তুমি তো ঝাড়া হাত-পা। আমার মতন সংসারের গন্ধমাদন তোমার ঘাড়ে নেই।

চিত্ত হেসেই অস্থির।

আমি বিয়ে করব কি প্রিয়দা ? খাওয়াব কি বৌকে ? চাঁদের শিরাজী না রজনীগন্ধার সৌরভ ? তবে দেখা যাক রায়সাহেব একটা গতি করে দেবেন বলেছেন। ভাল একটা কলেজে ঢুকিয়ে দেবেন।

রায়সাহেব ? কে রায়সাহেব ?

প্রবীর রায়। গ্রেটার ক্যালকাটা স্কিমের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার।

এত কথা প্রিয়ব্রতর কানে গেল না। শুধু বলল, প্রবীর রায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হ'ল কি করে ?

আমি যে ওঁর বোনকে পড়াই। সেকেণ্ড ইয়ারের গৌরী রায়। ভাল টিউশনি প্রিয়দা। মাসের অর্ধেক দিনই শুনি মেয়ে ফাংশনে গেছে। পড়াতে হয় না। আর যেদিন পড়াই, সেদিন চা আর জলখাবারের থালা যা আসে, ছাত্রীর চেয়ে সেটার ওপরই আমার লোভ বেশী।

চিত্ত হেসে উঠল, কিন্তু প্রিয়ব্রত গম্ভীর হয়ে গেল।

গৌরীর মতন চটকদার মেয়েকে যে পড়ায়, তার মুখে সম্ভবত ঐশ্বর্যের বড় বড় কথা শোনে, তার নীলার মত দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ মেয়ে চোখে ঠেকবার কথা নয়।

এটা প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করেছে, বিশেষ করে গৌরীকে পড়াতে অস্বীকার করার পর থেকে, গৌরীও তাকে বিশেষ আমল দেয় না। প্রিয়ব্রত যখন কোন কাব্যের দুরূহ অংশ বিশ্লেষণে ব্যস্ত, তখন গৌরী ইচ্ছা করেই পাশের মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে, জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে কিংবা মাথা নীচু করে পাউডার পাফ মুখে বোলায়।

মাঝে মাঝে এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য প্রিয়ব্রতর অসহ্য মনে হয়েছে। এক একবার ভেবেছে পড়া থামিয়ে গৌরীকে কড়া কথা বলবে, কিন্তু নানা দিক ভেবে ততটা আর এগোয় নি। কিছু বলা যায় না, এই নিয়ে ছাত্রীরা হয়তো একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে। প্রিয়ম্বদা সেন তো এই রকম একটা সুযোগের জন্য উন্মুখ।

আরও একটা গোপন ভয় যে প্রিয়ব্রতর ছিল না এমন নয়। কে জানে সুমিতার সঙ্গে তার সম্পর্কের কতটুকু খবর গৌরী রাখে। যেটুকু সত্যি, তার চেয়ে বেশী হয়তো কল্পনা করেছে। এ নিয়ে কাদা ছিটোতে একটুও পশ্চাৎপদ হবে না।

প্রিয়ব্রতর জন্য একটা কুমারী মেয়ের কলঙ্ক রটবে।

চিন্তা করতে করতেই প্রিয়ব্রত আড়চোখে একবার চিত্তর মুখের দিকে চেয়ে দেখল। চিত্ত জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ছাত্রী এক অধ্যাপকের সঙ্গে আর এক অধ্যাপক প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে কিনা। করে থাকলেও, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

দিনকয়েক পরেই। ক্লাশে পাঠ্য ছিল শেলীর কবিতা। প্রিয়ব্রত শেলীর জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করল। তাঁর ব্যক্তিজীবন নয়, কাব্যজীবন। শেলী তার রিসার্চের বিষয়, কাজেই অন্য কবিদের চেয়েও শেলীর কাব্য-জীবন, তাঁর রচনার তাৎপর্য, কাব্যদর্শন সম্বন্ধে প্রিয়ব্রতর পড়াশোনা বেশীই ছিল। ফলে ক্লাশের মেয়েরা চুপ করে তার বক্তৃতা শুনল।

কেবল গৌরী রায় ছাড়া। বক্তৃতা শুনতে-শুনতেই সে কয়েক-বার ঠোঁটের অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসল। দীপিকার সঙ্গে মাথা নীচু করে কি বলল।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল প্রিয়ব্রত ক্লাশ শেষ করে বেরিয়ে যাবার মুখে।

স্যর।

প্রিয়ব্রত অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষের দিকে যাচ্ছিল, পিছন থেকে ডাক শুনে ফিরে চাইল।

গৌরী আর দীপিকা পাশাপাশি।

চেষ্টা না করেই প্রিয়ব্রতর দুটি ভ্রূ কুঁচকে গেল। মুখে বিরক্তির আভা। কি আবার হল?

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব স্যর। গৌরী বলল।

বল।

শেলীর সঙ্গে হ্যারিয়েটের কি সম্পর্ক?

প্রিয়ব্রত একটু আরক্ত হল। ইচ্ছা করেই সে শেলীর ব্যক্তি-জীবনের আলোচনা করে নি ক্লাশে। করার অসুবিধা ছিল। শেলীর জীবনে অগণিত নারীর আসা যাওয়া। হয়তো তাদের কিছু কিছু ছাপ শেলীর কোন কোন কাব্যে পড়েছে। কিন্তু আই-এ ক্লাশের মেয়েদের অতটা না জানলেও চলে।

প্রিয়ব্রত প্রতিপ্রশ্ন করল, নামটা কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?

এবার দীপিকা কথা বলল, একটা বই থেকে স্যর। Shelley, his life and his poems.

হ্যারিয়েট কে সে বইতে তার উল্লেখ নেই ?

না স্যার, শুধু লেখা আছে হ্যারিয়েট শেলীর কাব্যকে খুব বেশীমাত্রায় প্রভাবিত করেছিল।

মাটির দিকে চেয়ে খুব গম্ভীর গলায় প্রিয়ব্রত বলল, হ্যারিয়েট শেলীর প্রণয়িনী।

মনে হল চাপা হাসির শব্দ। গৌরী আর দীপিকা দু' জনেই যেন হাসি চাপতে পারল না।

প্রিয়ব্রত আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

এ খোঁজ যে শুধু জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার জন্য নয়, সেটা পরের দিনই প্রিয়ব্রত জানতে পারল।

সেদিন আড়াইটেয় প্রিয়ব্রতর ক্লাশ শেষ। মেয়েরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেকেণ্ড ইয়ার আছে, ফোর্থ ইয়ার আছে।

মেয়েদের পার হয়ে গেটের দিকে যেতে যেতেই প্রিয়ব্রতর কানে এল।

অয়ি হ্যারিয়েট, তোমার দীর্ঘ বিরহের দিন অবসান। লুকিয়ে লুকিয়ে তৃষ্ণা মেটাবার আর প্রয়োজন নেই।

চোখ তুলেই প্রিয়ব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল।

নোটিশ বোর্ডের সামনে সুমিতা। কি একটা নোটিশ পড়বার চেষ্টা করছিল, গৌরীর রসিকতায় পাংশু, বিবর্ণ হয়ে গেল।

মনে হল এ ধরনের আক্রমণ এই প্রথম নয়। গৌরী মাঝে মাঝে রসিকতা টিটকারী করে। কিন্তু প্রিয়ব্রতর শ্রবণের গোচরে বোধ হয় এই প্রথম।

প্রিয়ব্রত একটু দাঁড়াল। দু এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপরই বেরিয়ে এল গেট পার হয়ে।

এতদিন গৌরী এভাবে প্রকাশ্যে রণক্ষেত্রে নামে নি, অন্যভাবে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল। ক্লাশে মনোযোগ না দিয়ে, প্রিয়ব্রতকে উপেক্ষা করে। ভেবেছিল প্রিয়ব্রতই বাধ্য হয়ে তাকে শাসন করতে উদ্যত হবে একদিন, তখন এতদিনের সঞ্চিত গরল নিয়ে সে প্রিয়ব্রতর মুখোমুখি দাঁড়াবে।

সেদিন হ্যারিয়েটের সম্বন্ধে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। তার মানে সুমিতা আর প্রিয়ব্রতর সম্পর্কটা ক্লাশেও বোধহয় জানাজানি হয়ে গেছে। ছি, ছি, প্রিয়ব্রতর নিজের ওপরই লজ্জা হল। অধ্যাপক আর ছাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কটা কলুষিত করার জন্য কে দায়ী? সুমিতার দিক থেকে কখনও কোন ইঙ্গিত তো পায় নি প্রিয়ব্রত। অনেক আগে সেই হাত ছোঁয়ার ব্যাপারে সুমিতার শিউরে ওঠা, আর ট্যাক্সির মধ্যে আঁকড়ে ধরা প্রিয়ব্রতকে, এই সামান্য দুটি ঘটনার ওপর নির্ভর করে আকাশসৌধ নির্মাণ করার অধিকার প্রিয়ব্রতকে কে দিয়েছিল? নারীর মন কি এতই সহজলভ্য? ভয় পাওয়া একটা মেয়ের অর্ধচেতন অবস্থায় আলিঙ্গনটাকেই কাছে টানার সমপর্যায়ের বলে মনে করল কি করে? টেনিসন, বায়রন, কীটস্, শেলীর প্রেমের কাব্য পড়িয়ে পড়িয়ে প্রিয়ব্রতও বুঝি নিজেকে কাব্যের নায়ক ভেবে নিয়েছে?

চলতে চলতেই একটা সমাধান হয়ে গেল।

দিন দুয়েক হল থিসিসটা প্রিয়ব্রত দিয়েছে। তার ধারণা খুব খারাপ হয় নি। ডি-ফিল একটা পেয়েও যেতে পারে। ডি-ফিল হলে অন্য একটা ভালজাতের কলেজে কিছু হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এই মেয়েদের কলেজটা ছাড়তে পারলে প্রিয়ব্রত যেন বেঁচে যাবে।

এ ভাবে পদে পদে অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে দিন কাটানোই মুস্কিল। বলা যায় না, আজ শুধু গৌরী যা বলছে, কাল হয়তো অন্য ছাত্রীরাও তাই বলবে। এমন মুখরোচক আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রীমহলে চিরকালের আনন্দ।

কথাটা অধ্যক্ষের কানে ওঠাও স্বাভাবিক। যাতে ওঠে, গৌরী, দীপিকার দল তাই করবে। তাহলে তিনি হয়ত প্রিয়ব্রতকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।

ছি, ছি, ছি, কি লজ্জা! প্রিয়ব্রত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

আর পরীক্ষারও দেরী নেই। এই কটা দিন কাটাতে পারলে সুমিতাকে পড়ানোরও ইতি। আঙুল গুনে প্রিয়ব্রত সময়ের হিসাব করল। কলঙ্ক মুক্তির মেয়াদ। অবশ্য তার আগেই যদি সুমিতার বিয়ের ঠিক হয়ে যায় তাহলে আরো ভাল।

হাতে অনেক কাজ ছিল। ইউনিভার্সিটি গিয়ে প্রাক্তন অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করা। থিসিসটা যে দিয়েছে সেটা সকলকে জানানো দরকার। তাছাড়াও মাঝে মাঝে যোগাযোগ রাখলে চাকরির খোঁজখবরও পাওয়া যায়।

টিউশনি শেষ করে যখন বাড়ী ফিরল তখন সন্ধ্যা নেমেছে। প্রিয়ব্রতর একতলার এই ঘরটায় সন্ধ্যা একটু তাড়াতাড়িই নামে।

ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা বিছানায় ছেড়ে দিয়ে প্রিয়ব্রত চোখ বুজল। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করল না। মাঝে মাঝে অন্ধকারটাও ভাল লাগে। পৃথিবীকে দেখা যায় না। শুধু তার অস্তিত্ব অনুভব করা।

কিন্তু চোখ বুজেও নিস্তার নেই।

দু' কানে ভ্রমর গুঞ্জনের মতন অবিরত ধ্বনিত হল। মধুময় একটি বিদেশী নাম। অনেক তারার মধ্যে উজ্জ্বলতম সন্ধ্যাতারা। হ্যারিয়েট, হ্যারিয়েট।

শেলীর জীবনে অসংখ্য প্রেমিকা। বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা প্রিয়-সান্নিধ্যমধুরা। তার মধ্যে একটি নাম হ্যারিয়েট। শেলীর প্রেরণা।

শেলীর প্রেরণা কিনা এ বিষয়ে হয়তো মতদ্বৈতের অবকাশ আছে, কিন্তু সুমিতা যে প্রিয়ব্রতর জীবনের উৎস এ বিষয়ে তার

কোন সন্দেহ নেই। সুমিতার সাহায্য না পেলে এত দ্রুত বোধ হয় প্রিয়ব্রত নিজের থিসিস শেষ করতে পারত না। সুমিতাকে পড়াতে পড়াতে তার বার বার মনে হয়েছে যেন সে নিজেকেই পড়াচ্ছে। আলোচনা করছে নিজের সঙ্গে। শান্ত, কোমল, মধুর স্বভাবের লাবণ্যময়ী ছাত্রীটি যেন তারই দ্বিতীয় সত্তা।

এ ছাড়া আরও একটি বাসনাও কি উঁকি দেয় নি প্রিয়ব্রতর মনে?

থিসিস শেষ করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজেকে। রোজগারের স্বল্পপরিসর খাঁচা থেকে বেরিয়ে উপার্জনের নীল আকাশে ডানা মেলে দিতে হবে। ডি. ফিল তারই প্রথম সোপান।

এভাবে কৃমির মতন বেঁচে থেকে লাভ নেই। টিউশনি-সম্বল জীবন, কলেজের স্বল্প আয়। তার চেয়ে সরকারি খ্যাতনামা কোন কলেজের অধ্যাপকের আসনে যদি বসতে পারে। নাম, সেই সঙ্গে অর্থ।

কিছু বলা যায় না, একদিন হয়তো এই শহরের উপান্তে নিজের ছোট একটা বাড়ীও গড়ে তুলতে পারে। একেবারে নিজস্ব। দেশ থেকে সবাইকে এনে নিজের কাছে রাখবে।

আর, আর! প্রিয়ব্রত বিছানার ওপর উঠে বসল। এ অন্ধকারে বলতে কোন দ্বিধা নেই, কোন সঙ্কোচ নয়। চেষ্টা করলেও কেউ তার মুখের রক্তিম আভা দেখতে পাবে না।

একটি নারী। পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিন্দুর। লাজনম্রা, ব্রীড়াময়ী বধূ। সম্পদে বিপদে প্রিয়ব্রতর পাশে পাশে থাকবে। আর আশ্চর্য, মনশ্চক্ষে যে বধূর রূপ ভেসে উঠল, তার মুখের সঙ্গে সুমিতার মুখের অদ্ভুত মিল।

হ্যারিয়েট আসবে শেলীর পাশে।

প্রিয়ব্রতবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

জানলার ওপারে পতিতপাবনবাবুর কণ্ঠ।

প্রিয়ব্রত উঠে বসল। হাত দিয়ে সুইচটা টিপে বলল, আসুন, দরজা খোলাই আছে।

পতিতপাবনবাবু ঘরে ঢুকলেন, কি ব্যাপার, এ সময়ে শুয়ে? শরীর খারাপ নাকি?

না, এই একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। কি খবর বলুন?

খবর ভাল। রত্নার এক জায়গায় বিয়ের ঠিক হয়েছে।

বা, বেশ ভাল খবর। ছেলেটি কি করে?

ছেলেটি আমার অফিসেই কাজ করে। বেচারির বিয়ের ছু' বছরের মধ্যে স্ত্রীটি মারা যায়। তারপর বছর তিনেক আর বিয়ে থা করে নি। এখন বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে। রত্নাকে কদিন আগে দেখেও গেছে। পছন্দও হয়েছে। তবে একটা শুধু আপসোস, ছেলের অভিভাবক বলতে কেউ নেই।

তাতে আর কি, ভালই তো, আপনার মেয়ে একেবারে সংসারের গিন্নী হয়ে বসবে।

তা সত্যি। সামনের মাসের সাতই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তাই ভাবলাম, খবরটা একবার আপনাকে দিয়ে আসি।

একেবারে দিনক্ষণ সব ঠিক। আপনি তো করিৎকর্মা লোক মশাই।

আমি তো নিমিত্তমাত্র। বিয়ের ফুল না ফুটলে আমরা আর কি করতে পারি।

প্রিয়ব্রত একবার পতিতপাবনবাবুর দিকে চেয়ে দেখল তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, রত্না গেলে আপনার খুবই কষ্ট হবে। সারা সংসারটা মাথায় করেছিল।

কিছুক্ষণ পতিতপাবনবাবু কোন কথা বললেন না। বলতে পারলেন না। একটা তীব্র যন্ত্রণা চাপার চেষ্টায় তাঁর মুখচোখ রক্তিম হয়ে উঠল। স্ফীত হয়ে উঠল গলার নীল শিরার জট।

পতিতপাবনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কোন কথা না বলে, প্রিয়ব্রতর দিকে না ফিরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

অনেকক্ষণ সেইদিকে প্রিয়ব্রত চেয়ে রইল, তারপর আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

কলেজ বন্ধ। রাস্তার ওপর একদিন চিত্তর সঙ্গে প্রিয়ব্রতর দেখা হয়েছিল।

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বইয়ের দোকানে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল, পাশ দিয়ে চিত্তকে যেতে দেখে, তাকে আটকাল।

কি খবর চিত্ত, কলেজ বন্ধ, টিউশনির ঝামেলাও নিশ্চয় নেই, তাহলে এত ছুটছ কেন?

চিত্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর প্রিয়দা সর্বনাশ হয়েছে। যে টিউশনির ওপর নির্ভর করেছিলাম, সেটাই খতম।

কি রকম?

গৌরী রায় আর পড়বে না। পরীক্ষাটা অবশ্য দিয়েছে, তবে তুচ্ছ পড়াশোনার দিকে তার এখন মন নেই।

তোমার হেঁয়ালী বুঝতে পারছি না চিত্ত।

হেঁয়ালী নয় প্রিয়দা, অর্থের শোকে কথাবার্তা হয়তো একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এখন গৌরী রায়ের বাড়ীতে ছোকরা ডিরেক্টররা আসা যাওয়া করছে। রুপোলী পর্দার মোহ তাকে গ্রাস করেছে। করুক, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। জোনাকি থেকে সে তারকা হোক, কিন্তু খুব আশা করেছিলাম প্রবীর রায় আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন, সে গুড়েও বালি। ছাত্রীর সঙ্গে সুবাদই উঠে গেল, আর ও-বাড়ী যাই কোন মুখে। তাই নতুন টিউশনির খোঁজে ছোটাছুটি করছি।

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না। তার মুখ দেখে মনে হ'ল সে যেন গভীর ভাবে কি চিন্তা করছে।

চিত্তই আবার কথা বলল, আপনার ডি. ফিল-এর কোন খবর পেলেন প্রিয়দা ?

অন্যমনস্কভাবেই প্রিয়ব্রত বলল, ভাই, ঘোরাঘুরি করছি, এখনও কোন খবর বের করতে পারি নি।

ডক্টরেট পেলে এই কলেজে আপনি কি আর পড়ে থাকবেন ?

আগে পাই, তারপর সে কথা ভাববো।

সুমিতা মুখার্জীর বাড়ী আর যান না।

এবার প্রিয়ব্রত চমকে উঠল, কেন সুমিতা মুখার্জীর বাড়ী যাব কেন ?

আগে পড়াতে যেতেন তাই বলছি। এখন তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তাই বোধ হয় আর যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কথাটা কি ভেবে চিত্ত বলল, কে জানে। হয়তো কিছু ভেবেই বলে নি, কিন্তু প্রিয়ব্রত অস্বস্তি বোধ করল।

হাতের পত্রিকাটা দোকানে রেখে দিয়ে হঠাৎ বলল, চলি চিত্ত, আমার একটা দরকারি কাজ রয়েছে।

দিন দুয়েকের জন্য প্রিয়ব্রত দেশে গিয়েছিল। মার চিঠিতেই একটা খবর ছিল, দেবব্রত লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কারখানায় ঢুকেছে। খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। ছেলেটা যে লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে মিস্ত্রি-মজুরদের দলে গিয়ে মিশল, তাতে মার চিঠিতে আক্ষেপের কোন ইঙ্গিত নেই, কোন অনুশোচনা নয়। বরং এই কষ্টের সংসারে যেভাবেই হোক, বাড়তি কিছু টাকা এসে যে পড়ছে, তাতেই মা উৎফুল্ল।

শুধু চিঠির শেষ দিকে লিখেছে নীলার বিয়ের কি হল ? তার জন্য শুধু মা চিন্তিত নয়, উদ্বিগ্নও।

এবার গিয়ে প্রিয়ব্রত কিন্তু নীলার বেচাল কিছু দেখতে পেল না। নীলা বাড়ীর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

সর্বদা মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সাংসারিক কাজে তাকে সাহায্য করে। মিতবাক, সলজ্জ তরুণী। কথাটা প্রিয়ব্রত মাকে বলেওছিল।

মাও অবাক। বলেছিল, কি জানি বাছা, কদিন দেখছি একেবারে লক্ষ্মী হয়ে গেছে। মাথার পোকাটা বোধ হয় বেরিয়ে গেছে।

দেবব্রতর সঙ্গে বিশেষ দেখা হল না। সে নতুন চাকরি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। কোথা থেকে জাঁদরেল জননেতা আসবেন কারখানা পরিদর্শনে, তাই তার স্নানাহারের সময় নেই।

প্রিয়ব্রত শহরে ফিরে এল। নিজের থিসিসটার ব্যাপারে সে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল।

যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছল, তখন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

তালা খুলতে গিয়েই প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। কে একজন যেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

কে ?

আমি সুমিতা।

সুমিতা! এখানে! প্রিয়ব্রত অবাক হল। তাড়াতাড়ি তালা খুলে বাতি জ্বেলে দিল।

কি ব্যাপার ?

সুমিতার সারা মুখ ঘর্মাক্ত। ঘামে ভিজে চুলগুলো কপালের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। উত্তেজনায় সুডৌল বুক স্পন্দিত হচ্ছে।

আমি তিনবার এসেছি স্যর, তিনবারই দেখলাম তালা বন্ধ।

প্রিয়ব্রত ভ্রূ কুঞ্চিত করল, কি হয়েছে বল তো ?

সুমিতা এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে প্রিয়ব্রতকে প্রণাম করল, তারপর বলল, আজ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে স্যর। আমি পাশ করেছি। ইংরাজীতে লেটার পেয়েছি।

তাই না কি, বা, বা, খুব সুখবর। তা হলে এমন সুখবরটা খালিহাতে জানাতে এলে?

সুমিতা বিব্রত হল। মাথা হেঁট করে বলল, আপনি আমাদের বাড়ীতে যাবেন কাল, সেই কথাই বলতে এসেছি।

কিন্তু তুমি আমার আস্তানার সন্ধান পেলে কি করে?

দাদার কাছে ঠিকানাটা শুনেছিলাম। খুঁজে খুঁজে এসেছি।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কথা বলল না। দুজনেই যেন কি ভাবছে।

সুমিতাই কথা বলল। বেদনাতুর কণ্ঠ।

আর বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে না স্যর।

কেন? দেখা হবে না কেন?

আয়ত দুটি চোখ তুলে সুমিতা প্রিয়ব্রতর দিকে দেখল ঠোঁটদুটো একটু বুঝি কাঁপল, তারপর বলল, আমাদের বাড়ী যা অবস্থা তাতে আমাকে পড়ানো আর সম্ভব হবে না।

প্রিয়ব্রত পরিবেশ ভুলল। নিজেকে বিস্মৃত হল। সামনে কম্পমান এক যৌবন, দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করেছে। অন্তহীন এক রহস্য ঘিরে রয়েছে দুজনকে।

এক পা এক পা করে প্রিয়ব্রত সুমিতার সামনে এসে দাঁড়াল তপ্ত শরীরের সান্নিধ্যে। খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার আরো পড়তে ইচ্ছা করে না, সুমিতা?

সুমিতা ঘাড় কাত করল। হ্যাঁ করে।

তোমার পড়ানোর দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয়।

আর কে নেবে?

ধর, আমিই যদি নিই।

নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে সুমিতা দেখল, তারপর বলল, আপনি নেবেন? কোন অধিকারে?

প্রিয়ব্রত হাত বাড়িয়ে সুমিতার দুটো হাত ধরল। বলল, [illegible]

অধিকার তুমি আমাকে দেবে। তুমি বিশ্বাস কর সুমিতা, তুমি যেটুকু দেবে সেইটুকুই আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করব। তোমার দানের অমর্যাদা করব না।

সুমিতার দেহটা কেঁপে উঠেই প্রিয়ব্রতর দেহের সঙ্গে মিশে গেল।

গাঢ় আলিঙ্গনে পুষ্পিত একটা যৌবনকে বন্দী করে প্রিয়ব্রত আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে শুধু মন্ত্রোচ্চারণের মতন বার বার বলল, সু, আমার সু।

অনেকক্ষণ পরে দুজনের চেতনা হল। আস্তে আস্তে নিজেকে সুমিতা ছাড়িয়ে নিল। অন্যদিকে ফিরে বলল, রাত হয়ে গেছে। এবার আমি বাড়ী যাব।

চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুমিতা কিছু বলল না। তালাবন্ধ করে প্রিয়ব্রত রাস্তায় পা দিল।

রাস্তায় নেমে সুমিতা বলল, আমায় বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারব।

বাসস্টপের কাছেই মহামায়া ভাণ্ডার। সেখান থেকে প্রিয়ব্রত সন্দেশ কিনে সুমিতার হাতে তুলে দিল।

সুমিতা আপত্তি করল, একি আপনি কেন দেবেন? গুরুদক্ষিণা তো আমার দেবার কথা।

প্রিয়ব্রত মুচকি হাসল, তুমি যে গুরুদক্ষিণা দিয়েছ, ইতিহাসে এমন গুরুদক্ষিণার নজির বেশী নেই।

আরক্তিম সুমিতা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাসে উঠিয়ে দিয়ে, চলন্ত বাসের পাশাপাশি যেতে যেতে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, আমি তোমাদের বাড়ী কবে যাব সু?

কালই এস। কথাটা বলেই সুমিতা শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল।

পরের দিন বিকালেই প্রিয়ব্রত গেল সুমিতাদের বাড়ী। রাস্তা থেকেই দেখতে পেল সুমিতা বাইরের ঘরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বই গোছাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত ঘরে ঢুকতেই সুমিতা লজ্জারুণ মুখটা কোনরকমে তুলে কেবল বলল, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।

তারপরই ছুটে ভিতরে পালাল।

একটু পরেই মনীশ ঢুকল। আজ শনিবার। দুপুরবেলা অফিস থেকে ফিরেছে, তাই পরনে গেঞ্জী আর লুঙ্গী।

প্রিয়ব্রতকে দেখে সহাস্যে বলল, বা, ছাত্রী পাশ করেছে, কোথায় আমরা তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব, তা না তুমি সুমিতার হাতে সন্দেশের বাক্স তুলে দিয়েছ?

সন্দেশ দেওয়া নেওয়ার কথা এখন আর প্রিয়ব্রতর ভাল লাগছে না। কাল সারারাত ভেবেছে। এতদিন আকাশে বাতাসে যে কলঙ্কের ধুলো উড়ছিল, তার অবসান ঘটাতে সে বদ্ধ-পরিকর। শাস্ত্রমতে সুমিতাকে গ্রহণ করলেই সব সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিমীলিত হয়ে যাবে, সব কানাকানির ইতি।

সেই কথাই সে মনীশকে বলল। আবেগহীন, অবিচলকণ্ঠে।

প্রিয়ব্রত ভেবেছিল এমন একটা সংবাদে মনীশ নিশ্চয় খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠবে কারণ পাত্র হিসাবে সে খুব নিন্দার নয়।

কিন্তু সব শুনে মনীশ টেবিলে আঁচড় কাটতে কাটতে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, তোমরা তো নিকষ কুলীন নও, তাই না? আমার মনে আছে, যখন আমরা একসঙ্গে পড়তাম, এ খোঁজ নিয়েছিলাম একবার। তুমি বলেছিলে ভঙ্গ।

প্রিয়ব্রত একটু বিস্মিতই হল। এদের সব গেছে, পুরাতন ঐতিহ্য, আভিজাত্য, প্রতিপত্তি, অর্থ, তবু এখনও পঙ্গু একটা প্রথাকে এরা আঁকড়ে থাকতে চায়। কুলীন ছাড়া কন্যাকে পাত্রস্থ করবে না, সে কৌলিন্যের মাপকাঠি যে যুগে যুগে বদলায়, একথা জেনেও।

গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্যই মনীশ বলল, ঠিক আছে, আমি মাকে একবার বলে দেখি, ইতিমধ্যে যা বললাম সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে তুমি আমাকে জানাও। সম্ভব হলে তোমার একটা ছক আমাকে দিও।

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। একটু দৃঢ়স্বরেই বলল, খোঁজ নেবার আর দরকার হবে না মনীশ। আমি ভাল করেই জানি আমরা নিকষ কুলীন নই, ভঙ্গ। আজ চলি।

সে কি মিষ্টিমুখ করে যাবে না?

আজ থাকবার উপায় নেই। অন্য একদিন আসব।

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলেই চোখে পড়ত, জানলার গরাদের ওপারে বিষাদম্লান একটি মুখের ছবি। দু গালে অশ্রুর আলপনা আঁকা।

অনেক রাত পর্যন্ত প্রিয়ব্রত পথে পথে উদভ্রান্তের মতন ঘুরল। যখন বাড়ী ফিরল, দেখল পথের ওপর রাশীকৃত বাঁশ দড়ি, সামিয়ানার কাপড়। পতিতপাবনবাবু ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন তার মাঝখান দিয়ে।

প্রিয়ব্রতকে দেখেই থেমে গেলেন, কোথায় ছিলেন মশাই, কাল বোনের বিয়ে, আর গায়ে ফুঁ লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। কত কাজ করবার আছে জানেন? আমি একলা মানুষ, আর কতদিক দেখব!

রত্নার বিয়েতে দিন দুয়েক প্রিয়ব্রত খুব পরিশ্রম করল। রত্না যেদিন শ্বশুর-বাড়ী রওনা হয়ে গেল সেদিন পতিতপাবনবাবুর কান্না দেখে প্রিয়ব্রতও খুব বিচলিত হয়ে পড়ল।

রত্না থাকতে এতটা বুঝতে পারে নি, কিন্তু শুধু প্রিয়ব্রতর খাওয়া-দাওয়ার তদারকই নয়, তার অনেক কিছু কাজ রত্না করত। বেশীর ভাগ সময়ই প্রিয়ব্রত বাইরে থাকত, অনেক সময় চাবি রত্নার কাছেও দিয়ে যেত। দরজা খুলে চাকরকে দিয়ে ঘরদোর পরিস্কার করে

রাখত। লণ্ড্রি থেকে কেচে আসা কাপড়জামা ঠিক করে রাখত। তাছাড়া প্রিয়ব্রতর পাঞ্জাবির বোতাম, শার্টের রিপু, ধুতির সেলাই সব রত্না করত। এ কাজ কেউ তাকে করতে বলে নি, কিন্তু সব কিছু সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

কুরূপা এই মেয়েটির রূপ ছাড়া সব গুণই ছিল।

প্রিয়ব্রতর ঘরে বসে পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে প্রিয়ব্রতর এই সব কথাই হচ্ছিল, এমন সময় মনীশ এসে ঢুকল।

অবশ্য মনীশকে প্রিয়ব্রত কদিন আগেই আশা করেছিল।

একটু পরেই পতিতপাবনবাবু উঠে গেলেন। মনীশের দিকে চেয়ে প্রিয়ব্রত বলল, কি খবর মনীশ ?

মনীশ মাথা নীচু করে বলল, মার এক ধনুকভাঙা পণ। কদিন ধরে আমি অনেক বোঝালাম, কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়। বাবা বুঝি শেষ সময়ে মাকে বলে গিয়েছিলেন, আমরা যেন কুল না ভাঙ্গি। কিছুদিন আগে সুমির একটা সম্বন্ধ এসেছিল। তাদের পছন্দও হয়েছিল, কিন্তু তারা ভঙ্গ বলে মা আর এগোয় নি।

গলার কাছে একটা অবরুদ্ধ কান্নার স্রোত ঠেলে ঠেলে উঠছে। কিছুতেই প্রিয়ব্রত সংযত করতে পারছে না নিজেকে। অ্যাটমিক যুগে এমনই একটা প্রাগৈতিহাসিক মতবাদ আঁকড়ে কেউ বসে থাকতে পারে, এ যেন তার ধারণারও বাইরে। চারদিকে এত আলোড়ন, সামাজিক বিপর্যয়, শিল্প বিপ্লব, তবু এদের চেতনা নেই, সাড় নেই। ঘূণধরা একটা প্রথার কাছে সব কিছু বলি দিতেও এরা রাজী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এ মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগে যে প্রতিবাদ তোলার প্রয়োজন হ'তে পারে এ কথা প্রিয়ব্রতর কোনদিন মনে হয় নি।

ধীরে ধীরে প্রিয়ব্রত আত্মস্থ হল। বলল, ঠিক আছে, তোমার মায়ের মত জানলাম।

আর একটা কথা। মা আর একটা কথাও তোমাকে বলতে বলেছেন।

বল।

তুমি আর আমাদের ওখানে যেও না। সুমির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কর না। মার ধারণা এতে সুমির ক্ষতি হবে। মানসিক ক্ষতি।

সন্ধ্যা হয় নি, তবুও চারদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নেমেছে। সূচিভেদ্য। মনীশকে প্রিয়ব্রত দেখতে পাচ্ছে না। পৃথিবীর কাউকে নয়। আধুনিক যুবকদের মতন কোন উচ্ছ্বাস দেখায় নি প্রিয়ব্রত, নাটকীয়তা করে নি, প্রেম নিয়ে কোন কাব্য নয়, কিন্তু এটুকু সে জানে সুমিতার প্রতি তার আকর্ষণ উপেক্ষার নয়। সুমিতাকে ছাড়া তার জীবনযাত্রা নিরর্থক।

তবু প্রিয়ব্রত কথা দিল, বেশ তাই হবে, আমি আর তোমাদের ওখানে যাব না। তোমার মাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বল।

তারপরেও যেন মনীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকগুলো কথা বলে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা। ওর দোষ নেই। সুমিতাকে প্রিয়ব্রতর হাতে তুলে দিতে পারলে মনীশ সবচেয়ে সুখী হোত। এই ধরনের কথা।

কিছু প্রিয়ব্রতর কানে গেল। অনেকটা গেল না। চেয়ারের হাতল ধরে সে প্রস্তর মূর্তির মতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এর দিন তিনেক পরেই খবর এল। প্রিয়ব্রত ডক্টরেট পেয়েছে। মফস্বলের সরকারি কলেজে তার চাকরি হওয়ারও একটা আশা আছে। প্রিয়ব্রত অবিলম্বে দরখাস্ত করুক।

খবর দিলেন ডক্টর লাহিড়ী। তাঁর টেবিলে বসেই প্রিয়ব্রত দরখাস্ত লিখল। ভালই হয়েছে। এই নিষ্ঠুর শহরে আর তার ভাল লাগছে না। সরে যেতে পারলেই যেন মুক্তি।

বাড়ী ফিরে দরজা খুলেই দেখল ঘরের মেঝের ওপর একটা পোস্টকার্ড। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে শুধু একটি লাইন লেখা।

অবিলম্বে বাড়ী চলে এস। দেবু।

দেবব্রত চিঠি লিখেছে। সে কোনদিন চিঠি লেখে নি। এ সব সামাজিকতা করবার সময়ও তার নেই।

কি ব্যাপার? মার শরীর ভাল আছে তো? না কি দেবু নিজে আবার কোন হাঙ্গামা বাধিয়েছে। কারখানায় কোন গোলমাল নয় তো!

নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রিয়ব্রত বিছানাপত্র বাঁধল। ট্রেনের আর দেরী নেই। যেতে হলে এই বেলা রওনা হ'তে হবে।

বাড়ীর কাছাকাছি গিয়েও অস্বাভাবিক কিছু ঠেকল না। কোন কান্নাগোলের আওয়াজ নয়, কোন গোলমালও না। দেবব্রত ধারে কাছে নেই।

কোণের ঘরে আপাদমস্তক চাপা দিয়ে মা শুয়ে আছে।

মা। প্রিয়ব্রত কাছে গিয়ে ডাকল।

কোন সাড়া নেই। কেবল চাদর চাপা দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

প্রিয়ব্রত মার পাশে বসে পড়ল। একটা হাত রাখল মার দেহের ওপর।

মা, মা।

এবার মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। উচ্ছ্বসিত আবেগে স্পন্দিত হ'ল সমস্ত শরীর।

প্রিয়ব্রত মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল। রোরুদ্যমান মার মুখটা তুলে ধরল নিজের দুটো হাতে।

সর্বনাশ হয়েছে প্রিয়, সর্বনাশ হয়েছে। নীলা চলে গেছে।

চলে গেছে নীলা! কথাটা বুঝতে প্রিয়ব্রতর বেশ একটু সময় নিল। কি হয়েছিল নীলার? অসুখ বিসুখের কোন খবরই সে পায় নি?

কি হয়েছিল নীলার? অসুখের খবর তো কিছু লেখনি তোমরা?

নারে, না, মা কান্নায় ভেজা মুখটা মেঝেয় ঘসতে ঘসতে বলল, সে রকম গেলেও আমি শান্তি পেতাম, এ সর্বনাশী আমাদের মুখে চুনকালি দিয়ে পালিয়ে গেছে বাড়ী ছেড়ে।

এইবার একটু একটু করে সব ব্যাপারটা তরল হ'ল। ঠিক এ ধরনের আভাস এর আগেও মা দিয়েছে। নীলার হালচাল সুবিধার নয়। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল বেঁধেছে।

একটু পরেই মা সামলে নিল নিজেকে। আঁচলে চোখ মুছে উঠে বসল। অভিযোগ করল, তোকে বার বার করে বলেছি প্রিয়, নীলার একটা সম্বন্ধ ঠিক কর। তোরা সবাই চোখ বুজে রইলি। ও হতভাগী একটা কেলেঙ্কারি করবে আমি ঠিক বুঝতে পেরে-ছিলাম। কিছু একটা করবে বলেই ইদানীং চুপচাপ করে ছিল। বাড়ী থেকে বের হ'ত না।

সর্বনাশের স্বরূপটা প্রিয়ব্রত শুনল খাওয়া দাওয়ার পর। দেবব্রতর দেখা নেই। সে কোন এক বন্ধুর বাড়ী খাওয়া দাওয়া সারবে। এ তল্লাটে আসবে না।

তা নয়, মা বলল, দাদার কাছে এসে দাঁড়াবার মুখ তার নেই। এ ব্যাপারে তার হাত থাক বা না থাক, মনের সায় ছিল বৈ কি।

তরুণ ঘোষ। এ গাঁয়ের কেউ নয়। ছিন্নমূল মানুষগুলোর সঙ্গে ওপার থেকে এপারে এসেছিল। চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য আরোও ভাল। দেবব্রতর বন্ধু। সেই সুবাদেই আসত মাসীমা মাসীমা করে। দেবু না থাকলে নীলা গিয়েও কথাবার্তা বলত। কিন্তু কিছুদিন পরে ওদের হাবভাব মার ভাল ঠেকে নি। মুচকি হাসির ধরণ, আড়ালে কথাবার্তা। মেয়েকে ধমক দিয়ে মা সাবধান করে দিয়েছে। ব্যাপার বুঝে তরুণও আসা বন্ধ করে ছিল। মাও নিশ্চিন্ত। কিন্তু তখন কি

জানে, অলক্ষ্যে বিপদের মেঘ জমছে আকাশে। হঠাৎ একদিন সর্বনাশের ধারাবর্ষণ শুরু হবে।

নীলা বান্ধবীদের বাড়ী যাবার নাম করে তরুণের সঙ্গে দেখা করত। ব্যাপারটা দেবুও জানত, কিছু বলে নি, কারণ তরুণ তাকে আশা দিয়েছিল নতুন কারখানায় ঢুকিয়ে দেবে। ওই কারখানাতে তরুণও কাজ করত।

তারপর কালরাত্রি এল। শোবার সময় নীলা আমাকে প্রণাম করল। আমার কোন সন্দেহই হয় নি। একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যারে, প্রণামের এত ঘটা কেন হঠাৎ?

মেয়ে হেসে বলল, কাল বড্ড বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি মা। সই বলল, মাকে প্রণাম করে শুলে খারাপ স্বপ্ন নাকি ধারে কাছে ঘেঁসে না।

সরল মনে তাই বিশ্বাস করলাম। ভোরে উঠে দেখি মেয়ে নিখোঁজ। চিঠি নেই, পত্র নেই, তার শাড়ী জামা, গয়না যা ছিল কিছুই নেই। দেবুকে চেপে ধরতে সে অনেকবার এড়িয়ে তারপর সত্যি কথাটা বলল।

প্রিয়ব্রত সোজা হয়ে বসল, তাহলে নতুন কারখানায় খোঁজ করলে তো তরুণের সন্ধান পাওয়া যায়।

মা কপাল চাপড়াল, সে কথাও দেবুকে বলেছি। দেবু বলল, তরুণ নাকি কলকাতায় কোন বড় কারখানায় চাকরি পেয়ে চলে গেছে। শুধু কি তাই, দেবু আমাকে স্পষ্ট বলে দিলে, নীলা সাবালিকা, তার নিজের ইচ্ছায় যাকে খুশী সে বিয়ে করতে পারে। আমাদের বাধা আইন মানবে না।

দুটো হাতে মুঠো করে প্রিয়ব্রত ঋজু, কঠিন হয়ে বসল।

সাবালিকা। সাবালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করার নেই? নিজের ঈপ্সিত মানুষকে গ্রহণ করার পথে তার কোন অন্তরায় থাকতে পারে না। নীলা সাবালিকা। নীলা যদি সাবালিকা হয়তো—

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে প্রিয়ব্রতর। একজনের সমস্যার মাঝখানে আর একজনের ছায়া এসে পড়ছে।

মেয়ে তো যা সর্বনাশ করবার করল, আমি শুধু একটা কথা ভাবছি প্রিয়।

কি মা? অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর।

পাড়াপড়শীদের আমি কি বলব? এখনও হয়তো তারা কিছু জানে না, কিন্তু দুদিন পরেই তো জানতে পারবে।

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তাদের বলো নীলাকে আমি নিয়ে গেছি। আমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে বলে তাকে নিয়ে যেতে হয়েছে।

প্রিয়ব্রত পরের দিন ভোরের গাড়ীতেই চলে এল।

রাত্রেও দেবব্রত শুতে আসে নি। প্রিয়ব্রত আশা করেছিল হয়তো স্টেশনে সে আসবে। কিন্তু আসে নি।

বাড়ীতে বসে বসে প্রিয়ব্রত ভাবল। যা ঘটেছে তার জন্য প্রিয়ব্রতর দোষ বড় কম নয়। ভাইবোনদের জন্য সে কি করেছে? নিজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের, সংসার প্রতিপালনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে। বাড়ীতে অর্থ পাঠিয়েছে। ভেবেছে তাতেই তার কর্তব্যের ইতি। ভাইকে মাঝে মাঝে নিরাসক্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছে তার লেখাপড়ার কথা। আর বিশেষ কিছু খোঁজ করে নি। সংসারে পুরুষমানুষ নেই, এই স্তোকবাক্যে নিজেকে ভুলিয়েছে, পাছে দেবব্রতকে কাছে এনে রাখতে হয়।

মার বার বার অনুযোগ সত্বেও নীলাকে কাছে ডেকে এনে কিছু বোঝায় নি, তাকে কড়া কথা বলে নি। জ্যেষ্ঠ্যের কোন কর্তব্যই সে করেনি।

কোন কিছু সে করে নি কারণ নিজে সে মন দেওয়া নেওয়ার খেলায় বিভোর। তিল তিল করে হৃদয়ের সব কোমল অনুভূতি বলয়িত হচ্ছিল সুমিতাকে কেন্দ্র করে, আর

কোনদিকে, কারো দিকে চোখ তুলে দেখবার তার অবকাশ ছিল না।

মফস্বল কলেজের চাকরির নিয়োগপত্র এসে গেছে। আর মাসখানেক পরে কাজে যোগদান করার কথা। টুকিটাকি জিনিস একটু একটু করে প্রিয়ব্রত সবই গুছিয়ে নিয়েছে, কিন্তু মনটা গুছিয়ে নিতে পারছে না।

টিউশনি সব ছেড়ে দিয়েছে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা এখন অফুরন্ত অবসর। সন্ধ্যার অন্ধকারে কিংবা নির্জন দুপুরে অদ্ভুত একটা প্রত্যাশা নিয়ে প্রিয়ব্রত অপেক্ষা করে। বাইরে কোন আওয়াজ হলে, কিংবা কারো পায়ের শব্দ কানে গেলে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে। একদৃষ্টে দরজার দিকে চেয়ে থাকে।

অনেক আগের মতন সাফল্যের সংবাদ নিয়ে এসে যে তরুণীটি যাবার সময় অনেক কিছু নিয়ে গেছে, সে কি আর আসবে না? তার কি এখনও আসার সময় হয় নি?

সুমিতাও সাবালিকা। সে যদি ইচ্ছা করে ভাইয়ের নিষেধ, মায়ের ভ্রূকুটি সব পার হয়ে আসতে পারে। তাকে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই। অবশ্য যদি সুমিতা ইচ্ছা করে।

ভীরু, দুর্বলহৃদয় যে সুমিতার পরিচয় প্রিয়ব্রত এতদিন পেয়ে এসেছে, সুমিতা সত্যিই তাই। এই ভীরুতা পার হয়ে আসার শক্তি সে অর্জন করতে পারে নি। মার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে সে হয়ত নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছে এক নৈকষ্য কুলীন পাত্রের।

আর একটি উন্মুখ হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। সে-সন্ধ্যার নিবিড় সান্নিধ্যের স্বপ্ন তার মনের দিগন্তে নিশ্চিহ্ন।

হঠাৎই কথাটা প্রিয়ব্রতর মনে পড়ল।

একটি ছাত্রের কাছে এখনও টিউশনির টাকাটা বাকি রয়েছে ছাত্রের অভিভাবক বলেই দিয়েছিলেন মাসের মাঝামাঝি যে কোন

দিন এসে প্রিয়ব্রত নিয়ে যেতে পারে। ছাত্রের অভিভাবক নতুন বাড়ী তৈরী করে সেখানে উঠে গেছেন। সেই জন্যই টাকাটা সময়মত দিতে পারেন নি।

ক্যালেণ্ডারের দিকে প্রিয়ব্রত চেয়ে দেখল। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলেছে। এখন গেলে টাকাটা বোধ হয় পাওয়া যায়। নতুন ঠিকানাও তার জানা। কিছু টাকার এবার প্রয়োজন। কলকাতা ছাড়বার আগে পতিতপাবনবাবুকে খোরাকি আর বাড়ীভাড়া বাবদ টাকা দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, লণ্ড্রী, স্টেশনারি দোকানেও কিছু বাকি রয়েছে।

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। শহর কলকাতার বিলাসিনী রূপ। পথে ঘাটে হাস্যোচ্ছল জনতা, দুপাশে পণ্যের সম্ভার। এ রূপ দেখে মনেই হয় না, কলকাতার কোন দুঃখ আছে, অভাব অনটন আছে।

এই শহরের কাছে প্রিয়ব্রত কিছু পায় নি। তিল তিল করে সে রক্ত ঢেলেছে এখানে, পরিবর্তে কি পেয়েছে? পরীক্ষা পাশের কতকগুলো কাগজ। এ শহর তাকে অন্ন দেয় নি, অন্নপূর্ণাও নয়।

চলতে চলতেই প্রিয়ব্রতর মনে হ'ল, সত্যিই কি তাই! অন্ন দিয়েছে বৈকি। এত বছর প্রতিপালন করেছে। পরীক্ষাপাশের ওই কাগজগুলোর জন্যই তো নতুন জায়গায় জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। প্রিয়ব্রত কি অকৃতজ্ঞ! হঠাৎ সম্মিলিত কণ্ঠে একটা চীৎকার উঠল। মোটরের ব্রেকের যান্ত্রিক আর্তনাদ। চোখের পলকে যেন ব্যাপারটা ঘটে গেল। প্রিয়ব্রত লাফিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল।

খুব বেঁচে গেছে। আর একটু হ'লেই তাকে অন্যমনস্কতার খেসারৎ দিতে হ'ত।

You blinking idiot.

মোটর থেকে রঙচঙ করা একটা মুখ উঁকি দিল।

প্রিয়ব্রত চোখ তুলেই অবাক। চালনচক্র হাতে যে নারী ক্রুদ্ধদৃষ্টি মেলে প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে রয়েছে, তার দিকে চেয়ে প্রিয়ব্রত বলল, তুমি? গৌরী রায়?

আরে স্যর আপনি? আর একটু হ'লে গুরুহত্যা হয়ে যেত।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী একহাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, উঠে আসুন স্যর, কোথায় যাবেন বলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রিয়ব্রত পিছিয়ে এল। মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি যাও গৌরী। আমি বাড়ী ফিরব। আমার বাড়ী খুব কাছে।

সশব্দে গৌরী দরজাটা বন্ধ করে দুটো হাত কপালে ঠেকাল, বুঝতে পেরেছি স্যর, পুরোনো ঝগড়াটা এখনও মনে রেখেছেন। চলি তাহ'লে। টা-টা শেলা।

কালো মোটরটা দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রিয়ব্রত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে আসন্ন দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে জনতার যে ভীড় হয়েছিল, তারা সমস্ত ব্যাপারটায় রোমান্সের গন্ধ পেয়ে এখানে ওখানে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়ব্রত কোন দিকে না চেয়ে দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। একটা দীপদণ্ডের কাছে প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ দাঁড়াল। এতক্ষণ বুঝতে পারে নি, এবার মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরটা যেন অল্প অল্প কাঁপছে। মোটর দুর্ঘটনার সম্ভাবনার চেয়েও আরও একটা ব্যাপার তার স্নায়ুকেন্দ্রকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে।

গৌরী স্টুডিয়ো ফেরৎ, সেটা তার মুখের চড়া প্রসাধনেই বোঝা গেল। কিন্তু তাছাড়াও বাতাসে যে মৃদুগন্ধের রেশ পাওয়া গেল, সেটা কিসের তা-ও প্রিয়ব্রতর অজানা নয়। এত দ্রুত, এত নীচে নেমে গেছে গৌরী!

প্রিয়ব্রত বড় রাস্তা ছেড়ে সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকল। এখান দিয়ে গেলে ছাত্রের নতুন বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে।

সত্যিই তাই। একটু পরেই ছোট নতুন একটা দু তলা বাড়ীর সামনে গিয়ে প্রিয়ব্রত হাজির হ'ল। ছাত্রের অভিভাবক বাড়ীতেই ছিলেন। প্রাপ্য টাকা হাতে পেতে প্রিয়ব্রতর একটুও দেরী হল না।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ। পথে ঘাটে অফুরন্ত চাঁদের আলো। মনে হল সারা শহর যেন দুগ্ধস্নান করে উঠেছে।

এখনই বাড়ী ফিরতে প্রিয়ব্রতর ইচ্ছা করল না। ইচ্ছা করেই এগলি-ওগলি ঘুরতে লাগল।

আর কটা দিন। তারপর তো চলেই যেতে হবে এই মায়াবিনী শহর ছেড়ে। ঘন ঘন আসাও সম্ভব হবে না। প্রয়োজনও নেই।

অপরিসর একটা গলির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরই ভাবল, কোথায় কে কাকে ডাকছে, তাতে প্রিয়ব্রতর বিচলিত হবার কি আছে!

কিন্তু না, আবার। এবার যেন আরও কাছে।

মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হল।

একটা বাড়ীর খিড়কির দরজার আধখানা পাল্লা খোলা। তারই ফাঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুর।

দাদা, দাদা।

দু এক মিনিটের দ্বিধা, কিন্তু তারপর কৌতূহলই জয়ী হল।

পায়ে পায়ে প্রিয়ব্রত মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখতে দেখতে বলল, নীলা তুই!

হ্যাঁ দাদা, কতক্ষণ ধরে তোমায় ডাকছি, তুমি শুনতেই পাচ্ছ না?

নীলার কণ্ঠে অভিমানের সুর।

একটু আগে প্রিয়ব্রত আর একটি মেয়েকে দেখেছে। রুদ্র, চণ্ডিকা মূর্তি। সে সব মেয়েরা ঘর ভাঙে। আর এখন চোখের সামনে নারীর কল্যাণী মূর্তি দেখছে। অধরে প্রসন্নতা, দু চোখে প্রশান্তি, হাতের মুদ্রায় বরাভয়। যুগে যুগে এরা ঘর গড়ে। ভাঙা ঘর জোড়া দেয়।

খুব সন্তর্পণে, যেন গ্লানির ভারে মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে, এইভাবে নীলা বলল, দাদা, একটু ঘরের মধ্যে আসবে না? একবার পায়ের ধুলো দেবে না?

প্রিয়ব্রতর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এভাবে কেউ ডাকলে উপেক্ষা করা যায় না। তা ছাড়া, সব কিছুর মূল দেখাই তো উচিত। একটা দিক দেখে মানুষের বিচার করা সমীচীন নয়।

তরুণ আছে? প্রিয়ব্রত সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে প্রশ্ন করল।

মাথা নীচু করে খুব মৃদুকণ্ঠে নীলা বলল, আছে।

নীলা আগে আগে চলল। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে। পিছন পিছন প্রিয়ব্রত। ছোট্ট ঘর, কিন্তু সাজানো গৃহস্থালী। একটা চেয়ারে প্রিয়ব্রতকে বসিয়ে নীলা ভিতরে চলে গেল।

চেয়ে চেয়ে প্রিয়ব্রত দেখল। সামনের দেয়ালে তার মা আর বাবার ছবি। খুব পুরোনো ছবি। আসবার সময় নীলা চুপি চুপি নিশ্চয় খুলে নিয়ে এসেছে। মার খেয়াল হয় নি। এখনও বোধ হয় টের পায় নি।

একটু পরেই সুগৌর, দীর্ঘদেহ যে যুবকটি ছুটে এসে দাদা বলে প্রিয়ব্রতর পায়ের ধুলো নিল, তার দিকে প্রিয়ব্রত অনেকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এত সুন্দর নীলার বর! এত সুকুমার!

তরুণ হাসল, মনে মনে অনেকবার ভেবেছিলাম, দুজনে একদিন আপনার বাসায় গিয়ে হাজির হব। আপনার পায়ের কাছে গিয়ে পড়ব।

তরুণের একটা হাত দু হাতের মধ্যে ধরে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, গেলে না কেন ভাই?

সাহস হল না দাদা।

কেন?

কি জানি আপনার মনেও যদি জাত সম্বন্ধে কোন অভিমান থাকে। মানুষের চেয়েও পদবীর মর্যাদা যদি আপনি বেশী দেন।

বা, খুব সুন্দর কথা বলে তো ছেলেটা। কথার যাদুতে মানুষকে আকর্ষণ করে।

জাত নিয়ে আমার মনে কোন দুর্বলতা নেই ভাই। আমি অধ্যাপনা করি। ছাত্রের জাত বিচার করে তাদের ভালবাসি না, ভালবাসি তাদের গুণে। মানুষকেও মনুষ্যত্ব দিয়েই বিচার করতে হয়। কে ব্রাহ্মণ, কে কায়স্থ, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে কে কুলীন, কে ভঙ্গ, এত বাছ-বিচার করতে গেলে নিজেদেরই ঠকতে হবে। মানুষ মানুষ তার অন্য পরিচয় নেই।

প্রিয়ব্রত নিজেই অবাক হল। এ সব কি তার নিজের কথা, নিজের মত! মনে হল নেপথ্য থেকে কে যেন বলে চলেছে আর শুনে শুনে প্রিয়ব্রত আউড়ে যাচ্ছে।

কে বলছে নেপথ্য থেকে, প্রিয়ব্রতর বিবেক? প্রিয়ব্রতর সংবেদনশীল মন? প্রিয়ব্রত নিজের সব হারানোর ক্ষোভ!

কিছুই জানে না প্রিয়ব্রত, শুধু একটা জিনিস সে উপলব্ধি করছে। নতুন চিন্তার বন্যা আসছে, নতুন জ্ঞানের প্রবাহ। মানুষে মানুষে বাধা, বিরোধের প্রাচীর, এ সব সংকীর্ণতা নিশ্চিহ্ন না হলে মনুষ্যত্বের মুক্তি নেই।

অভিজাত শ্রেণীর যে মেয়েটি সাজে পোশাকে লাস্যে হাস্যে বারাঙ্গনাকেও লজ্জা দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে কুৎসিত এক দৃশ্যের অবতারণা করে গেল, শুধু ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলে, তার পিতামাতা ব্রাহ্মণ বলে, সে সমাজের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে থাকবে, এ প্রহসনের পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী হওয়া অনুচিত, আর নীলার মতন মেয়ে ব্রাহ্মণেতর এক পুরুষকে, যে সব বিষয়ে ব্রাহ্মণের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, বিবাহ করেছে বলে সমাজে অপাংক্তেয়া, ব্রাত্য হয়ে থাকবে এই যদি সমাজের বিধান হয়, তবে সে সমাজের উৎখাত প্রয়োজন।

এই সুযোগে নীলা কথাটা পাড়ল।

দাদা, একটা কথা বলব ?

বল।

আজ তোমাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে।

কথাটা তুই না বললে আমিই বলতাম। প্রিয়ব্রত হাসল।

একগাল হেসে নীলা বলল, তোমরা দু জনে বসে বসে গল্প কর, আমি রান্নার ব্যবস্থা করি গে।

তরুণ আর প্রিয়ব্রত মুখোমুখি বসল।

অনেক কথা হল দু জনে। তরুণ কারখানায় ভাল কাজই করে। মাইনেও মোটা। লেখাপড়া খুব বেশী শেখে নি, কিন্তু জানে অনেক।

কথাটা মনে হতেই প্রিয়ব্রত মুখ টিপে হাসল। মার ধারণা নীলা বুঝি কারখানার লোহা-পেটানো এক কুলির সঙ্গেই পালিয়েছে। খবরটা মাকে ঠিকভাবে জানানো দরকার। অবশ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থর প্রশ্নটা রয়েছে। সেটার সম্বন্ধে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথাও ভাল করে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সবচেয়ে কাজের হবে, মাকে কোন রকমে একবার নীলা আর তরুণের সংসারের মধ্যে এনে ফেলতে পারলে। সে ইচ্ছাই প্রিয়ব্রতর আছে। মফস্বলে যাবার আগে মাকে কলকাতায় নিয়ে আসবে। একসঙ্গে রওনা হবে এখান থেকে। সেই সময় কিছু না বলে মাকে এখানে নিয়ে আসবে প্রিয়ব্রত। দেখবে এমন নিটোল, মনোরম একটা সংসারের মাঝখানে এসে কি করে মা মুখ ফিরিয়ে থাকে !

খেতে বসে নীলা কথাটা বলল।

তরুণ আর প্রিয়ব্রত পাশাপাশি বসেছে। পরিবেশন করছে নীলা।

খেতে বসেই প্রিয়ব্রত পরিহাসের সুরে বলেছে, আমার এতদিনের এত কষ্ট করে বাঁচিয়ে রাখা জাতটা মারলি তো এমনই ভাবে।

তরুণ আর নীলা দুজনেই হেসে উঠল।

নীলা বলল, দাদা, এবার তুমি একটা বিয়ে কর। সারাটা জীবন তো কেবল লেখাপড়াই করলে।

প্রিয়ব্রত হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসি ঠিক ফুটল না।

গরীব অধ্যাপককে কে আর মেয়ে দেবে বল?

তরুণ বলল, দাদা, আপনি একবার মত দিন, বাকিটা আমি করব।

কি রকম। ঘটকালিও কর নাকি?

আমাদের ম্যানেজারেরই দুটি মেয়ে। দাদার মতন পাত্র পেলে বেঁচে যাবে।

চালাকি রাখ, দাদা, এবার সত্যি একটা বিয়ে কর। নীলা অনুযোগ করল।

প্রিয়ব্রত আর কথা বাড়াল না। পরিহাসের সুরে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রিয়ব্রত ভারসাম্য রাখতে পারছে না। মুখের ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতায় ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

খাওয়া শেষ করে প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল।

তরুণ, নীলা, অনেক রাত হয়ে গেল, আজ চলি।

তরুণ নীলার কাছে গিয়ে চাপা গলায় কি বলল, নীলা প্রিয়ব্রতের দিকে ফিরে বলল, দাঁড়াও দাদা, আমরা তোমাকে বাসস্টপ অবধি পৌঁছে দিয়ে আসব।

তাতো আসবে, কিন্তু সামনের রবিবার তোমরা দুজনে আমার ওখানে খাবে। একটু সকাল সকাল যেও, বসে গল্পগুজব করা যাবে।

নীলা চোখ ফেরাল তরুণের দিকে। তরুণ নীলার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর দুজনে প্রিয়ব্রতর দিকে দেখল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে।

নীলা বলল, তুমি তো আর একজনের বাড়ীতে খাও বললে, তুমি আমাদের কি খাওয়াবে?

নিমন্ত্রণ যখন আমি করছি, তখন সে দায়িত্ব আমার।

বাসস্টপ পর্যন্ত তিনজনে পাশাপাশি গেল গল্প করতে করতে।

প্রিয়ব্রত নীলাকে এভাবে কথা বলতে, এত কথা বলতে কখনও শোনে নি। নীলার যেন নবজন্ম হয়েছে। আগের দিনের সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত নীলা আজ প্রসারিত, নির্ঝরের মতন মুখর।

সে রাতে নিজের বিছানায় শুয়ে প্রিয়ব্রত অনেক কথা ভাবল।

প্রেমে আর রণে ভীরুর স্থান নেই। আজ যদি তরুণ সমাজের ভয়ে, লোকলজ্জার ভয়ে সরে যেত, নীলাকে পাশে না ডাকত সাহস করে, তা হলে কোনদিনই দু জনের মিলন সম্ভব হত না।

নীলাকে ধরে বেঁধে হয়তো পাত্রস্থ করা হত, কিন্তু এমন পাত্র প্রিয়ব্রত কোনদিন যে যোগাড় করতে পারত না, সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মিথ্যা লোকাচার আর কৌলিন্য প্রথার ভয়ে প্রিয়ব্রতও কি সরে দাঁড়ায় নি!

যদি তার এগিয়ে যাওয়ার সাহসেরই অভাব, অবরোধ ভাঙবার মতন বিস্তৃত বক্ষপট নেই, তাহ'লে ওভাবে কেন কাছে টানতে গিয়েছিল সুমিতাকে? ভালবাসা নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

সুমিতা নারী, সে কি করতে পারে? উদ্ধত তর্জনীর বিরুদ্ধে সাহস সে কি করে সংগ্রহ করবে, যদি তাকে বাইরের লোক সাহস না জোগায়!

তরুণ অকুণ্ঠ আহ্বান জানিয়েছে বলেই নীলা ঘর ছাড়তে পেরেছে।

প্রিয়ব্রত নিজেকে নিজে উপদেশ দিল, অধ্যাপক, সৈনিক হও। উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত।

সকালে কড়া নাড়ার শব্দে প্রিয়ব্রতর ঘুম ভেঙে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত সে বিছানায় ছটফট করেছে। প্রাণান্তকর চিন্তা। তন্দ্রা এলেই টুঁটি টিপে তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। নিজের দুর্বলতা, নিজের

ভীরুতায় ঘৃণা এসেছে নিজের ওপর। এরপর সুমিতা যদি শ্রদ্ধা হারায় তার ওপর, তা হ'লে সে কি খুব অন্যায় করবে।

ঘুম চোখেই প্রিয়ব্রত দরজা খুলে দিল। খুলে দিয়েই অবাক। চিত্ত দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের ওপারে। হাতে বেলফুলের মালা।

প্রিয়ব্রত হাসল, কি ব্যাপার, সাত-সকালে কবি যে?

চিত্ত ঘরে ঢুকে প্রিয়ব্রতর গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ডক্টরেট পাবার খবরটা কাল শুনলাম প্রিয়দা, কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে। এ-ও শুনলাম আপনি বাইরের কলেজে চান্স পেয়েছেন। চলে যাচ্ছেন আমাদের মায়া কাটিয়ে।

তাই ভোরবেলা একেবারে মালা নিয়ে এসেছ।

আমরা অভাজন, এ ধরনের সস্তার সম্বর্ধনা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন।

গলা থেকে মালাটা খুলে প্রিয়ব্রত টেবিলের ওপর রেখে বলল, বস একটু, চায়ের কথা বলে আসি।

রত্না নেই, সেইজন্য বাড়তি লোকের চায়ের ব্যবস্থা প্রিয়ব্রত বাইরের রেঁস্তরায় করে। অবশ্য বাড়তি লোক তার বাড়ীতে আর কে আসছে।

শুধু চা নয়, চা, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ।

চিত্ত বলল, করেছেন কি দাদা, এতো ভূরিভোজ। গৌরী রায়ের বাড়ীর চাকরি যাবার পর থেকে চায়ের সঙ্গে এত রকম জিনিস খেতে হয় ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রিয়ব্রত চুমুক দিতে গিয়েও চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল।

আরে ভাল কথা, কাল যে তোমার ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

কোন ছাত্রী?

ওই যে গৌরী রায়, আর একটু হ'লেই চাপা দিত আমাকে। ইচ্ছাকৃত কিনা অবশ্য জানি না।

সে কি? বিস্মিত চিত্ত টান হয়ে বসল।

প্রিয়ব্রত ঘটনাটা চিত্তকে বলল। কি অবস্থায় গৌরীকে দেখেছে, সেটাও।

চিত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, গৌরী এখন ফিল্মস্টার হয়েছে শুনেছেন বোধ হয়? একদিন তার ভাই প্রবীর রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। তিনি বের হচ্ছিলেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শো-কেসে সস্তার জুতা খুঁজছিলাম। তিনি বললেন, গৌরী নাকি শীগ্‌গিরই বম্বে যাচ্ছে, অনেক টাকার অফার পেয়ে।

প্রিয়ব্রত চায়ের কাপ সরিয়ে রাখল। চিত্তর দিকে চেয়ে হেসে বলল, আগেকার বর্ণাশ্রম ধর্মের একটু পরিবর্তন দরকার চিত্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল উপ-জীবিকা হিসাবে, কিন্তু কালক্রমে উপজীবিকা নয়, বংশই এর মাপ-কাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হচ্ছে, শূদ্রের ছেলে শূদ্র। কিন্তু এ বিধি আজকাল অচল। যারা ছলে বলে কৌশলে, মান মর্যাদা, ঐতিহ্য সব বিসর্জন দিয়ে অর্থোপার্জনটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলেছে তারাই বৈশ্য। তাদের আলাপ আলোচনা, আহার বিহার, লাঞ্চ ডিনার সবই একমুখী। অর্থাগম। তুমি আমি ক্ষত্রিয়। যারা বাহুবলে ভীড় ঠেলে নিজেদের আসন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি। আমাদের পৌরুষই পাথেয়। অধ্যবসায়, শাণিত অস্ত্র। ভিক্ষাজীবিরা ব্রাহ্মণ। হাত পেতে থাকে আবার দান না পেলে বিড় বিড় করে অভিশাপও দেয়।

প্রিয়ব্রতর বিশ্লেষণ আরো কিছুক্ষণ হয় তো চলত, কিন্তু দরজার গোড়ায় পতিতপাবনবাবু এসে দাঁড়াতে সে থেমে গেল।

মেয়ের বাড়ীতে যাচ্ছি প্রিয়ব্রতবাবু। সেইজন্য আজ অফিসেও ছুটি নিয়েছি। অনেকদিন দেখি নি। খুব কান্নাকাটি করে কাল চিঠি লিখেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ যাবেন বৈ কি। রত্নাকে বলবেন একদিন আসতে। আমি যাবার আগে তাহলে একবার যদি দেখা হয়।

বলব, বলব, আপনার কথা নিশ্চয় বলব।

পতিতপাবনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

চিত্ত চলে যেতেই প্রিয়ব্রত সকাল সকাল স্নান সেরে নিল। আজকাল আর নীচে খেতে দেয় না, প্রিয়ব্রতকে ওপরে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়। পতিতপাবনবাবুর পুরোনো চাকরই সব ব্যবস্থা করে দেয়।

বিকেলের দিকে প্রিয়ব্রত ফর্সা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরল। বালিশের তলা থেকে হাতড়ে সব টাকাগুলো ব্যাগে পুরে নিল। কিছুক্ষণ টেবিলে ভর দিয়ে কি ভাবল তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সুমিতাদের বাড়ীর সামনে প্রিয়ব্রত যখন নামল, তখন গলি ফাঁকা। অফিসযাত্রীরা সবাই চলে গেছে।

প্রিয়ব্রত মন ঠিক করে ফেলল। আর কোন দ্বিধা নয়, সঙ্কোচ নয়, সোজা কড়া নেড়ে সুমিতাকে ডাকবে। সুমিতা সাবালিকা, তার যদি মত থাকে তাহলে দুনিয়ার কোন ব্যক্তিই তাকে বাধা দিতে পারবে না।

ভাগ্য ভাল প্রিয়ব্রতর। সদর দরজা পর্যন্ত যেতে হল না। ছাদে সুমিতা কাপড় তুলতে এসেছিল, প্রিয়ব্রতকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

প্রিয়ব্রত হাত নেড়ে তাকে নীচে আসতে ব'লে, পাঁচিলের ওধারে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ পরে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে সুমিতা এসে দাঁড়াল।

বেশী কথা বলতে প্রিয়ব্রতর সাহস হল না। কেবল ফিস ফিস করে বলল, আমার পিছন পিছন এস।

মোড়ের কাছেই চিরন্তনী কাফে। একেবারে জনশূন্য।

প্রিয়ব্রত তারই একটা পর্দাঢাকা কেবিনে গিয়ে ঢুকল। পিছনে সুমিতা।

সুমিতা হাঁপাচ্ছে। আরক্ত মুখ। ছুটি চোখ বিস্ফারিত।

কি ব্যাপার ?

আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। তার আগে বল তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন আছে কিনা ?

টেবিলের ওপর রাখা প্রিয়ব্রতর একটা হাত সুমিতা নিজের হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল, তুমি কি এই কথা শোনাবার জন্য এতদিন পরে আমার কাছে এলে ? আমার যে কি অবস্থা কি করে তোমাকে আমি জানাব। মা সর্বদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। অনেক-দিন হয়ে গেল, তাই শাসনের বাঁধন একটু আলগা। মা এখন ঠাকুর ঘরে, সেই ফাঁকে আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রিয়ব্রত সুমিতার হাত ছাড়ল না। কেবল বয়টা কেবিনে ঢুকতে তাকে ছু কাপ চায়ের অর্ডার দেবার সময় একটু সরে বসেছিল।

বয়টা চলে যেতে বলল, তুমি সাবালিকা। আইন তোমার সপক্ষে। তুমি যদি আমাকে চাও তো, তোমার মা কিংবা দাদা বাধা দিতে পারবেন না। এখন তোমার সাহসের দরকার।

আমায় কি করতে হবে বল ?

তোমাকে আমি আমার বোনের বাড়ী রেখে আসব। তারপর একটা দিন দেখে আমাদের বিয়ে হবে। তুমি রাজী ?

রাজী ? কিন্তু কবে ? আমার মনে হয় ছুতিন দিনের বেশী দেরী হবে না। তুমি তৈরী থেক। আমি আবার আসব।

প্রিয়ব্রত রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার কলকাতা। এক পা এগোনো দুষ্কর। রাজপথ মোটরাকীর্ণ। ফেরিওয়ালা আর পথচারী নিজেদের মধ্যে আপোষে ফুটপাথ ভাগ করে নিয়েছে, তাতে ছু' পক্ষেরই কষ্ট বেড়েছে।

অফিস-ফেরত কেরাণীর দল, কোর্ট-ফেরত উকিল আর মামলা-বাজ, হাট-ফেরত ব্যাপারী সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত ভাবল আশপাশের সংকীর্ণ সড়ক ধরে পার হয়ে যাবে কিন্তু অপ্রশস্ত গলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। বিচিত্র জনতার সঙ্গে গোটা কয়েক বৃষনন্দনকেও দেখা যাচ্ছে। অনেক ভেবে চিন্তে প্রিয়ব্রত রাজপথ ধরেই চলতে আরম্ভ করল।

এই প্রথম নিজের জীবিকার কথা চিন্তা করে প্রিয়ব্রত কিছুটা যেন আনন্দের আস্বাদ পেল। ঈশ্বর করুণাময়। আজ যদি তাকেও কোন সরকারি কিংবা বেসরকারি অফিসে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এভাবে দিনের শেষে ফিরতে হতো, রক্ত স্বেদে রূপান্তরিত করে, জনতার মধ্যে নিজের সত্তাকে বিলীন করে, তাহলে প্রিয়ব্রত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

বেসরকারি মেয়ে কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। পদমর্যাদায় যতটা কৌলীন্য, অর্থের দিক দিয়ে ততটা নয়। তবুও নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রা। জনতার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে, হট্টগোলের পাশ কাটিয়ে নিজের সুবিধামত যাওয়া আর আসা। এ শহরের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে হয়তো কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, তবু শান্ত, নিরুত্তেজ দিনযাপন।

নিজের সুবিধামত যাওয়া আসা?

প্রিয়ব্রত মনে মনে কথাটা একবার হিসাব করল। হয়তো তা নয়, কিন্তু দশটা পাঁচটা একটানা খাটুনির ব্যাপারও নয়। দিনে গোটা তিনেকের বেশী ক্লাস কোনদিন থাকে না। একটা ক্লাশের ওপরই অবশ্য তার ঝোঁক বেশী। তন্বী, লাজনম্রলোচনা যে ক্লাশ আলো করে বসে থাকে। ক্লাশে, ক্লাশের বাইরে, গৃহস্থ পরিবেশে নানাভাবে তাকে প্রিয়ব্রত দেখেছে, কিন্তু প্রতিবারই যেন নতুন, প্রতিবারই অনন্যা। মেঘমাশ্লিষ্ট গিরিরাজের পলকে পলকে রূপ পাল্টানোর মতন।

অধ্যাপক মানেই বুঝি কিছু ভীরু, নীতিজ্ঞানের প্রখরতায়

দ্বিধাগ্রস্ত। তা না হলে এতদিন ধরে সামান্য একটি কথা বলতে এত ইতস্তত সে কেন করছে। আধুনিক যুগের যে কোন তরুণের কাছে এ একটা সমস্যাই নয়। একটা নারীর চিত্ত জয় করতে তাদের সময়ই লাগে না।

কিন্তু প্রিয়ব্রতর জীবন সমস্যাবর্জিত নয়। একটা পুরো সংসার তার ওপর নির্ভর করে রয়েছে। মায়ের আকুলতা, উদ্বেগ সব কিছু তাকে কেন্দ্র করে।

এতদিন পরে সে সমস্যার কিছু সমাধান নিশ্চয় হয়েছে। কষ্টার্জিত উপাধি প্রিয়ব্রতর উপল-বিষম যাত্রাপথে নিশ্চয় কিছুটা সাহায্য করবে। সুমিতাকে কাছে টানার পক্ষে আর তো কোন প্রতিবন্ধক নেই।

অবশ্য শুধু নিজের কথাই প্রিয়ব্রত এতদিন চিন্তা করেছে। ভেবেছিল সুমিতাদের সংসারে প্রিয়ব্রত নিশ্চয় লোভনীয় পাত্র। সে হাত বাড়ালেই, প্রসারিত হাতে আর একজন এসে ধরা দেবে।

সুমিতার ভাই মনীশ কোন কিছু অন্ধকারে রাখেনি। প্রিয়ব্রতর একদা সহপাঠী, সেজন্যই খোলাখুলি ভাবে আলাপ করতে তার কোন অসুবিধা হয়নি।

কথাটা মনে হলেও প্রিয়ব্রতর হাসি পায়।

বিজ্ঞানের এই মধ্যাহ্নে, মানুষ যখন যে গ্রহে বাস করে, তার রহস্য জেনেই তৃপ্ত নয়। অভিযান চালায় ভিন্ন গ্রহে, নতুন নতুন রহস্যের গ্রন্থিমোচনের দুর্গম প্রতিজ্ঞায় অটল, তখন জাত, সম্প্রদায় কৌলীন্য এই নিয়ে একদল লোক অর্থহীন উত্তেজনায় নিজেদের নিঃশেষিত করছে।

প্রিয়ব্রত স্থির সংকল্প করেছে, এসব অলীক, পুরোহিতের মনগড়া বাধা তার জীবনের সার্থকতার পথে অন্তরায় হতে দেবে না। যে শিক্ষার আলোক তার মনের অন্ধকার ঘোচাবার ভার নিয়েছে, যে সৎচিন্তার অন্য নাম বিবেক, তার নির্দেশই সে অনুসরণ করবে।

স্যার।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে প্রিয়ব্রত পথে পা দিয়েছিল, হঠাৎ মোটরের হর্ণ আর নারীর কণ্ঠস্বর কানে যেতে সে চমকে সরে দাঁড়াল।

আসুন স্যার। গৌরী রায় একটা হাত আলতো ভাবে চালনচক্রের ওপর রেখে, আর এক হাতে মোটরের দরজা খুলে দিয়েছে।

আমি? কোন কিছু না ভেবেই প্রিয়ব্রত বলল।

গৌরী খিল খিল করে হেসে উঠল। ক্লাশেও সামান্য রসিকতায় সে এমনি করেই হেসে ওঠে। সারা দেহে হিল্লোল তুলে। বলল, রংটা কি এতই বেশী হয়ে গেছে স্যার, এত কাছে থেকেও আপনি চিনতে পারছেন না?

প্রিয়ব্রত সোজাসুজি চোখ তুলে দেখল। মনে পড়ে গেল। কালও গৌরী এমনই করেই আহ্বান করেছিল। কালও তার সারা মুখ এমনি রঙে চিত্রিত করা ছিল।

কাল প্রিয়ব্রত আহ্বানে সাড়া দেয় নি। দিতে পারে নি। নিজের সম্বন্ধে তার দ্বিধা ছিল, আজ কিন্তু সে সঙ্কোচহীন। সুমিতার সঙ্গে সব কথা তার হয়ে গেছে। দুজনের মাঝখানে আর কিছু বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

আজ আর আপনার ভয় নেই স্যার। আজ আমি স্টুডিয়ো যাচ্ছি না, সেখান থেকে ফিরছি। চলুন আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।

অনেকগুলো বিস্ফারিত, ঈর্ষাকুটিল, কৌতূহলী চোখের সার। এভাবে পথরোধ করে গৌরীর মোটর বেশীক্ষণ দাঁড়াতেও পারবে না। অন্য যানবাহন আপত্তি জানাচ্ছে। তাছাড়া এ ভীড় ঠেলে হেঁটে হেঁটে যেতেও প্রিয়ব্রতর অনেক সময় নেবে। তার বদলে যদি দামী সীটে হেলান দিয়ে এই দুর্গম পথটুকু নক্ষত্রবেগে পার হওয়া যায়, তাহলে প্রিয়ব্রতর আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না।

প্রিয়ব্রত পাশে বসতে হাতটা প্রসারিত করে গৌরী দরজাটা বন্ধ করে দিল। ইচ্ছা করেই কি না কে জানে, হাতটা প্রিয়ব্রতর বুক ছুঁয়ে গেল।

এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন স্যার? গৌরী একটু চিন্তার ভান করল, তারপরই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে এই ভাবে বলল, ওঃ আমি কি বোকা! হ্যারিয়েটের বাড়ি গিয়েছিলেন, তাই না স্যার?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রিয়ব্রত বিস্মিত হল, হ্যারিয়েট? হ্যারিয়েট কে?

ভুলে গেলেন স্যার, শেলীর-প্রণয়িণী!

কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী মোটরে স্টার্ট দিল। গর্জনে তার শেষ দিকের কথাগুলো প্রায় ডুবে গেল, কিন্তু শুনতে প্রিয়ব্রতর একটুও অসুবিধা হল না।

সারা মুখে আবিরের রং ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জার ছায়া নামল দু'চোখে। অস্বস্তিকর এক অবস্থা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রিয়ব্রত জানলা দিয়ে বাইরের চলমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে রইল।

আমার এ গলি দিয়ে আসবার কথা নয় স্যার। পথ বাঁচাবার জন্য এ গলিতে ঢুকলাম। তখন কি জানতাম এ শহরের সব লোক পথ বাঁচাবার জন্য এ রাস্তাটাই বেছে নিয়েছে।

কথা শেষ করে আবার সেই হাসির হিল্লোল।

গৌরীর অঙ্গ থেকে মৃদু সুরভি একটা ভেসে আসছে। কিন্তু শুধু কি সুরভি? তার পাশাপাশি আরো একটা কিসের যেন মদির গন্ধ।

বাতাস শুঁকে প্রিয়ব্রত সেই গন্ধের স্বরূপ চেনার চেষ্টা করল। পারল্ না।

আমাকে আপনি ঘৃণা করেন, তাই না স্যার?

গৌরীর আচমকা প্রশ্নে প্রিয়ব্রত বিব্রত হয়ে পড়ল। একটু সামলে নিয়ে বলল, এ কথা বলছ কেন ?

আমি সিনেমায় নেমেছি। লেখাপড়া করলাম না। আমাদের মতন মেয়েকে আপনারা তো ঘৃণাই করেন স্যার।

প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বোধহয় কি বলবে সেটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিল, তারপর বলল, পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে গৌরী। এত তুচ্ছ কারণে মানুষ আজকাল আর মানুষকে ঘৃণা করে না। জীবিকার রকমফের আছে। নিজের শক্তি অনুযায়ী, বুদ্ধি অনুযায়ী, পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। নাট্যকলা, শিল্প, ছায়াছবি এগুলো হচ্ছে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করার মাধ্যম। তুমি তো কোন অন্যায় করনি।

কথাগুলো শেষ করেই প্রিয়ব্রতর মনে হল অনেকটা যেন ক্লাশে বক্তৃতা দেবার সুর এসে গেল কথাগুলোর মধ্যে। অধ্যাপনার এই এক দোষ। কিছু বলতে গেলেই অনর্থক কতকগুলো নীতি কথা এসে ভীড় করে। সহজ সরলভাবে কিছু বলতে পারে না। বলা যায় না।

তবে একটা কথা কি জানেন স্যার ?

কি ?

আমার মা নেই কি না তাই। ছেলেবেলায় মা হারালে তাকে পথ দেখাবার, ভাল কথা বলবার কেউ থাকে না। মা'র আসন পৃথিবীতে আর কেউ নিতে পারে না। অন্য সব অনুভূতি যেখানে পরাস্ত হয়, স্নেহ সেখানে জয়লাভ করে।

প্রিয়ব্রত বিস্মিত হল।

এই মুহূর্তে গৌরীর কথাবার্তাগুলো ক্লাশের দুর্বিনীতা, অশান্ত, পরিহাস-মুখরা কোন মেয়ের কথা বলে মনে হল না। গৌরীকে বহুবার প্রিয়ব্রত হাসতে দেখেছে। ক্লাশ ছাপিয়ে, করিডর ছাপিয়ে

উদ্দাম কলহাস্য। কিন্তু আজ যেন কণ্ঠস্বরে কান্নার মিশেল। দুটো চোখের কোণে অশ্রুর চিহ্ন কিনা আধ-অন্ধকারে সঠিক প্রিয়ব্রত দেখতে পেল না।

বাড়িতে ভাল লাগে না স্যার, তাই বাইরে সান্ত্বনা খুঁজি। ষ্টুডিও আমাকে যশ, অর্থ না দিক আমায় বিস্মৃতি দিয়েছে। পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার অবকাশটুকু হরণ করে নিয়েছে।

কেন, আমাদের কলেজের চিত্ত তোমায় পড়াচ্ছিল শুনেছিলাম। তোমার দাদা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন?

চালনচক্র ঘুরিয়ে ভীড় থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে করতে গৌরী বলল, আপনি পড়াতে অস্বীকার করার পর দাদা চিত্তবাবুর কাছে গিয়েছিলেন।

আমার সময় কোথায় গৌরী?

সময় আপনার ছিল স্যার, কিন্তু ইচ্ছা ছিল না। আমার দুর্নামের ভয়ে আপনি এগোতে সাহস করেন নি। আমার সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে কুৎসা রটলে সে অসম্মানের ভার আপনি সইতে পারতেন না।

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না। দেওয়া নিরাপদ নয়। আজ বুঝি গৌরী মনকে তৈরি করে এসেছে। তার তূণীরের তীক্ষ্ণতম শায়ক একে একে নিক্ষেপ করছে। করুক, প্রিয়ব্রতর আর ভয় নেই। আর কয়েকটা দিন। সুমিতাকে গ্রহণ করার পর এসব অভিযোগ নিরর্থক হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রিয়ব্রত নীরব থাকলে কি হবে, গৌরীর মুখর হতে কোন বাধা নেই। কুৎসা থেকে অবশ্য আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন নি স্যার।

কিসের কুৎসা? প্রিয়ব্রত ভ্রূ কোঁচকাল।

কলেজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তবে একদা-সহপাঠিনীরা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। তারা বলে যে আপনাদের

মেলামেশার ব্যাপারে ভয় পেয়ে, সুমিতার বাড়ির লোকেরা নাকি অন্য জায়গায় সম্বন্ধ দেখছে।

প্রিয়ব্রত নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল। এভাবে কথায় কথায় কুয়াশা ঘন হতে দেওয়া উচিত নয়, তাহলে এ কুয়াশা সূর্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যে সূর্য সত্যের প্রতীক।

এতটা যখন শুনেছ, তখন আর একটা কথাও শুনে রাখ গৌরী।

কি বলুন ?

প্রিয়ব্রতর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় গৌরী বিস্মিত হল।

সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

ঠিক হয়ে গেছে ?

অ্যাকসেলারেটর থেকে পা তুলে গৌরী ব্রেকে পা রাখল। ঠিকমত পা বোধহয় পড়েনি। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় মোটর থামল। সামনে জমাট জনতা। লাল আলোর দ্যুতি।

চৌকো রুমাল বের করে গৌরী কপালের স্বেদবিন্দু মুছল। হেলান দিল সিটে। পাশের দিকে চোখ না ফিরিয়ে বলল, কলকাতায় ড্রাইভিং করায় কোন আনন্দ নেই। মানুষ বাঁচিয়ে চলতে চলতে নিজেকে বাঁচানো দুস্কর হয়ে পড়ে। নার্ভের ওপর এত চাপ পড়ে।

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না। কোন উত্তর গৌরী প্রত্যাশাও করেনি। কথাগুলো প্রায় স্বগতোক্তির সগোত্র।

একসময় লাল আলো হলুদে রূপান্তরিত হল। তারপর সবুজ।

আবার ক্লাচ, অ্যাকসেলারেটর, গীয়ারের কারসাজি। গৌরী গাড়ির বেগ বাড়াল। স্পীডোমিটারের কাঁটা চল্লিশের ঘরে থরথরিয়ে কাঁপছে।

স্পীড এত বাড়াচ্ছ কেন ? প্রিয়ব্রতর সন্ত্রস্ত, সতর্ক কণ্ঠ।

গৌরী হাসল, স্পীডে আপনার ভয় পাওয়া একটু স্বাভাবিক

স্যার, নতুন ঘর বাঁধতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার বাঁধনের কোন বালাই নেই। গতিই আমার জীবনের সঙ্গী।

এই অর্থহীন কথারও উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এই কথা প্রিয়ব্রত বলতে পারত, সে পাশেই রয়েছে। গতির সর্বনাশা নেশা প্রিয়ব্রতকে ক্ষমা করবে না। ক্ষতি কিছু হলে তারও হবে।

কিন্তু সে আর কিছু বলল না। আজ আর কারো সঙ্গে এভাবে কথা কাটাকাটি খেলা খেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কিছুটা সমস্যাসঙ্কুল। সুমিতার মা আর দাদার কাছে সে যে খুব বাঞ্ছিত পাত্র এমন মনে করার কোন হেতু নেই।

প্রিয়ব্রত কুলীন নয়, ভঙ্গ, অথচ সুমিতার জন্যে তারা কুলীন ছাড়া অন্য পাত্রের কথা চিন্তা করতে পারছে না। তাদের কাছে বংশের মর্যাদা মেয়ের সুখশান্তির চেয়ে অনেক কাম্য।

সুমিতা আমাকে নিমন্ত্রণ করবে না। ক্লাশেও সে আমাকে এড়িয়ে চলত। ঈশ্বর জানেন আমাকে সে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবত কি না। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না। ডাকে অন্তত একটা কার্ড পাঠিয়ে দেবেন।

প্রিয়ব্রত উত্তর দেবার আগেই সর্বনাশ ঘটল।

গৌরী প্রাণপণ শক্তিতে মোটরটা সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না।

বস্তা বোঝাই একটা লরি নক্ষত্রবেগে গাড়ির ওপর এসে পড়ল। তাও সোজাসুজি নয়, একটু কোণাকুণিভাবে, কিন্তু তাতেই যা ঘটল, তা উপেক্ষার নয়।

প্রিয়ব্রতর মনে হ'ল চোখের সামনে যেন হাজার ক্যাণ্ডেল একরাশ বাতি চুরমার হয়ে গেল। দু' কানে বজ্রের নির্ঘোষ। অনেকগুলো লোকের ভয়ার্ত চিৎকার দূরাগত সঙ্গীতের মত ভেসে এল।

বলিষ্ঠ একটা বাহুর ধাক্কায় প্রিয়ব্রত মোটর থেকে ছিটকে

বাইরে গিয়ে পড়ল। তারপর ঘন জমাট অন্ধকার। শব্দহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন।

অনেক, অনেক পরে প্রিয়ব্রত যখন চোখ মেলল, দেখল সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে এক পরিচ্ছন্ন বিছানার ওপর সে শুয়ে আছে। কড়া ওষুধের গন্ধ। মাথায়, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুক্ষণ ধরে এদিক থেকে ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রিয়ব্রত দেখল।

মাথার কাছে সঞ্চরমান একটা ছায়া। আর কেউ কোথাও নেই। উত্তরটা প্রিয়ব্রতর জানা ছিল, তাও সে প্রশ্ন করল, আমি কোথায়?

সাদা অ্যাপ্রণ পরা একটা নার্স এসে পাশে দাঁড়াল। প্রিয়ব্রত তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, আমি কোথায়?

হাসপাতালে। সুখলাল কারনানী হাসপাতাল। থেমে থেমে নার্সটি স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করল।

হাসপাতাল। প্রিয়ব্রত বিড় বিড় করে বলল, আমার কি হয়েছিল?

মোটর অ্যাকসিডেণ্ট।

ছায়াছবির মতন সমস্ত দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শুরু থেকে শেষ। সুমিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রিয়ব্রত হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। কিছুটা এগোতেই গৌরী ডেকে তার মোটরে তুলে নিল। ষ্টুডিও থেকে গৌরী ফিরছিল। মুখে রঙের প্রলেপ, চোখে কাজলের বাহার, সারা অঙ্গে সুমিষ্ট সুবাস। তারপর!

তারপরের কথাটা প্রিয়ব্রত ভাবতে লাগল। মোটরের ওপর দুর্নিবার বেগে একটা লরি ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আলোর দ্যুতি, তারপরই নিরন্ধ্র অন্ধকারের বন্যা।

প্রিয়ব্রত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় হাসপাতালের বেডে। কিন্তু গৌরীর কি হ'ল? সে কেমন আছে?

নার্স। প্রিয়ব্রত আবার ডাকল।

বলুন। নার্স এবারে একেবারে বিছানার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল

গৌরী, মানে আর একটি মেয়ে ছিল মোটরে, আমার পাশে তার কি হয়েছে? সে কেমন আছে?

নার্স বিছানার ওপর বসল। একটা হাত রাখল প্রিয়ব্রত চুলের মধ্যে। আস্তে আস্তে বলল, আপনি এত কথা বলবেন ন বেশী কথা বলা ডাক্তারের বারণ। আপনি সেরে উঠুন, সব শুনে পাবেন।

মমতা মাখানো দুটি চোখের দৃষ্টি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। এর অনুরো বুঝি উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া কথা বলতে প্রিয়ব্রত রীতিমত কষ্টও হচ্ছে।

খুব ধীরে প্রিয়ব্রত দুটি চোখ নিমীলিত করল। কিন্তু চো বন্ধ করলেই চিন্তার স্রোত রুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

এমনভাবে কেন কথা বলল নার্স? তার মানে গৌরীর চরম বিপদ কিছু ঘটেছে? সেইজন্যেই তার সংবাদটা এই মুহূ নার্স জানাতে চায় না। প্রিয়ব্রত সুস্থ হলে, শোক সহ্য করা মতন শক্ত হলে তখন শুনবে সেই সর্বনাশের কাহিনী।

আরো কিছুদিন কাটল। ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের ঘোরের ম দিয়ে। আধ-চেতনা, আধ-তন্দ্রার ভিতর। নার্সের সাদা অ্যাপ্র রং-বেরংয়ের ওষুধ, ডাক্তারের ভারি কণ্ঠ, টেবিল থেকে ভেসে আ রজনীগন্ধার সুবাস।

তারপর সব কিছু বেশ স্বচ্ছ, বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। না প্রিয়ব্রতকে ধরে বালিশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। ব্যাণ্ডে আকার এখন অনেক ছোট। দেহের যন্ত্রণাও অনেক কম।

এবার প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করার আগে নার্স নিজের থেকে বলল, আপনি কিছুদিন আগে সুপর্ণা দেবীর খোঁজ নিচ্ছিলেন না?

সুপর্ণা দেবী? প্রিয়ব্রতর দু' চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। এমন কারো খবর কখনও জানতে চেয়েছে বলে মনে করতে পারল না সে। সুপর্ণা দেবী কে? তবে কি আঘাতের তীব্রতার জন্যে অসংলগ্ন কথাও কিছু কিছু বলেছিল।

সম্ভবত প্রিয়ব্রতর মনের অবস্থা নার্স বুঝতে পারল। বুঝিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল, সুপর্ণাদেবী, যিনি নতুন ফিল্মে নামছেন। দুর্ঘটনার দিন যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন?

গাড়ি চালাচ্ছিলেন? গাড়ি চালাচ্ছিল তো গৌরী, গৌরী রায়। আমার ছাত্রী।

নার্স মুচকি হাসল, সুপর্ণাদেবীর পূর্বজন্মের কুলুজি আমাদের জানবার কথা নয়। আপনার এ ধরণের ছাত্রী ক'টি আছে, তাও জানি না। তবে ভবিষ্যতে এদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন, নয়তো দুর্ঘটনায় আপনার মৃত্যু, জ্যোতিষী না হয়েও এ ভবিষ্যদ্বাণী আপনার সম্বন্ধে করতে পারি।

প্রিয়ব্রতর সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এ ধরণের হেঁয়ালীর স্বরূপ বুঝে উঠতে পারল না। বলল, কেন এসব কথা বলছেন বলুন তো?

এইজন্যে বলছি যে সুপর্ণাদেবী যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় কোন বুদ্ধিমতী মহিলা ষ্টিয়ারিং ছোঁন না।

যে অবস্থায় ছিলেন?

হ্যাঁ, She was fully drunk. প্রথম জ্ঞান ফিরে আসতে তিনি কি বললেন, জানেন? Oh, where is my Shelley! The idol of my heart. এই শেলীটি কে?

প্রিয়ব্রত আরক্ত হল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে একটু সংযত করে বলল, গৌরী কেমন আছে?

তাহলে সুপর্ণাদেবীর নামই কি গৌরী?

সম্ভবত। সুপর্ণাদেবীকে আমি চিনি না। আমার সঙ্গে মোটরে যে ছিল সে গৌরী।

ও, গৌরীদেবী উপস্থিত ভালই আছেন। যেদিন আপনি তাঁর খবর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেদিন তিনি বিপদ কাটিয়ে ওঠেননি।

গৌরী কোথায়?

তাঁর দাদা আর ভক্তবৃন্দরা মিলে তাঁকে কোন এক নার্সিং হোমে নিয়ে গেছেন।

গৌরীর আত্মীয়-স্বজনের কথায় প্রিয়ব্রতর নিজের পরিজনের কথা মনে পড়ল। নার্সের দিকে ফিরে বলল, আমাকে কেউ দেখতে এসেছিল?

আপনাকে? নার্স একটু চিন্তার ভান করল, তারপর বলল, এক ভদ্রলোক দিন দুয়েক এসেছিলেন। কি যেন নাম, দাঁড়ান, বলছি। ও, মনে পড়েছে, পতিতপাবনবাবু। তিনি আপনার আত্মীয় বুঝি?

তিনি আমার বাড়িওয়ালা।

বাড়িওয়ালা? আশ্চর্য তো। এ যুগে এমন বাড়িওয়ালা বিরল। আমি ভেবেছিলাম, বুঝি আপনার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়। আপনার এখানে নিজের লোক বুঝি কেউ নেই?

নিজের লোক, না এখানে কেউ নেই। আমার মা আর ছোট ভাই দেশের বাড়িতে থাকে। এ দুর্ঘটনার খবর তাদের জানবার কথা নয়।

মাঝপথেই প্রিয়ব্রত থেমে গেল। এ শহরেই তো তার আত্মীয় রয়েছে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নীলা আর তরুণ। বোন আর ভগ্নিপতি। কিন্তু তারাও বোধ হয় কোন খবর পায়নি। পেলেও খুঁজে খুঁজে ঠিক এই হাসপাতালে আসা খুবই কঠিন ব্যাপার।

এরা ছাড়াও তো আরো একজন রয়েছে। একেবারে আত্মার আত্মীয়। দু'দিন পরে যাকে অগ্নি সাক্ষ্য করে ধর্মপত্নীর আসনে

বসাবার কথা। সুমিতা। সুমিতা তো আসেনি। অথচ গৌরীর দাদা তাকে একটা খবর দিয়েছে হয়তো।

সুমিতা যদি না এসে থাকে তো দু' একদিনের মধ্যেই আসবে। কাল গৌরী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। নার্সিং হোমে গেছে শুধু শরীরকে বিশ্রাম দেবার জন্যে। লোক মারফৎ সুমিতাকে প্রিয়ব্রতর খবরটা দেবার পক্ষে এবার আর কোন বাধা নেই।

এইবার হয়তো সুমিতা এসে দাঁড়াবে। অশ্রু ছলছল চোখে, উদ্বেগে বিষাদে মেশানো ভয়ার্ত মুখে। কথা বলবে না, কিন্তু দুটি চোখ বাঙ্ময় হয়ে উঠবে। যে দুটি চোখের দৃষ্টিতে যুগযুগান্তের লিপি প্রিয়ব্রত পড়তে পারবে। আবেগে প্রিয়ব্রত দুটি চোখ বুজে ফেলল।

বিকালের দিকে প্রিয়ব্রতর একটু বুঝি তন্দ্রার ঘোর এসেছিল, হঠাৎ একটা শব্দে চমকে চোখ খুলল।

একেবারে বিছানার পাশে একটা চেয়ার। তারওপর চিত্ত বসে রয়েছে। চিত্ত ব্যানার্জি। প্রিয়ব্রতর কলেজের বাংলা অধ্যাপক।

প্রিয়ব্রতকে চোখ খুলতে দেখে বলল, শরীরটা বোধ হয় এখনও খুব দুর্বল?

প্রিয়ব্রত সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। নার্সের সাহায্য লাগল না, নিজেই বালিশটা ঠিক করে নিয়ে তাতে হেলান দিয়ে বসল।

চিত্তকে পরম আপনজন বলে মনে হচ্ছে, এ শহরে পরিচিত অর্ধপরিচিত এত লোক থাকতে দু'টি লোক তবু দেখা করতে এসেছিল। একজন পতিতপাবনবাবু। অবশ্য তার সঙ্গে প্রিয়ব্রতর দেখা হয়নি, কথা হয়নি। তখন কথা বলবার মতন অবস্থা তার ছিল না।

চিত্তর ওপর মনে মনে বেশ একটু অভিমানের মেঘ জমেছিল। এতদিন না আসার জন্যে। সেই অভিমানটুকুই ফুটে বের হল। এতদিন পরে এলে চিত্ত?

চিত্ত একটু লজ্জিত হল। কিছুটা অনুতপ্তও।

আমি এতদিন বাইরে ছিলাম প্রিয়দা, মানে মেদিনীপুরে। মাত্র দিন কয়েক আগে এক বাংলা কাগজের মফঃস্বল সংস্করণে খবরটা পড়ে চমকে উঠলাম। একবার ভাবলাম এক নামের তো কত লোক থাকে, কিন্তু অন্য লোক হওয়ার উপায় নেই। নাম, পেশা, কলেজ সব ফলাও করে লেখা। তার ওপর যার গাড়িতে ছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা। সবটা পড়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

কেন, মন খারাপ হল কেন ?

আরে, হেডিং দিয়েছে দেখুন না। পানোন্মত্তা চিত্রাভিনেত্রীর মোটরে তরুণ অধ্যাপক। লরির সহিত সংঘর্ষ।

প্রিয়ব্রত চুপ করে রইল। উত্তর দেবার মতন তার কিছু নেই। সংবাদপত্র অফিসে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েও কোন লাভ হবে না। তারা তো একটি বর্ণও ভুল ছাপেনি।

চিত্ত কিছুক্ষণ বোধহয় প্রিয়ব্রতর মুখ চোখের রেখা জরিপ করল, তারপর বলল, আমি কাল ফিরেছি। আজ সকালে একবার সুমিতাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। গৌরীর বাড়িতে ফোন করে ছিলাম। সে নেই। তাই নিরুপায় হয়ে সুমিতাদের বাড়ি গেলাম।

প্রিয়ব্রত একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুখে কৌতূহলের আঁচড় ফুটে উঠল।

সেখানে গিয়ে আরো বিপদে পড়লাম।

কেন ?

সুমিতার দাদা মনীশবাবু ছিলেন। তিনি তো একেবারে অগ্নিশর্মা। বললেন, প্রিয় আমার সঙ্গে একসময় পড়ত মশাই। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিল, কিন্তু ও যে ইতিমধ্যে এত বড় স্কাউণ্ড্রেল হয়ে উঠেছে, তা ধারণাও করতে পারিনি। আমার বোনকে পড়াত। তাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল।

কিন্তু আমাদের তো নৈকষ্য কুলীন ছাড়া কাজ হয় না, তাই সাফ না বলে দিয়েছিলাম। দুর্ঘটনার দিন বিকালে মা'র কাছে শুনলাম, এ বাড়িতে এসেছিল। তলায় তলায় রাসকেলটা যে এই সব গুপ্তলীলা করে বেড়াচ্ছিল, সেটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি।

সুমিতার সঙ্গে দেখা হল নাকি? কথাটা প্রিয়ব্রত বলতে চায়নি, আচমকা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিতার সঙ্গে? না। আমাকে মনীশবাবু পত্রপাঠ দরজা থেকেই বিদায় করে দিলেন।

এখানে যে আছি জানতে পারলে কোথা থেকে?

অনেক ভেবে চিন্তে সুমিতাদের বাড়ি থেকে আপনার আস্তানায় চলে গেলাম। সেখানে পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনিই এই হাসপাতালের কথাটা বললেন। ভদ্রলোকও মেয়েকে নিয়ে খুব বিব্রত রয়েছেন, তাই আসতে পারছেন না।

দু'চোখের সামনে অস্বচ্ছ একটা যবনিকা। ধীরে ধীরে বাইরের সব আলোটুকু যেন নিঃশেষে মুছে নিচ্ছে। হঠাৎ প্রিয়ব্রতর নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল।

চিত্ত, এই বালিশটা একটু ঠিক করে দাও তো। পিঠটা কন কন করছে। একটু শুয়ে পড়ি।

চিত্ত ক্ষিপ্রহাতে বালিশটা ঠিক করে প্রিয়ব্রতকে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। পিঠটা নয়, বুকটা অসহ্য যন্ত্রণায় টনটন করে উঠছে। এ দুর্ঘটনা শুধু তার দেহকেই চুরমার করেনি, তার মনকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তার সামাজিক মর্যাদাকে করেছে ধূলিসাৎ।

এই সংবাদ-পত্র শুধু চিত্তর হাতেই পড়েনি, মফঃস্বলের আর এক প্রান্তেও গেছে নিশ্চয়। কাগজ পড়ার অভ্যাস বা বিলাসিতা মা'র হয়তো নেই, কিন্তু এ খবর তার ভাই দেবব্রতর চোখে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়।

তিল তিল করে গড়ে তোলা মা'র সমস্ত বিশ্বাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মুখোস খুলে যাবে প্রিয়ব্রতর। সুপর্ণাদেবীর আসল পরিচয় মা কিংবা কেউ জানবে না, জানা সম্ভব নয়, তারা সাধারণ ভাবেই সব কিছুর অর্থগ্রহণ করবে।

লেখাপড়া শিখেছে, যশের মালা প্রিয়ব্রত গলায় পরেছে, একটু একটু করে উন্নতির সোপানেও উঠেছে, কিন্তু সবটুকুই কৃতিত্বের কাহিনী নয়। এই পূর্ণিমার জ্যোতির পিছনে অমাবস্যার কালিমা রয়েছে।

ভালবেসে ভিনজাতের ছেলের হাত ধরে নীলা বাড়ি ছেড়েছে। এ ক্ষত এখনও মুছে যায়নি। দেবব্রত কৃতী নয়, এই একটি ছেলের দিকেই মা অনিমেষ-নেত্রে চেয়েছিল। বংশের ঐতিহ্য, নিজেদের সুখশান্তি সব কিছু রক্ষার ভার প্রিয়ব্রতর ওপর। কিন্তু সে ছেলেরও যদি এই রকম মারাত্মক অবনতি হয়, তবে মা আর কিসের আশায় জীবনধারণ করবে?

আপনার বাড়ির লোকেরা খবর পায়নি বোধ হয় প্রিয়দা? প্রিয়ব্রতর মনের কথাটাই যেন চিত্তর প্রশ্নে রূপ নিল।

আমার কাছ থেকে তো পায়নি, তবে খবরের কাগজ মারফৎ পেয়েছে কি না জানি না। তুমি খবরের কাগজে যে রংদার সংবাদের কথা শোনালে, সেটা পাঠ করে কোন মা'রই পুত্রগর্বে উল্লসিত হয়ে ওঠার কথা নয়।

চিত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বলল, সেটা আপনার মাকে বোঝালেই বুঝবেন।

চিত্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই কেবিনের বাইরে ঠক ঠক শব্দ।

হয়তো কোন কারণ নেই, কিন্তু শব্দের তালে তালে প্রিয়ব্রতর হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল। বলা যায় না, কোন এক অছিলায় বাড়ি থেকে সুমিতা বেরিয়েও আসতে পারে। তার বাড়িতে শাসনের

রজ্জু অবশ্য ঢিলে নয়, কিন্তু তা বলে সুমিতা অসূর্যম্পশ্যাও নয়। কোন সহপাঠিনীর বাড়ি যাবার ছুতোয় অনায়াসেই সে এখানে চলে আসতে পারে।

প্রধান কথা, যদি তার মনের সায় থাকে। সুপর্ণা কে, সেটা তার অজানা নয়। সুপর্ণার সঙ্গে এক মোটরে প্রিয়ব্রতর থাকাটাও এমন কিছু গর্হিত কাজ নয়। অবশ্য, আগে কয়েকবার গৌরী তার মোটরে প্রিয়ব্রতকে তুলতে চেয়েছিল, প্রিয়ব্রত রাজী হয়নি পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।

এই প্রথম তার পাশে গিয়ে বসল। বিধাতা বুঝি এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বজ্র হানলেন।

চিত্ত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আপ্যায়নের ভঙ্গীতে কাকে কেবিনের মধ্যে ডেকে আনল।

প্রিয়ব্রত নিরাশ হল। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চোখের দুয়ারে এনে যার জন্যে স্তব্ধ প্রতীক্ষা করছিল, সে নয়, ভিতরে ঢুকল প্রবীর রায়। গৌরীর ভাই।

কি খবর, কেমন আছেন প্রিয়ব্রতবাবু? এ সব কেবিনের ব্যবস্থা আমিই করেছি, তারপর গৌরীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আপনাকে দেখতে আসিনি, কারণ দেখতে আসার মতন অবস্থা ছিল না। নার্সও ঢোকবার অনুমতি দেয়নি। তারপর নিজের কাজে ক'দিন দিল্লী বম্বে করে বেড়াতে হল। একটানা কথা বলে প্রবীর রায় থামল।

তার সব কথাগুলো হয়তো প্রিয়ব্রতর কানে যায়নি, কিন্তু একটা কথা নির্মমভাবে মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এতক্ষণ, এতদিন, এ কথাটা প্রিয়ব্রতর মনেই হয়নি। এই কেবিনের সমস্ত খরচ প্রবীর রায় দিয়েছে। সম্ভবত তার ভগ্নীর হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেলে প্রিয়ব্রতর প্রথম কর্তব্য

চিন্তার মত সংক্রামক ব্যাধি আর নেই। এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা গড়ে ওঠে। তারপর গোটা মানুষটাই এক সময় ভাবনার জালে বন্দী হয়ে পড়ে। নিষ্কৃতি পাওয়ার, নিজেকে মুক্ত করার কোন উপায় থাকে না।

স্ফুলিঙ্গের মতন আর একটা চিন্তার কথা মনের মধ্যে ঝলসে উঠল।

নীলা আর তরুণ সব বাধা, প্রতিবন্ধক পার হয়ে সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই শহরেরই একপ্রান্তে বাসা বেঁধেছে। প্রিয়ব্রত আর সুপর্ণাদেবীর খবরটা তাদের চোখে পড়াও বিচিত্র নয়। চোখে পড়লে প্রিয়ব্রত সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা হবে অনুমান করতে প্রিয়ব্রতর একটুও কষ্ট হল না।

লজ্জা নীলারই বেশী। যে দাদা এক সময়ে তার গর্বের বস্তু ছিল, নিজের স্বামীকে যার সম্বন্ধে বলে সে কূল পেত না, তারই অপকীর্তি ঢাকবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। অথচ সব জিনিসটা বুঝিয়ে বলার সুযোগ যদি প্রিয়ব্রত পেত।

দূরে কোথায় গীর্জার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। গম্ভীর, উদাত্ত ধ্বনি। কেবিনে কেবিনে বাতি জ্বলে উঠেছে। জানলার কাঁচে সূর্যাস্তের বর্ণ বৈচিত্র আর নেই। জানলার বাইরে গোধূলির ম্লান ছায়া।

একটা হাত দিয়ে চোখদুটো আড়াল করে প্রিয়ব্রত চুপচাপ শুয়ে রইল।

অনেকদিন আগে কলেজে পড়া ইংরাজী কবি রবার্ট ব্রিজেস-এর কথা মনে পড়ে গেল। এন্. কে. বি-র ভরাট কণ্ঠ। সারা ক্লাশ নিশ্চুপ, গ্রহণ করার ভঙ্গীতে ঈষৎ অবনত।

The most distinguishing qualities of his verse are sober, sincerity and a scrupulus simplicity. He is somewhat cool, his colours are never strong, though they are always natural, and his music is rather faint.

The charm of Bridges, a nature poet, lies in his love of quiet effects, pale colours, small soft sounds, all the dreaminess and all the gentleness of still, beautiful days.

ব্রিজের কয়েকটি লাইন প্রিয়ব্রত বিড়বিড় করে পড়তে লাগল।

'I love all beautious things,
I seek and adore them
God hath no better praise
And man in his hasty days
Is honoured for them.'

ব্রিজেস্ প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী কবি নয়। তাকে নিয়ে কোনদিন তেমন মাতামাতিও হয়নি। বায়রণ, শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা অনেক আধুনিক কবি। তার মৃত্যু হয়েছিল, প্রিয়ব্রত ভাবতে শুরু করল, বোধ হয় উনিশ শো ত্রিশ সালে। আধুনিক কবি, তাই পরবর্তী যুগের যন্ত্রণার সঙ্গে সমধিক পরিচিত।

বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ এক কবিকে বুঝি মনে পড়ে। প্রিয়ব্রতর নিস্তরঙ্গ, বর্ণহীন, উত্তাপহীন জীবনে তাই ব্রিজেসকে মনে পড়ে গেল। নিষ্প্রভ বর্ণের কবি, যার কবিতায় সঙ্গীতের ক্ষীণ, অস্পষ্ট রেশ।

নার্স ভিতরে ঢুকতে প্রিয়ব্রত ডাকল।

কি বলুন? নার্স যন্ত্রের মতন কাছে এসে দাঁড়াল।

এ কেবিনের কত খরচ বলতে পারেন?

রোজ আট টাকা।

প্রিয়ব্রত মনে মনে একটা হিসাব করল। শ' খানেক টাকার মতন। এই টাকাটা প্রবীর রায়কে ফেরত দিতে হবে। এক শো টাকা প্রিয়ব্রতর পক্ষে কম নয়, কিন্তু এটা প্রায় তার জীবনের দাম। এই টাকা ব্যয় করে পরমায়ু ফিরে পেয়েছে।

ছাড়া পাবার দিন এল গৌরী রায়। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে, তার দেহে সে দুর্ঘটনার অবশ্য কোন ছাপ পড়েনি। মনেও বোধহয় নয়। সে ঠিক আগের মতনই চটুল, মুখরা আর লাস্যময়ী।

একলা নয়, সঙ্গে আর একটি সুবেশ অল্পবয়সী তরুণ।

গৌরী ঢুকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এই তো বেশ সেরে উঠেছেন স্যার। আপনার অবস্থা দেখে আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। শেষকালে গুরু হত্যার দায়ে না পড়ি।

আজও গৌরীর কথাবার্তা প্রিয়ব্রতর কানে খুব যুক্তিসহ, স্বাভাবিক বলে মনে হল না, সেদিনের মতন আজও নেশা করেছে কি না কে জানে!

প্রিয়ব্রত চোখ ফিরিয়ে সঙ্গের তরুণটিকে দেখল।

প্রিয়ব্রতর দৃষ্টি অনুসরণ করে গৌরী বলল, এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দিই স্যার। কুণাল সেন। সহ-পরিচালক। আমি যে বইটাতে রয়েছি, 'ওগো নিশীথিনী,' সেই বইতে পরিচালককে সাহায্য করছেন। শীঘ্রই স্বাধীনভাবে একটা ছবি পরিচালনার কাজে হাত দেবেন।

কুণাল দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গীতে যোড় করে বলল, আসুন না একদিন শুটিং দেখতে।

প্রিয়ব্রত প্রতিনমস্কার করে হাসল। তার কথার কোন উত্তর দিল না। গৌরীর দিকে ফিরে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে গৌরী।

দেহে হিল্লোল তুলে গৌরী বিছানার ওপর এসে বলল, বলুন স্যার।

আমি শুনলাম, আমার হাসপাতালে থাকার সমস্ত খরচ তোমার ভাই মিষ্টার রায় দিয়েছেন। টাকাটা কত জেনে আমি শোধ করে দেব।

গৌরী হেসে বিছানার ওপর প্রায় লুটিয়ে পড়ল। বলল,

আপনার কি ধারণা দাদা নিজের পকেট থেকে টাকাটা দিয়েছে? মোটেই না। গাড়ি ইনসিওর করা ছিল। সব খরচ ইনসিওরেন্স কোম্পানি দিয়েছে। আপনার, আমার, এমন কি গাড়ি মেরামতের সব টাকা।

প্রিয়ব্রত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। টাকাটা হয়তো খুব বেশী নয়, কিন্তু একবারে দিতে তার রীতিমত কষ্টই হত। কাউকে বঞ্চিত করতে হত। হয় নিজেকে কিংবা মা ভাইকে। এ এক রকম ভালই হল। ঋণশোধের প্রশ্ন আর উঠবে না।

আপনি তো আজই চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

সুমিতা আসেনি একদিনও?

না, বোধ হয় খবর পায়নি।

কিন্তু দু'একটা খবরের কাগজে ফলাও করে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল তো।

সবাইয়ের চোখে হয়তো পড়েনি। যাক্ যত কম লোকের চোখে পড়েছে, ততই মঙ্গল।

কেন স্যার?

সংবাদটা খুব শ্রুতিমধুরভাবে পরিবেশিত হয় নি।

গৌরী আড়চোখে একবার কুণালের দিকে চাইল, তারপর আবার হেসে উঠল। বলল, বুঝতে পেরেছি স্যার। আমার নামের সঙ্গে আপনার নামটা জড়িয়ে যাওয়ায় আপনার জাত গিয়েছে।

জাত গিয়েছে?

প্রায় সেই রকম। নীতিবাদী অধ্যাপকদের জাতটা খুব ঠুন্‌কো। চট করে চলে যায়। কে জানে, সেই অভিমানেই হয়তো সুমিতা আসেনি। অবশ্য সুপর্ণাদেবী আর গৌরী যে অভিন্ন সেটা তার না জানার কথা নয়। তবে, জানেন তো মেয়েদের মন।

গৌরী চিরদিনের প্রগলভা। ক্লাশেও প্রিয়ব্রত তাকে এড়িয়ে

যেত। ক্লাশের বাইরেও। মাত্রাজ্ঞানের বালাই নেই। অধ্যাপক বলে তাকে বিশেষ সমীহ করত, এমন প্রিয়ব্রতর মনে হয়নি।

এবার প্রিয়ব্রত একটু কঠিন হল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, সেদিনের মতন আজও তুমি বুঝি নেশা করে এসেছ ?

নেশা, Oh you mean drunk ? খুব অল্প স্যার। সারাটা দিন চড়া আলোর সামনে কাজ করতে হয় কি না, তাই শরীরটা ঠিক রাখার জন্যে সকালে একটু খেয়ে বের হই।

ঠিক এ ধরণের কথাবার্তা বোধ হয় কুণালের খুব ভাল লাগল না। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, এবার আমাদের উঠতে হয় সুপর্ণাদেবী। দশটার মধ্যে ষ্টুডিয়ো পৌঁছবার কথা।

গৌরী তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, চলুন, যাওয়া যাক। চলি স্যার।

যাবার মুখে প্রিয়ব্রতর দিকে দুটো হাত তুলে নমস্কার করল।

বাসার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতেই প্রথমে মুখোমুখি দেখা হল পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে।

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে কোথায় ছুটছিলেন, প্রিয়ব্রতকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

এই যে এসে গেছেন। খুব ফাঁড়া কাটল মশাই। ভাল করে শনির পূজো দিন। আমি দুদিন গিয়েছিলাম, আপনার তখন বেহুঁশ অবস্থা। তারপর রত্নাকে নিয়ে ভারি বিব্রত রয়েছি।

এগোতে এগোতে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল। কি হয়েছে রত্নার?

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। ভাবছি ক'দিন নিজের কাছে এনে রাখব।

হ্যাঁ তাই রাখুন।

প্রিয়ব্রত তালা খুলে ঘরে ঢুকল। অনেকদিন পর। বালিশ

বিছানা এলোমেলো হয়ে রয়েছে। বইপত্র ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। একদিকের পাল্লাটা খুলে গেছে। পথের ধূলো এসে ঘরের মধ্যে ঢুকছে।

মেঝের ওপর দুটো পোষ্টকার্ড।

একটা মায়ের হাতের লেখা। আগে নীলা ঠিকানা লিখে দিত। এখন দেয় দেবু। পোষ্টকার্ডটা হাতে করে প্রিয়ব্রত বিছানার ওপর এসে বসল।

অনেকদিন প্রিয়ব্রতর কাছ থেকে একটা চিঠিও না পেয়ে মা অত্যন্ত চিন্তিত রয়েছে। প্রিয়ব্রতর শরীর সম্বন্ধেই মার দুর্ভাবনা। পত্রপাঠ যেন তার কুশল সংবাদ দেয়।

পোষ্টকার্ডটা উল্টে পাল্টে প্রিয়ব্রত দেখল, এটা এসেছে দিন চার পাঁচ আগে। বলা যায় না, উত্তর না পেয়ে মা হয়তো আজ কালের মধ্যে আর একটা চিঠি লিখে বসবে।

এবারে প্রিয়ব্রত বাকি পোষ্টকার্ডটার ওপর নজর দিল।

প্রথম পোষ্টকার্ড টা পড়ে একটু স্বস্তি পেয়েছিল। যাক তাহলে সংবাদপত্রের বিকৃত খবরটা মার চোখে পড়েনি। গ্রামাঞ্চলে সংবাদপত্র গেলেও, অতটা খুঁটিয়ে হয়তো কেউ পড়েনি। পড়লেও বাড়ি বয়ে এসে মাকে শুনিয়ে যাবার উৎসাহ কারও হয়নি।

দ্বিতীয় পোষ্টকার্ডটার কয়েকটা লাইনের ওপর চোখ বুলিয়েই প্রিয়ব্রতর মুখ পাংশু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পোষ্টকার্ডটার তলায় নামের দিকে লক্ষ্য করল।

ইতি মনীশ।

প্রিয়ব্রতর একদা সহপাঠী, শুধু তাই নয়, তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ। অবশ্য যে কথা পোষ্টকার্ডে লিখেছে, এতটা কড়াভাবে হয়তো নয়, কিন্তু মুখের কথায় অনেকবার এ ধরণের ইঙ্গিত দিয়েছে।

তবু এভাবে একেবারে উলঙ্গ একটা পোষ্টকার্ডে মনের কথাই বা জানাতে গেল কেন? হয়তো পোষ্টম্যান পড়েছে। যদি

পোষ্টম্যান পতিতপাবনবাবুর হাতে দিয়ে থাকে তবে তাঁর পক্ষে নিছক কৌতূহল বশতও চোখ বুলানো বিচিত্র নয়।

এইসব কথাগুলো ভদ্রভাবে খামের মধ্যেও তো লেখা যেত। যাতে আর কারো চোখে না পড়ে। আর কেউ কুৎসিত একটা অর্থ করার চেষ্টা না করে।

মাত্র লাইন চারেকের চিঠি। কিন্তু তাতেই যথেষ্ট বিষ।

সুমিতার কাছে যাবার বা তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা যেন প্রিয়ব্রত না করে। তাহলে অপমানিত হবে। ইতিমধ্যে সুমিতার সঙ্গে গোপনে একদিন দেখা করেছিল, সে খবরও মণীশের কানে এসেছে। ভবিষ্যতে প্রিয়ব্রত তেমন কোন সুযোগ যেন না পায় সে বিষয়ে বাড়ির সবাই সচেষ্ট থাকবে।

শেষকালের লাইনটাই সব চেয়ে মারাত্মক।

সুমিতাও তার মন বদলেছে।

এত দ্রুত, এত নিশ্চিন্তভাবে একটা মেয়ের মনের পরিবর্তন হয়? তিল তিল করে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরণ করে, অতি সংগোপনে ভালবাসার নীড় গড়ে ওঠে। অন্তত প্রিয়ব্রত আর সুমিতার তো তাই হয়েছিল। আধুনিক যুগের ঝঞ্ঝাগতি প্রেমের লীলা নয়, পার্কে, রেস্তোঁরায়, সিনেমায় যার অবাধ বন্যা। প্রেমের পাত্রকে কুড়িয়ে নিতে যত সময় লাগে, তাকে কক্ষচ্যুত করতে তার চেয়ে ঢের কম সময় লাগে। যে প্রেম দেহসর্বস্ব, ফেণায় পর্যবসিত, তার ওপর লোভ বা আকাঙ্ক্ষা প্রিয়ব্রতর কোন কালেই ছিল না।

তাই সে সুমিতাকে কোনদিনই সে ভাবে চায়নি।

তাকে যাচাই করেছে, মনের কষ্টিপাথরে ঘসেছে অনেক দিন ধরে, তারপর যখন বুঝেছে এ আকর্ষণে মালিন্য নেই, ক্লেদ নেই, দেহজ কাম নেই, তখনই নিজেকে উন্মোচিত করেছে।

পোষ্টকার্ডটা হাতের মধ্যে দুমড়ে ধরে প্রিয়ব্রত বজ্রাহতের মতন বসে রইল। সে ভুলে গেল এখানকার সংসার উঠিয়ে নিয়ে, এ

বাসা ছেড়ে দিয়ে তাকে মফঃস্বলে নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। কিন্তু সে জীবন শুরু করার সম্বলটুকু এভাবে নিঃশেষিত হবে, তা সে ধারণাও করতে পারে নি।

পরের দিনই প্রিয়ব্রত ডক্টর লাহিড়ীর কাছে গেল। কি একটা মিটিংয়ের ব্যাপারে ডক্টর লাহিড়ী ব্যস্ত ছিলেন, প্রিয়ব্রত অপেক্ষা করল।

লাহিড়ী ফিরে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে বললেন, কি খবর ? নতুন চাকরীতে কবে জয়েন করছ ?

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করে বলল, সামনের মাসের দশ তারিখে। আমি চিঠিও লিখে দিয়েছি।

ঠিক আছে, I wish you best of luck.

Thank you sir. এর মধ্যে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে।

চুরুট ধরাতে গিয়েও লাহিড়ী থেমে গেলেন হঠাৎ। বললেন, কি ব্যাপার ? কি হল আবার ?

আমি একটা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিলাম।

সামনের খালি চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে লাহিড়ী বললেন, বস, বস। কি বল তো ? Hope it is nothing very serious ?

একটা মোটর অ্যাকসিডেণ্ট স্যার। তেরদিন হাসপাতালে কাটিয়ে কাল বাড়ি ফিরেছি।

না, তুমি একেবারে unadulerated philospher. আজকাল-কার দিনে এমন তালকানা হয়ে মানুষ চলে পথে।

আমিও একটা মোটরে ছিলাম স্যার। আমার এক ছাত্রী ড্রাইভ করছিল।

লাহিড়ীর চোখের দুটো কোণ কুঁচকে গেল। ঠোঁটের দুপাশে চাপা হাসির সংকেত।

তাহলে দুর্ঘটনা দেহ মন দুটোকেই বিধ্বস্ত করেছে বল ? Congratulations.

প্রিয়ব্রত আরক্ত হল, না স্যর, সে সব কিছু নয়। ছাত্রীটি আমাকে lift দিয়েছিল। হঠাৎ একটা বেসামাল লরি এসে পড়ল গাড়ির ওপর। আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়েছিল।

এবার ডক্টর লাহিড়ী গম্ভীর হয়ে গেলেন। সমবেদনার স্বরে বললেন, I am awfully sorry, my boy! যাক, প্রাণে বেঁচে গেছ, এই বড় কথা। তুমি তাহলে জয়েন করে আমাকে একটা চিঠি লিখে জানিও।

ইঙ্গিতটা প্রিয়ব্রত বুঝতে পারল। ডক্টর লাহিড়ী কাজের মানুষ। বসে বসে গল্পে কাটাবার মতন সময়ের তাঁর যথেষ্ট অভাব।

আমি জয়েন করে আপনাকে জানাব স্যার। প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল, তারপর, যা আজকাল কেউ করে না, তাই করল। নীচু হয়ে লাহিড়ীর পায়ের ধূলো নিল।

থাক, থাক, আবার পায়ে হাত দিয়ে কেন? লাহিড়ী বাধা দেবার চেষ্টা করলেন।

দু'একটা বইয়ের দোকানে কিছুটা সময় কাটিয়ে হোটেলে খেয়ে প্রিয়ব্রত যখন ঘরের দরজা খুলছে তখন পিছন থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, ভোর থেকে কোথায় ছিলেন?

প্রিয়ব্রত পিছন ফিরল। সিঁড়ির ওপর রত্না।

আরে, কি খবর? রত্নাদেবী কবে এলে?

কাল রাত্রে। আপনি তখন ঘুমাচ্ছেন।

আগের চেয়ে রত্না একটু যেন কৃশ হয়ে গেছে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। কয়েক মাস সংসার করেই যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে।

প্রিয়ব্রত কিছু বলবার অগেই রত্না কথা বলল, একটি ভদ্রমহিলা আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন।

পলকের জন্যে প্রিয়ব্রতর মনে হল যেন মেরুদণ্ড বেয়ে

তুষার প্রবাহ নেমে গেল। আঙুলের প্রান্তেও তুহিন স্পর্শ। অব্যক্ত একটা বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। বলল, ভদ্রমহিলা? কখন?

একটু আগে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রত্না সিঁড়ি বেয়ে নেমে প্রিয়ব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল। বুকের আঁচল একটু সরে গেছে। শরীর কৃশ হলেও স্তন দুটি যেন আরো পীবর মনে হল। চোখের কোলে কালির রেখা।

রত্না সন্তানবতী হতে চলেছে। সেইজন্যেই বোধহয় পতিতপাবনবাবু মেয়েকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

কেমন দেখতে?

মন্দ নয়। সিঁথেয় সিঁদুরের দাগ। কখন বাড়িতে থাকেন সে কথাও জিজ্ঞাসা করল। কি বলব, আপনি কখন বাড়িতে থাকবেন বলা মুস্কিল।

রত্নার এ কথাগুলো প্রিয়ব্রত খুব মন দিয়ে শুনল না। সীমন্তে সিঁদুরের রেখা। তাহলে তো সুমিতা নয়। বিবাহিতা ভদ্রমহিলা কে এল তার সঙ্গে দেখা করতে?

দরজা খুলে প্রিয়ব্রত ঘরের মধ্যে ঢুকল। পিছন পিছন রত্নাও এসে দাঁড়াল।

আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে?

হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি যাব। সেখানে একটা চাকরি পেয়েছি।

ভাল চাকরি?

আমাদের আর খুব ভাল চাকরি কে দেবে। মাস্টারীর চাকরি। তবে মাইনে একটু ভাল।

কবে যাবেন?

আর দিন দশেক পরে এখানকার বাস ওঠাব। তারপর ভাবছি দেশে গিয়ে মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

আর বৌকে ?

বৌ হলে তাকেও সঙ্গে নেব।

বিয়ে থা করে সংসারী হন। খবরটা পড়ে মনটা এত খারাপ হয়েছিল।

কি খবর ?

উত্তর প্রিয়ব্রতর অজানা নয়, তবু কৌতূহল দমন করতে পারল না।

ওই মোটরের ধাক্কার খবর যা কাগজে বেরিয়েছিল। আমি অবশ্য দেখিনি। আমার কত্তা আমাকে দেখাল।

তোমার কত্তা ?

হ্যাঁ, আপনার নাম নিয়ে দিনরাত ঠাট্টা করত যে। বলত, একতলায় অমন চেহারা পুষে রেখেছ তোমাদের মধ্যে কিছু কি আর ছিল না। কি অসভ্য লোক আপনাকে কি বলব!

নতুন কিছু নয়। রত্নার এ রূপের সঙ্গে প্রিয়ব্রত অল্পবিস্তর পরিচিত। পরিহাস স্থূলমাত্রার, কথাবার্তায় বিশেষ শালীনতার ছাপ থাকে না। কিন্তু সোজাসুজি এ ধরণের কথা বিয়ের আগে বলেছে কি না, প্রিয়ব্রত স্মরণ করতে পারল না।

জামাটা খুলতে খুলতে প্রিয়ব্রত বলল, তারপর ?

আমার কত্তা বলল, এদিক ওদিক চেয়ে রত্না বিছানার এক পাশে বসল, তোমার ইয়ের কাণ্ড দেখ। এক সিনেমার দেবীর সঙ্গে মদ গিলে অ্যাকসিডেন্ট করে বসেছেন। ভাল চেহারা হলে অনেক বিপদ। আমরা ভালোই আছি। কোন অপদেবীর-নজর আমাদের ওপর পড়বে না।

প্রিয়ব্রত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কি একটা বলতে গিয়েই নিজেকে সংবরণ করল। না, এ ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় না। রত্নার সঙ্গে তর্ক করে নিজের সচ্চরিত্রতা প্রমাণ করে কোন লাভ নেই। রত্নার স্বামীদেবতা তার সম্বন্ধে যদি কিছু ভেবেই থাকেন, আত্মদোষ

স্খলনের চেষ্টায়, তাঁর মতের কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে, এ আশা দুরাশা।

প্রিয়ব্রত শুধু বলল, সেইজন্যই এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি রত্না। বাইরে গিয়ে যদি মানুষ হতে পারি।

প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে এ ধরণের উত্তর রত্না আশা করেনি। সে রীতিমত বিস্মিত হল। খবরটা সেও পড়েছে। সত্যি বলতে কি, পড়তে তার মোটেই ভাল লাগেনি। প্রিয়ব্রতকে অনেকদিন ধরে সে চেনে। তাকে এমন চরিত্রের লোক কোনদিনই মনে হয় নি।

সত্যি কথা বলুন তো, রত্না কয়েক পা এগিয়ে এল, কোথায় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। না হলে আপনাকে তো আমি কতদিন ধরে দেখছি।

মানুষের বাইরেটা দেখে আর তাকে কতটা চেনা যায়। কতটুকু।

না, সত্যি বলুন।

রত্না বিপজ্জনক ভাবে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রত্নার কিছুই অসাধ্য নেই। এখনই হয়তো একটা হাত আঁকড়ে ধরবে। তার চেয়ে কথাটা সোজাসুজি ভাবে বলে ফেলাই ভাল।

মোটরে যে ছিল সে আমার এক ছাত্রী। সম্প্রতি ফিল্মে নেমেছে। পথ দিয়ে আসছিলাম, ডেকে গাড়িতে তুলল। তারপর এই বিভ্রাট।

কি সর্বনাশ!

হ্যাঁ, এখন দেখছি ছাত্রী নয়, আমার নিয়তি।

তবে কাগজে নাকি লিখেছে মেয়েটা মদে চুর হয়ে ছিল?

কি জানি, সে রকম কিছু টের পাই নি। টের পাবার আর সময়ই বা পেলাম কোথায়। ওঠার পরই তো ধাক্কার চোটে মগজের ঘিলু ওলোট পালট।

প্রিয়ব্রতর কথার ধরণে রত্না খিলখিল করে হেসে উঠল। প্রায় বে-আব্রু হয়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জানলার ওপার থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে এল, দাদা।

কে?

অপ্রতিভ প্রিয়ব্রত চোখ ফিরিয়েই বিস্মিত হল। নীলা এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু দাঁড়ানো নয়, কৌতূহলী দৃষ্টিতে রত্নাকে নিরীক্ষণ করছে।

কিছু বলা যায় না, প্রিয়ব্রত মনে মনে ভাবল, খবরের কাগজে দুর্ঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণ পড়ে নীলা হয়তো সত্যাসত্য যাচাই করতে এসেছে। অবশ্য একেবারে হতাশ হবে না। নির্জন কক্ষে যুবতী নারীর সঙ্গে রসালাপে মত্ত অবস্থায় দাদাকে স্বচক্ষে দেখতে পেল। যে দাদাকে নীলা দেবতার আসনে বসাত। ভক্তি করত বিগ্রহের চেয়েও বেশী।

আরে নীলা, আয়, আয়, ঘরের ভিতরে আয়। প্রিয়ব্রত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

নীলা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

রত্না, এই আমার বোন নীলা।

রত্নাও এতক্ষণ নীলার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করছিল। তার মুখ চোখের চেহারা দেখে মনে হল নীলাকে হয়তো সে প্রিয়ব্রতর ছাত্রী ভেবেই বসে আছে। যে ছাত্রী প্রিয়ব্রতর সব বিপদের মূল।

প্রিয়ব্রতর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রত্না বলল, আরে, ইনিই তো একটু আগে আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন। আপনাকে এঁর কথাই তো বলেছিলাম।

একটা চেয়ার সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রিয়ব্রত বলল, বস, বস। আমার আস্তানা চিন্‌লি কি করে?

চেয়ারটা পার হয়ে নীলা বিছানার এক প্রান্তে বসল।

বলল, বা রে, বেশ লোক তো তুমি। নিজে হাতে ঠিকানা দিয়ে এলে। আসতে বলে এলে, কিছু মনে নেই?

এবার প্রিয়ব্রতর মনে পড়ল সে নিজেই ঠিকানা দিয়ে এসেছিল। বিকালটা প্রায়ই ব্যস্ত থাকে, তাই বলে এসেছিল ছুটির দিন সকালে আসতে। সারাটা দিন ধরে গল্পগুজব করতে পারবে।

কিন্তু তরুণ কোথায়? তুই একলা এলি?

তোমার ভগ্নিপতি কারখানায় গিয়েছে, উপরি রোজগার করতে। প্রত্যেক রবিবারই আসব ভাবি, আসা আর হয় না। আজ রাগ করে বেরিয়ে পড়লাম। অবশ্য খেয়ে এসেছি, সন্ধ্যাবেলা এসে আমায় নিয়ে যাবে।

নীলা দ্রুততালে অনর্গল কথা বলে গেল আর সস্নেহ দৃষ্টি মেলে প্রিয়ব্রত তার দিকে চেয়ে রইল।

অনেকগুলো বছর নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। নীলা যখন খুব ছোট। দেহটি ফ্রকের ঘেরাটোপে ঢাকা। সেই সময় চৌকাঠের ওপর বসে এমনই দ্রুততালে কথা বলে যেত। নিশ্বাস নেবার জন্যও যেন থামত না। তার শিশুকণ্ঠের অর্ধস্ফুট সেই কাকলী প্রিয়ব্রতর কানে যেন মধুবর্ষণ করত।

আজ নীলা এক সংসারের ঘরণী। বুকে তার অদম্য সাহস। সামাজিক বাধা নিষেধ সব উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে প্রেমাস্পদের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে। প্রিয়ব্রত যা পারে নি, নীলা তা পেরেছে।

নীলা থামতে প্রিয়ব্রত বলল, এর আগে যে আসিসনি, ভালই হয়েছে।

কেন দাদা?

পরশু আমি হাসপাতাল থেকে ফিরেছি।

হাসপাতাল থেকে ? নীলা যেন বিহ্বল হয়ে গেল।

হ্যাঁ, একটা মোটর দুর্ঘটনার বলি হয়েছিলাম। প্রাণে বেঁচে গেছি নেহাৎ কপালের জোরে।

ও মা, সে কি ? নীলার কণ্ঠ থেকে একটা আর্ত-স্বর বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আয়ত দুটি চোখ বেয়ে টপটপ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

প্রিয়ব্রত উঠে গিয়ে নীলার পাশে দাঁড়াল। একটা হাত তার পিঠে বোলাতে বোলাতে বলল, পাগলী বোন আমার। আমি তো সেরে এসেছি। আবার চোখে জল কেন ?

নীলা শাড়ীর প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছে সহজ হওয়ার চেষ্টা করল।

রত্না সরে সরে এতক্ষণ চৌকাঠের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল, এবার সুযোগ পেয়ে বলল, আমি চলি। আপনারা ভাইবোনে আলাপ করুন।

রত্নার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যেতে নীলা প্রশ্ন করল, মেয়েটি কে দাদা ?

আমার বাড়িওয়ালার মেয়ে। রত্না। মাস ছয় সাত হল বিয়ে হয়েছে।

অঃ, নীলা একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তারপর বলল, মাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

তারপর ? প্রিয়ব্রত উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

কাউকে কিছু বলি নি। যখন ভাবলাম উত্তর আর আসবে না, তখন একটা চিঠি এল।

কি লিখেছে মা ?

নীলা হাসল। ম্লান, বিষণ্ণ হাসি। চোখের দীপ্তিও স্তিমিত হয়ে গেল। গাঢ় গলায় বলল, এমন উত্তর না পেলেই ছিল ভাল। আমি মনে করতাম, আমার দেওয়া চিঠি মা পায় নি।

একটু থেমে মাথা নীচু করে নীলা বলল, মা আমাকে আর চিঠি লিখতে বারণ করেছে।

শুধু ওই এক লাইনের চিঠি ?

না, তার সঙ্গে আরও মারাত্মক সব উপদেশ আছে। আমার জন্য না কি বংশের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়েছে। পিতৃপুরুষ নরকস্থ হবে। আমি না কি জীবনে শান্তি পাব না।

প্রিয়ব্রত নীলার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার ভয় হল। আবার হয়তো নীলা কাঁদতে শুরু করবে। উচ্ছ্বসিত আবেগে। তাকে থামানো মুশকিল হবে। কি জানি কান্নার শব্দে ওপর থেকে রত্না আবার নীচে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু নীলা এবার কাঁদল না। এক ফোঁটা জল দেখা গেল না তার দু' চোখে। বরং সেখানে আগুনের দীপ্তি। মনে প্রাণে নীলা বিশ্বাস করে সে যা করেছে তা পাপ নয়। অন্য মানুষদের তপ্ত নিশ্বাসে ন্যায় অন্যায়ে পরিণত হতে পারে না।

প্রিয়ব্রত নীলার পাশে বসল। সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলল, মা মা'র মতন কথাই বলেছে নীলা। তার সংস্কার, তার বিশ্বাস তার পরিবেশ তাকে এর চেয়ে গভীরভাবে ভাবতে শেখায় নি। তার পাপপুণ্যের সংজ্ঞার সঙ্গে এ যুগের ন্যায় অন্যায়ের সেতুবন্ধন সম্ভব নয়। আমি তোকে বলছি নীলা, এমন একদিন আসবে যখন মা তোকে ক্ষমা করতে বাধ্য হবে। এ ছাড়া আর তার পক্ষে উপায় থাকবে না।

নীলা মুখ তুলল। সুগৌর মুখে আনন্দের আভাস, সত্যি বলছ দাদা ?

হ্যাঁ, তুই দেখে নিস।

আমার ওই একটা দুঃখ দাদা। আর কোনদিক থেকে আমি অসুখী নই। বাড়ির লোকটার তুলনা হয় না। পাড়া-পড়শীরাও আমাকে ভালবাসে। তোমার ক্ষমাও পেয়েছি। ছোটদা তো

এ-ব্যাপারে গোড়া থেকে সাহায্য করে এসেছে। প্রায়ই চিঠিপত্র দেয়। কেবল মা-ই মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

উত্তর দিতে গিয়েই প্রিয়ব্রত থেমে গেল। বাইরে তার চোখ পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে রত্না নামছে হাতে একটা ট্রে। তার ওপর দু'কাপ ধূমায়মান চা আর দুটো খাবার বোঝাই রেকাবি।

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে উঠল।

এ কি করছ ? তুমি এসব আনতে গেলে কেন ?

বা, আমার গৃহে অতিথি, তার সৎকার বুঝি বাইরের লোকে করবে ?

তোমার গৃহ ? প্রিয়ব্রত বিস্মিত হওয়ার ভান করল।

আপনি ভাড়া দেন বলে গৃহের স্বত্ব আপনার হয়ে যায় নি, যে কোন ছোকরা উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেই সে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

এবার নীলা হেসে হাত বাড়াল, উকিলের পিছনে পয়সা খরচ করে দাদার দরকার নেই, তার চেয়ে বরং আপনি যা এনেছেন দিন। সত্যিই বড্ড চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল।

নীলার দেখাদেখি প্রিয়ব্রতও চায়ের কাপ টেনে নিল। বলল, রেকাবিটা আর পারব না। ওটা তুই শেষ কর নীলা।

রত্না আর অপেক্ষা করল না। ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ওপরে চলে গেল।

খেতে খেতে নীলা বলল, এবার তুমি মাকে সুখী কর দাদা।

প্রিয়ব্রত বুঝল, তবু জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবে ?

নিজের জাতের মধ্যে একটি টুকটুকে মেয়ে বিয়ে কর। আমি মেয়ের খোঁজ করতাম, কিন্তু মা আমার ওপর যে রকম রেগেছে, আমার পছন্দ করা মেয়েকে একেবারে সরাসরি নাকচ করে দেবে।

প্রিয়ব্রত কি ভাবল। মুখের ওপর সঞ্চরমান দ্বিধার মেঘ।

বোধহয় কথাটা বলবে কি না তাই চিন্তা করল, অবশেষে মন স্থির করে বলল, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে নীলা।

কি কথা?

মাকে বোধ হয় আমিও সুখী করতে পারব না।

নীলা চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠতেই তাড়াতাড়ি হাতের কাপ ডিস টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

চটুল কথা নয়, প্রিয়ব্রত যেন গভীর কিছুর অবতারণা করতে চাচ্ছে।

কেন? তুমি এ কথা বলছ কেন?

আর উপায় নেই। নিক্ষিপ্ত শায়ক আর তূণীরে ফিরে আসে না। বাকিটুকু প্রিয়ব্রতকে বলতেই হল। আমি যাকে বিয়ে করতে চাইছি, তার সঙ্গে মিলনেও সমাজগত বাধা রয়েছে।

দাদা! পরিবেশ ভুলে নীলা চিৎকার করে উঠল।

নিজেকে সংশোধন করার ভঙ্গীতে প্রিয়ব্রত বলল, অবশ্য মেয়েটি অব্রাহ্মণ নয়। তারা কুলীন, আমরা ভঙ্গ।

নীলা যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, স্বস্তির না আক্ষেপের ঠিক বোঝা গেল না। সে হয়তো ভেবেছিল যে অপরাধে নীলা দোষী, প্রিয়ব্রতও সেই অপরাধ করেছে। মেয়েকে মা দু'হাত দিয়ে অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কৃতী, উপার্জনক্ষম ছেলেকেও কি সেইভাবে পারবে সরিয়ে দিতে! একই অপরাধে দুজনের ভিন্ন শাস্তি বিধান অনুচিত। তাই প্রিয়ব্রতর জন্যে নীলাও হয়তো মা'র ক্ষমা পাবে।

মুখে বলল, ও আবার একটা বাধা নাকি? এ বাধা আজকাল কেউ মানে না। তুমি নিশ্চিন্তে বিয়ে করতে পার দাদা। শুধু বিয়ের আগে মেয়েটিকে একবার দেখবার সুযোগ দাও।

কেন?

দেখব তোমার মতন শুকদেবের মন হরণ করল কোন্ রূপসী।

প্রিয়ব্রত নীলার মাথার ওপর একটা চড় তুলল, বিয়ের পরে বড্ড যে ফাজিল হয়ে উঠেছিস? তুই তো বলছিস এ একটা বাধা নয়, কিন্তু মেয়ের মা আর দাদা ভঙ্গ পাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে নারাজ।

তাহলে?

সে কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

তোমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে কর। সঙ্গে সঙ্গে নীলা উত্তর দিল।

সবাই তো আর নীলা নয়। প্রিয়ব্রতও প্রত্যুত্তর দিতে দেরী করল না।

নীলা অনেকক্ষণ লজ্জারুণ মুখ তুলতে পারল না। মনে মনে চিন্তা করল তরুণ ছাড়া অন্য কারও গলায় মালা দেওয়া তার পক্ষে পাপ হতো। মন্দিরের উপাসনায়, কথকতায় উদার হিন্দুধর্মের বাণী প্রচারিত, মা'র পাশে বসে বসে নীলা কতবার শুনেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের ভিতরের চেহারা দেখে মানুষ শিউরে না উঠে পারে না। সংকীর্ণ, কদর্য, ভেদদীর্ণ কুৎসিত আলেখ্য।

কিন্তু আমার যে মুশকিল। প্রিয়ব্রত সখেদে বলল।

কি মুশকিল?

মেয়েকে আটকে রেখেছে। তার বের হওয়াই মুশকিল।

আমার মতন নজরবন্দী বল?

কি জানি, তোর নজরবন্দী অবস্থার সঙ্গে তো আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই।

ও বাবা, মা কেবল চোখে চোখে রাখত। জানলায় দাঁড়াবার পর্যন্ত উপায় ছিল না।

তাহলে পালালি কি করে?

মন্ত্রগুপ্তি জানা ছিল অদৃশ্য হওয়ার। সেটা না হয় তোমার এই মেয়েটাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

প্রিয়ব্রত উত্তর দেবার আগেই রত্না এসে দাঁড়াল।

বাবা, ভাই-বোনে কথা যে ফুরোয় না। তারপর ভিতরে ঢুকে ট্রেটা দু'হাতে তুলে নিল।

নীলা আপত্তি জানাল, এ কি, আপনি আমার এঁটো কাপে হাত দিচ্ছেন কেন?

রত্না হাসল, কেন, আপনি কি অন্য জাত? প্রিয়দা তো আমাদের ব্রাহ্মণ বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর বোন ব্রাহ্মণই হবে আশা করি।

নীলা কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল, দু'টি গালে রক্তের সঞ্চার। লজ্জায়, বেদনায়, না দুঃখে বলা কঠিন।

রত্না এসব লক্ষ্য করল না। ট্রেটা তুলে নিয়ে ওপরে চলে গেল।

তরুণ এল আটটা নাগাদ।

তার আগেই প্রিয়ব্রত একবার বেরিয়ে মোড়ের হোটেলে খবর দিয়ে এসেছিল। কথা হল খেতে খেতে।

জানেন দাদা, আপনি তো রবিবার নিমন্ত্রণ করে এলেন, তারপর থেকে আমার প্রাণান্ত।

প্রাণান্ত? কেন?

আপনার ভগ্নী। প্রতি রবিবার আমাকে খোঁচাতে শুরু করল। আমার আবার রবিবারটা একটু উপরি পাওনার দিন। কাজে বেরিয়ে পড়ি, আর গালাগাল খাই।

এদিকে দাদার কাণ্ড শুনেছ? নীলা বলল।

কি কাণ্ড?

দাদা বিয়ে করতে চাচ্ছে।

বেশ তো, আমি তো আগেই বলেছি মেয়ে দেখে দেব। ক'টা চাই?

ক'টা আবার। সবাই কি আর তোমার মতন নাকি?

দেখলেন দাদা অভিযোগটা। এত করেও কি বদনাম।

খুব ভাল লাগল প্রিয়ব্রতর। আজকালকার সব-জানা বেশি অভিজ্ঞ পুরুষ রমণীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী-স্ত্রীর এ ছেলেখেলার যেন তুলনা নেই। এ দৃশ্য আস্তে আস্তে আমাদের দেশ থেকে অপসৃত হচ্ছে। তার পরিবর্তে আসছে চাপা হাসি আর মাপা কথাবার্তা। আবেগ নেই, উদ্দামতা নেই, নিস্তরঙ্গ, নিস্পৃহ জীবন।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে তরুণ আর নীলা উঠে দাঁড়াল।

প্রিয়ব্রত সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তরুণ কিছুতেই যেতে দিল না। বলল, না, দাদা, সারাটা দিন আপনাকে জ্বালাতন করা হল, আর নয়, বিশ্রাম করুন।

নীলা বলল, আবার কবে আমাদের বাড়ি যাবে বল ?

প্রিয়ব্রত হাসল, ভাবছি কাল একবার দেশে যাব। অনেক দিন মাকে দেখিনি। মাও চিঠি না পেয়ে খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

নীলা হাসতে গিয়েও পারল না। কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল, মাকে গিয়ে ছুটো প্রণাম ক'র দাদা।

ছুটো প্রণাম ? কেন ?

একটা তোমার, একটা আমার। আমার প্রণাম তো আর মা নেবে না।

শুষ্ক, কঠিন, পাষাণহৃদয় শহর থেকে গ্রামে এসে প্রিয়ব্রতর খুব ভাল লাগল। চারদিকে শুধু সবুজের হিল্লোল। পলাশ, দেওদার আর শিরীষের জটলা। মাঝে মাঝে সরীসৃপগতি লালমাটির পথ। কাকচক্ষু দীঘি, কিছু কিছু অবশ্য শৈবাল সমাচ্ছন্ন। পরমায়ু নিয়ে যান্ত্রিক-দানবের ছিনিমিনি খেলার প্রয়াস নেই। মুক্ত, অবারিত মাঠ।

প্রথমেই স্টেশনমাস্টার আলাপ করল। এই যে প্রিয়ব্রতবাবু, বহুদিন পরে এবারে এলেন।

হ্যাঁ, পড়াশোনার চাপে অনেকদিন আসতে পারি নি।

পড়াশোনার চাপ? আপনাদের আবার পড়াশোনার চাপ কিসের? পড়াশোনার জাঁতাকলে তো ছাত্রেরা পিষে মরছে।

আমি নিজেও একটা থিসিসের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম।

থিসিস?

হ্যাঁ, ডি. ফিলের থিসিস।

বা, বা, আপনি তো গ্রামের মুখোজ্জ্বল করেছেন মশাই। ডি. ফিল. হওয়া চালাকি কথা!

আশপাশের দু' একজন যাত্রী পোঁটলা হাতবদল করতে করতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখল।

প্রিয়ব্রত স্টেশনমাস্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, অমন ভাবে চেঁচাবেন না মশাই, লোক হাসবে। কলকাতার রাস্তায় আজকাল ডি. ফিল. কিলবিল করছে।

দূর থেকেই প্রিয়ব্রত দেখতে পেল প্রিয়ব্রতর লেখা পোষ্টকার্ডটা হাতে করে মা দাওয়ায় উদ্বিগ্নচিত্তে বসে আছে।

প্রিয়ব্রতকে দেখে ছুটে বাগানের বেড়া পর্যন্ত এসে দাঁড়াল, ইস্ কি রোগা হয়ে গেছিস প্রিয়? আর তোর হোটেলের ভাত খেয়ে দরকার নেই।

না মা, আর তো হোটেলের ভাত খাব না। নতুন জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।

প্রিয়ব্রত প্রণাম করল। মা প্রিয়ব্রতর মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাতটা রাখল। হেসে বলল, মা'র রান্না আর তোর ভাল লাগবে না প্রিয়। যার রান্না ভাল লাগবে তার যোগাড় করে রেখেছি।

বুঝেও প্রিয়ব্রত না বোঝার ভান করল, কার রান্না ভাল লাগবে মা?

একটি টুকটুকে বৌয়ের। দেখবি, আজ দুপুরেই আসবে।

এবার প্রিয়ব্রত প্রমাদ গণল। এ যেন আসবাবপত্রের ব্যাপার। ক'দিন আগে অর্ডার দেওয়া হয়েছে, দুপুরে ডেলিভারি দেবে।

দুপুরে আসবে কি মা?

কাণ্ড দেখ, ছেলে একেবারে যেন আঁতকে উঠল। আয়, ঘরের মধ্যে ঢোক।

প্রিয়ব্রত মা'র পিছন পিছন ঘরের মধ্যে ঢুকল।

দুপুরের দিকে প্রিয়ব্রতর একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছিল, হঠাৎ কার সতর্ক পায়ের শব্দে চোখ খুলল।

সর্বনাশ, মা'র সেই মনোনীতা পাত্রী বোধহয় একেবারে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছিল, আবার পা টিপে টিপে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দেবু।

দেবব্রত থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দাদাকে দেখল, তারপর ফিরে এসে তক্তপোশের কাছে দাঁড়াল। তুমি জেগে আছ দাদা?

হ্যাঁ, অত্যন্ত সজাগ। সকাল বেলা এসে অবধি তোমার দেখা নেই, কি ব্যাপার? আজ তো শুনলাম কোথায় বিকালে ডিউটি।

দেবব্রত পা গুটিয়ে একেবারে দাদার বিছানার ওপর বসে পড়ল। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, আমরা একটা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি করেছি। তারই মিটিং ছিল।

সমিতির কাজ কি?

নানা ধরণের কাজ। গাঁয়ে একটা পাঠাগার, নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানো, পঙ্কোদ্ধার—

পঙ্কোদ্ধার?

হ্যাঁ, পুকুরের পাঁক দাম এ সব পরিষ্কার করা।

আর মানুষের মনের পাঁক?

দেবব্রত বিপদে পড়ল। মাঝে মাঝে দাদার এই ধরণের কথাগুলো সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

সোজা কথাটা দেবব্রত সোজা ভাবেই বোঝে। পাঁচশো বার ডন বৈঠক দিতে কিংবা মড়া কাঁধে করে পাঁচ মাইল দূরের কাঁকনতলার মাঠে পুড়িয়ে আসতে তার কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তার যত গোলমাল বাধে কথার জট ছাড়াতে।

কথাটা বুঝতে পারলি না?

দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। নেতিবাচক।

গাঁয়ের মানুষগুলো সেই রকম পরনিন্দা-পরচর্চা, কলহ-বিবাদ নিয়েই আছে তো? এক চিলতে জমির জন্যে ভাইয়ের সঙ্গে মামলা, দরকার হলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ?

এইবার দেবব্রত বুঝল। এতক্ষণ পরে। সোৎসাহে বলল, আগের চেয়ে অনেক কম দাদা। এখন লোকের বিষয়-আশয় আর কোথায়? যার একটু বেশী জমি ছিল, কারখানার জন্য চড়া দামে বিক্রী করে দিচ্ছে, তাছাড়া লোকের এখন অবসরও কম, পেটের চিন্তা ঢুকেছে। নিজেদের বাঁচাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, পরের কথা বলবার আর সময় পাচ্ছে না।

দেবব্রত থামল। একসঙ্গে এতগুলো কথা দাদার কাছে অনেকদিন বলে নি। এদিক ওদিক চেয়ে দেবব্রত দাদার আর একটু কাছ ঘেঁসে বসল। আবদারের সুরে বলল, দাদা।

খুব ছেলেবেলায় দাদার কাছ থেকে কাঁচা পেয়ারা কিংবা গুলতি চাইতে হলে দেবব্রত ঠিক এই রকম সুর আনত গলায়।

প্রিয়ব্রত একটা হাত দেবব্রতর পিঠের ওপর রেখে বলল, কি রে?

দেবব্রত হঠাৎ কিছু বলল না। এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখল।

প্রিয়ব্রতর কৌতুহলের সীমা নেই। কি এমন কথা বলবে দেবব্রত, যার জন্যে এত সতর্কতা। কি বলবি, বল?

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, না? খুব ফিস ফিস করে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে দেবব্রত বলল।

কার সঙ্গে?

নীলার।

হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। একদিন আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম, কাল তরুণ আর নীলা আমার বাড়িতে এসেছিল। অনেকক্ষণ ছিল।

দেবব্রতর সারা মুখে রক্তের আভাস জাগল। সে যে অন্তরে অন্তরে খুব খুশি হয়েছে তারই প্রকাশ। একটু হেসে বলল, তরুণকে তোমার কেমন লাগল দাদা?

খুব ভাল। নীলা মোটেই ভুল করে নি।

তাহলে এ ব্যাপারটা তুমি মিটিয়ে দাও না। মাকে একটু বুঝিয়ে বল। মা তোমার কথা নিশ্চয় শুনবে। একটা মাত্র বোন, তাকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখার কোন মানে হয়! বেচারী, আসবার জন্য ছটফট করছে, মাকে চিঠিও দিয়েছে, কিন্তু মা তার চিঠির খুব কড়া উত্তর দিয়েছে।

শেষদিকে দেবব্রতর গলাটা গাঢ় হয়ে এল অবরুদ্ধ আবেগে। চোখের দুটো কোণও যেন চিক চিক করে উঠল।

প্রিয়ব্রত সান্ত্বনা দিল, দেখি, মেজাজ বুঝে মার কাছে কথাটা পাড়ব।

দু' একটা অন্য কথার পর দেবব্রত বেরিয়ে গেল।

প্রিয়ব্রত চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়।

মা'র কাছে শুধু নীলার কথাই নয় তার নিজের কথাও বলতে হবে। নিজের কথাটা তত মারাত্মক নয়। শুধু সূক্ষ্ম একটা বাধা, সে বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে সমাজে ধিক্কার উঠবে না। কিন্তু মা যদি শোনে, মেয়ের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে, তারা তাদের কৌলীন্য ছাড়তে রাজী নয়, তাহলে মা সহজে স্বীকৃত হবে, এমন মনে হয় না।

বিকালে প্রিয়ব্রত দাওয়ায় বসেছিল, বকুল এল।

মা নেপথ্যে রইল, বকুলের হাতে চা আর নারকেল-নাড়ু পাঠিয়ে দিল।

বছর সতের আঠারোর বেশী নয়। রীতিমত গৌরাঙ্গী। আয়তলোচনা। রক্তবিম্বাধরা। সুকেশিনী।

আপনার চা।

কণ্ঠস্বরও ভারি মিষ্ট। বোধ হয় লজ্জাজড়িত বলেই এত সুমিষ্ট ঠেকল।

হাত বাড়িয়ে প্রিয়ব্রত চায়ের কাপ আর রেকাবিটা নিল।

বকুল সরে গেল না। একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

কেউ প্রিয়ব্রতকে বলে দেয়নি, তবু প্রিয়ব্রতর মনে হল এই মেয়েটিই বকুল। মা বোধহয় একেই তার জন্যে মনোনীত করেছে।

প্রিয়ব্রত একটি কথাও বলল না। চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। কথা না বললেও মনের আকাশে পাশাপাশি দুটি ছবি ভেসে উঠল। একটি সুমিতার, অন্যটি বকুলের।

দুটিই যেন শান্ত প্রদীপের ভীরু শিখা। বাইরের সামান্য বাতাসে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু পার্থক্যও আছে। বকুলের মুখে একটা অশিক্ষিত সারল্য, সুমিতার আননে প্রজ্ঞার দীপ্তি।

এর কথাই তোকে বলছিলাম প্রিয়। মেয়েটি রূপে যেমন, গুণেও তেমনি। আমাদের পাল্টাঘর। এবার আর তোর কোন আপত্তি শুনব না।

প্রিয়ব্রত একটি কথাও বলল না। কথা বলে লাভ নেই। মা'র বর্তমান মনের অবস্থায় সব আপত্তি, সব বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কি রে, কিছু বলছিস না যে?

কি বলব?

বকুলকে কেমন দেখতে ?

প্রিয়ব্রত পরিপূর্ণদৃষ্টিতে বকুলের দিকে দেখল। মিনিট কয়েক, তারপর বলল, কেন, বেশ দেখতে তো।

ভাল লেগেছে তোর চোখে ?

হ্যাঁ। প্রিয়ব্রত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘাড় নাড়ল।

বাঁচালি বাবা।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চকিতের জন্য চোখ তুলে বকুল প্রিয়ব্রতর দিকে দেখেই আরক্ত মুখে সেখান থেকে সরে গেল।

তাহলে আমি ওর মাকে কথা দিই। মা একটা পিঁড়ি পেতে প্রিয়ব্রতর কাছাকাছি বসল।

হ্যাঁ মা, আমার তো মনে হয় দেবুর সঙ্গে ভালই মানাবে।

কে যেন হঠাৎ পায়ের তলার মাটিটা টান দিয়ে সরিয়ে নিল। অবলম্বনহীন অবস্থায় অতল গহ্বরে বিদ্যুৎগতিতে একটা মানুষ নেমে যাচ্ছে। নিশ্বাসের প্রচণ্ড কষ্ট।

একটু সামলে নিয়ে মা বলল, দেবুর সঙ্গে ?

হ্যাঁ, মা, দেবুর তো বিয়ে একটা দেওয়া দরকার।

কিন্তু তুমি ? তুমি বিয়ে করবে না।

বলছি, তুমি আগে একটু শান্ত হও।

কি করে শান্ত হব, বল। তোরা আমায় শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিস কোথায় ? মেয়েটা তো একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করল। গাঁয়ের লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। সব হারিয়ে তোর দিকেই চেয়ে রয়েছি প্রিয়।

তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে মা। প্রিয়ব্রতর কণ্ঠস্বর রীতিমত গম্ভীর।

প্রিয়ব্রতর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে মা রীতিমত বিচলিত হল। কি বলবে প্রিয়। কোন্ সর্বনাশের কথা ? হয়তো বিজাতীয় কোন

মেয়েকে ভালবেসেছে। তাকে গোপনে বিয়েও করেছে। মাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেনি, কারণ নীলার ব্যাপার দেখেই বুঝতে পেরেছে এ সব ব্যাপারে তার সহানুভূতি বা সমর্থন কিছুই পাবে না।

কি হল আজকালকার ছেলেমেয়েরা! বিবাহ-বন্ধনের ধর্মের দিক, সাংস্কৃতিক দিকটা আর তারা মানতেই চায় না। মিলন শুধু দেহের সঙ্গে দেহের, মাংসের সংগে মাংসের। একটু চোখে লাগা, মনে মনে তৈরি-করা সাজানো সংলাপ, সাজপোশাকে চটকদার রূপ, ব্যস, কাছে টানতে কোন বাধা নেই, কোন দ্বিধা নেই। সারা জীবনের বন্ধন দু' একটা চটুল মুহূর্তেই ঠিক হয়ে যায়।

কিন্তু আগের নিয়ম অনেক ভাল ছিল, সমাজের পক্ষে অনেক হিতকর। বংশ-পরিচয়, কুলুজি বিচার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ের হিসাব।

আমি বুঝেছি প্রিয়, তোকে আর কিছু বলতে হবে না। এক কাজ কর, তুই জলপাইগুড়িতে নতুন কাজে যোগ দেবার আগে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে। গাঁয়ের এ বাড়ি রাখবারও দরকার নেই। বিক্রী করে দে। টাকাটা আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দিবি।

মা উঠতে গিয়েই বাধা পেল। প্রিয়ব্রত পিছন থেকে আঁচল টেনে ধরেছে। মা?

কাপড় ছাড় প্রিয়। আমায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হবে। নারায়ণের পূজো আছে।

এতদিন পরে এলাম আর তুমি আমার সঙ্গে এমনি করে ঝগড়া করবে মা!

আঁচলটা ছাড়াবার বৃথা চেষ্টায় মা আরো রেগে উঠল, আমি কেন ঝগড়া করব প্রিয়? আমি তো সংসারের দাসী বাঁদী। তোমাদের বাড়ি আগলাচ্ছি তার বদলে দু'মুঠো খেতে দিচ্ছ। তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করার মতন সাহস আমার হবে কি করে?

প্রিয়ব্রত বুঝতে পারল মা সত্য সত্যই অতি মাত্রায় বিরক্ত হয়েছে। মাকে ঠাণ্ডা না করলে গোলযোগ বাড়বে।

মা'র আঁচল ধরে প্রিয়ব্রত মা'র পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

তুমি আমার কথা না শুনে অযথা আমার ওপর চটে যাচ্ছ মা। সব কিছু আগে শোন, তারপর আমার দোষগুণ বিচার করবে।

কি আর শুনব প্রিয়, তোমার বোন যেমন এক বেজাতের ছেলের গলায় মালা দিয়েছে, তুমিও তেমনি এক ভিন্ জাতের মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছ, এই তো বলবে ?

তোমাকে না জানিয়ে আমি বিয়ে করব, ও-কথা তুমি কি করে ভাবতে পারলে মা ? কোনদিন তোমার বিনা অনুমতিতে সামান্য কাজও করিনি, আর জীবনে এত বড় একটা দায়িত্ব নেবার আগে তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করব না ?

প্রিয়ব্রতর এ ধরণের কথায় মা একটু বিব্রত হল। কথাটা সত্যি। অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রিয়ব্রতর তুলনা চলে না। মাতৃসেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা, যে কোন দায়-দায়িত্ব সর্বশক্তি দিয়ে বহন করা, এসব ব্যাপারে প্রিয়ব্রত অসাধারণ।

কি বলবি বল ? মা'র সুর অনেকটা নরম।

আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব বলে ঠিক করে রেখেছি। মেয়েটি আমার ছাত্রী ছিল।

মা'র দুটি ভ্রূতে কুঞ্চনরেখা লক্ষ্য করে প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি বলল, মেয়েটি স্বজাত, মানে ব্রাহ্মণের মেয়ে।

মা'র চোখ মুখের চেহারা অনেক স্বাভাবিক। নিশ্বাস অনেক সরল।

একটা মাত্র অসুবিধা, প্রিয়ব্রত থামল। আড়চোখে মাকে লক্ষ্য করল, তারপর বলল, যার জন্যে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে ইতস্তত করছে—

মা বাধা দিয়ে বলল, তোর মতন ছেলেকে মেয়ে দিতে ইতস্তত করছে?

প্রিয়ব্রত হাসল, পাত্র হিসাবে তোমার ছেলে এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নয় মা। এতদিন বেসরকারী কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক, একেবারে হালে সরকারী চাকরি একটা পেয়েছি বটে, তাতে পাত্রের হাটে মূল্য এমন কিছু বাড়েনি মা।

কেন তোর লেখাপড়া? চার চারটে পাশ দেবার পরে আবার তো কি একটা পাশ দিলি।

এরকম পাশ করা ছেলে পথের দু'পাশে পড়ে আছে মা। তাছাড়া অর্থই এখন কৌলীন্য, বিদ্যা নয়।

মেয়ের অভিভাবকের আপত্তিটা কোথায়? তুমি বড় চাকরি কর না তাই? মেয়েরা বুঝি খুব বড়লোক?

এক সময় হয়তো অবস্থা ভাল ছিল। তবে এখন নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।

তাহলে?

আপত্তির কারণ তারা কুলীন, আমরা ভঙ্গ।

এবার মা বিস্মিত হল।

শহরে আজকাল এসব আবার কেউ মানে নাকি? গাঁয়ের দিকেই তো এসব উঠে যাচ্ছে।

মানে মা, তারা তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে আমার সঙ্গে তাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

কুলীন আর ভঙ্গে কতটুকু তফাত প্রিয়? এর জন্য ভাল ছেলে কেউ হাতছাড়া করে?

তা যদি বললে মা, বামুন আর কায়েতেই বা কি এমন প্রভেদ? বরং একটা অশিক্ষিত স্বল্পবিত্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে উপার্জনশীল, স্বাস্থ্যবান একটা কায়স্থ যুবক অনেক গুণে শ্রেয়। অন্য সব প্রদেশে যখন 'আমরা ভারতবাসী' এই মন্ত্র সবাই জপ করছে, বড় বাধা, বড়

বিভেদ ভুলে যাবার চেষ্টা করছে, তখন আমাদের দেশেই আমরা খুঁটে খুঁটে জাতিভেদের কঙ্কালটাকে টেনে বের করছি।

মা চুপ করে রইল, কিন্তু অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে প্রিয়ব্রতর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। কি বলতে চায় প্রিয়ব্রত? এসব কি তার মনের কথা? কই, এতদিন তো এসব কথার আভাসটুকুও মাকে জানায়নি।

প্রিয়ব্রত একটু দম নিল। হয়তো এ কথা, এত কথা সে বলতে চায়নি, কিন্তু একবার বলতে আরম্ভ করে নিজেকে সংযত করতে পারল না।

তোমায় একটা দরকারী কথা বলি মা, মন দিয়ে শোন।

মা কোন উত্তর দিল না। শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে রইল।

নীলা খুব সুখে আছে।

কে?

মা'র কণ্ঠস্বর একটা আর্তনাদের মতন শোনাল।

নীলা।

এবার মা কোন কথা বলল না, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল তার মুখ চোখের ওপর একটা কাল আস্তরণ নেমে আসছে। দুটি চোখের দৃষ্টি ম্লান, বেদনার্ত।

এটুকু আমি বলতে পারি মা, তরুণের মতন ছেলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সহজলভ্য নয়।

মা উঠে দাঁড়াল। আমি চলি। সংসারের একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে।

কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

একথা শুনতে আমি আসিনি প্রিয়। একথা শোনার জন্য আমার খুব উৎসাহ নেই।

কিন্তু মা, আমার কথা যে এরই সঙ্গে জড়ানো।

মা'র ছুটো চোখ জ্বলে উঠল। ঠোঁট ছুটো চেপে বলল, তাহলে তোমার কথা শোনারও উৎসাহ আমার নেই প্রিয়। আমি চলি।

তুমি এটুকু বিশ্বাস করতে পারো মা, যা অন্যায় তা আমি কোন দিনই করব না।

এতদিন সে বিশ্বাস আমার ছিল প্রিয়, কিন্তু আর বোধহয় সে বিশ্বাস আমি রাখতে পারব না।

মা আর দাঁড়াল না। একটু জোরে পা চালিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে চলে গেল।

ছু'গালে ছুটো হাত দিয়ে প্রিয়ব্রত চুপচাপ বসে রইল।

এমন সমস্যায় আর সে কোনদিন পড়েছে বলে মনে করতে পারল না। অর্থসঙ্কট বিরাট মুখব্যাদান করে তার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে সঙ্কট প্রিয়ব্রত অপরিসীম পরিশ্রম করে কাটিয়ে উঠেছে। নীলার ব্যাপারে সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল মনে। সে ভেবেছিল ছুর্জনের হাতছানিতে ভুলে মেয়েটা হয়তো কোন নরকের পঙ্কে নিমজ্জিত হবে। নিজে মুখে কালি মাখবে, সেই কালি মাখাবে বংশের মুখেও।

কিন্তু সে বিপদ কেটে গেছে। বিপদ যে কেটে গেছে নিজের চোখে প্রিয়ব্রত তার প্রমাণ পেয়েছে।

এবার সমস্ত অসুবিধা, সব সমস্যার কেন্দ্রমণি সে নিজে। যদি কিছু হয়, তাহলে মা গভীরতম আঘাত পাবে। কারণ মা ছুটি আগ্রহে বাহু মেলে তাকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

প্রিয়ব্রত ঠিক করল রাত্রে খেতে বসে আর একবার চেষ্টা করবে। এখন আর কিছু বলবে না।

চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে পড়ল।

আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। পথ চলতে কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া এখানকার পথঘাট বহু পরিচিত। গ্রাম আর আগের মতন নির্জন নয়, লোকের বাস বেড়েছে। পথ চলাচলও। চারদিকে

কারখানার পত্তন হয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশ উদ্ভাসিত করে আগুনের ফুলকি উঠছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত দেখল।

কৃষি থেকে শিল্প। দেশের নবরূপান্তর শুরু হয়েছে। চাষীরা হাল ছেড়ে, মাঠ ফেলে, হাতুড়ি গাঁইতি তুলে নিয়েছে। যে জমিতে চাষ হতে পারত, সে জমির ওপর বিরাটবপু কারখানা শুরু হয়েছে। এ সব দেশের পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ বলা কঠিন।

হঠাৎ পাশে খস্ করে একটা শব্দ হতেই প্রিয়ব্রত চমকে সরে এল। সাপখোপ নয়তো? এই সরীসৃপটিকে প্রিয়ব্রতর চিরকাল ভয়।

আমি।

গাছের অন্ধকারে লোকটাকে ঠিক বোঝা গেল না।

কে?

আমি দেবু। দেবব্রত এগিয়ে এল।

কি ব্যাপার?

কিছু নয়, কারখানায় যাচ্ছি। দেখলাম তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ।

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না।

দেবব্রত আরো কাছে এসে দাঁড়াল। মা'র সঙ্গে কথা হল দাদা?

প্রিয়ব্রত একটু চমকে উঠল। সব কথা অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেবব্রত কি শুনেছে?

কি কথা? প্রিয়ব্রত প্রতি-প্রশ্ন করল।

নীলার কথা।

প্রিয়ব্রত আশ্বস্ত হল। অন্য কোন কথা জানবার কোন ঔৎসুক্য দেবব্রতর নেই। সে শুধু বোনের কথা জানতে চায়। বোনকে গ্রহণ করতে মা'র সম্মতি আছে কিনা, এইটুকুই।

নীলার কথা মাকে তো বললাম, কিন্তু মা সেই পুরোনো বিধি

আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। বামুন-কায়েতে বিয়ের ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না?

দেবব্রত চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ পা বাড়িয়ে চলতে চলতে বলল, চলি দাদা।

তুই কখন ফিরবি?

ফিরতে সাড়ে দশটা হবে। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কাল তুমি আছ তো?

না, কাল আর থাকা হবে না। সকাল আটটা বারোর গাড়িতে রওনা হব। তুই শুনেছিস বোধ হয় আমি জলপাইগুড়ির কলেজে একটা ভাল চাকরি পেয়েছি?

হ্যাঁ, মা'র কাছে শুনলাম। তুমি এক কাজ কর দাদা।

কি?

মাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। এই অন্ধকূপ থেকে মা'র একটু বেরোনো দরকার। পুরোনো, পচা সংস্কার আঁকড়ে দিনরাত পড়ে আছে। বাইরে বের হলে পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে মন যদি একটু উদার হয়। পৃথিবী কত দ্রুত বদলাচ্ছে তার স্বরূপটা যদি নজরে ঠেকে।

তোর কি হবে?

কি আর হবে! দিব্যি হাত পা খেলিয়ে এখানে থাকব। স্বপাক রান্না, গৃহস্থালীর কাজকর্ম—

প্রিয়ব্রত বাধা দিল, তাহলে মাকে বলি, বকুলের সঙ্গে তোর বিয়েটা দিয়ে মা আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে যাক।

দেবব্রত কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, প্রিয়ব্রতর কথা কানে যেতেই লাফিয়ে আবার পিছিয়ে এল।

সর্বনাশ, এসব আবার তোমার মাথায় কে ঢোকাল? বকুলকে তো মা তোমার জন্য জিইয়ে রেখেছিল তাই জানি। আবার আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

হু'এক মিনিটের একটু দ্বিধা, একটু ইতস্তত ভাব, তারপর প্রিয়ব্রত বলল, হচ্ছে, তার কারণ আমার অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ঠিক এভাবে, এমন অন্তরঙ্গ কথা প্রিয়ব্রত কোনদিন দেবব্রতর সঙ্গে বলেনি। কাজেই কথাটা পরিহাস কি না বুঝতে দেবব্রতর কিছু সময় নিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে প্রিয়ব্রতকে পর্যবেক্ষণ করল, কিন্তু কোথাও পরিহাসের রেখাও দৃষ্টিগোচর হল না।

খুব বড় লোকের ঘরের মেয়ে ?

না ভাই, একেবারে মধ্যবিত্ত। চাঁদের দিকে হাত বাড়াবার লোভ আমার কোনদিনই ছিল না।

নীচু হয়ে দেবব্রত পায়ের ধুলো নিতে গিয়েও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারখানার সাইরেন বাজছে। নৈশ বাতাসকে মথিত করে।

'চলি দাদা, কাল সকালে দেখা হবে। দেবব্রত ছুটতে আরম্ভ করল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ দেখল। পথের বাঁকে, ঝোপের আড়ালে দেবব্রত অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

কিছুটা এগিয়ে ফেরার পথেই বিপত্তি।

এস বাবা, তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

প্রিয়ব্রত রীতিমত বিস্মিত হল। সে যে এ পথে আসবে সেটা তার নিজেরই জানা ছিল না। কাজেই এ পথে তার জন্য কারো অপেক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে না।

সুন্দরী প্রৌঢ়া। বয়স নির্মম হাতে যৌবনের সব লাবণ্যটুকু নিঃশেষে মুছে নিতে পারেনি। এই গোধূলিতে তাই রূপলাবণ্যের অস্তরাগের আভা সর্বাঙ্গে।

আপনি ? প্রিয়ব্রত প্রশ্ন না করে পারল না।

আমি তোমার মায়ের সই। অনেকদিন আমরা এ গাঁ ছাড়া।

কর্তা চাকরি করতেন মীরাটে। সেখানেই সবাই ছিলাম। তারপর কর্তাকে রেখে আবার ফিরে এলাম বাবা। শেষদিকে প্রৌঢ়ার কণ্ঠ আবেগে গাঢ় হয়ে এল।

তবুও পরিচয়টা সহজ হল না। প্রিয়ব্রত কোন দিন একে দেখেছে, সেটা স্মরণ করতে পারল না।

এস বাবা, একটু বসে যাবে।

প্রৌঢ়ার অন্তরঙ্গ আহ্বান উপেক্ষা করাও মুশকিল। তবু প্রিয়ব্রত একবার চেষ্টা করল।

আমার এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। মা একলা রয়েছে।

বলে ফেলেই কথাটার অযৌক্তিকতাটুকুও কানে লাগল। প্রিয়ব্রত কি প্রতিদিন মাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে? মা তো চিরকালই একলা।

প্রৌঢ়াও সেই কথা বলল, আমরা তো চিরকালই একলা বাবা। যা কিছু সঞ্চয় ছিল, কর্তার অসুখে শেষ হয়ে গেল। মাথা গোঁজবার এই আস্তানাটুকু ছিল, তাই রক্ষা। তা না হলে যে কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াতাম ভগবানই জানেন।

প্রিয়ব্রত রাস্তা ছেড়ে বাড়ির উঠানে পা দিল।

একতলা বাড়ি। বে-মেরামতে জরাজীর্ণ, পাঁজর-প্রকট। চারপাশে কিছু জমি আছে। সেখানে শাকসব্জি লাগাবার চেষ্টাও হয়েছে, গৃহস্থের আর্থিক সুরাহাকল্পে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয়নি।

এস, ভিতরে এস। প্রৌঢ়া আবার আহ্বান করল।

প্রিয়ব্রত উঠান পার হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির বাইরের রূপ যতটা হতশ্রী, অন্তরের দৈন্য ততটা নয়। বরং রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেই মনে হল।

একপাশে একটা ম্লানজ্যোতি হ্যারিকেন। মাঝখানে কার্পেটের একটা আসন পাতা। প্রিয়ব্রত আসবে এটা যেন এ বাড়ির লোকদের জানা।

একটু একটু করে প্রিয়ব্রতর মনে পড়ল। এই বাড়িতে আগে মজুমদাররা ভাড়া ছিল। অনেক আগে। তখনই প্রিয়ব্রত শুনেছিল, বাড়িওয়ালা বাইরে কোথায় থাকত, মাঝে মাঝে মজুমদাররা ভাড়ার টাকাটা বাইরে পাঠিয়ে দিত।

তারপর গাঁয়ে এলেও এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াবার অবকাশ প্রিয়ব্রতর ছিল না। কোন মতে একটা রাত কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে যেত।

কই, বস। প্রৌঢ়া পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রিয়ব্রত বসল। প্রৌঢ়া একটু ব্যবধান রেখে কাছেই বসল পা গুটিয়ে।

তোমাকে তো আমি কখনও দেখিনি। আস যাও শুনেছি। আমার সঙ্গে কোনদিন দেখা হয়নি। আজ বকুল তোমায় দেখাল।

বকুল! প্রিয়ব্রত চমকে উঠল।

হ্যাঁ, আমার মেয়ে বকুল। তাকে তো তুমি দেখেছ?

এইবার, এতক্ষণ পরে প্রিয়ব্রত সব বুঝতে পারল। পরিষ্কার ভাবে। আর কোথাও কোন অস্বচ্ছতা নেই, কুয়াশার ক্ষীণ চিহ্নও নয়। ভাবী জামাইকে আপ্যায়ণ করার জন্যই প্রৌঢ়া পথের ধারে অপেক্ষা করছিল।

প্রিয়ব্রত ভাবল, ভালই হল। মাকে যেমন স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তেমনই এ পক্ষকেও সোজাসুজি বুঝিয়ে দেবে। কোনদিক থেকে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। প্রিয়ব্রত সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল।

বল বাবা, কি কথা বলবে, বল।

মা জানে না, আমার এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে? অথচ তোমার মা কিছু জানে না? থেমে থেমে স্খলিতকণ্ঠে প্রৌঢ়া উচ্চারণ করল। কথাটা

যুক্তিবহ নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয় সেটা তার উচ্চারণের ভঙ্গীতেই যেন ধরা পড়ল।

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম, সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে তবে মাকে জানাব। সেই কথা জানাতেই এবার আমি এসেছি।

প্রৌঢ়া শূন্যদৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখল। মা'র চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিল তারই প্রতিচ্ছায়া।

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। চলি আজ।

প্রৌঢ়া ধীর পায়ে প্রিয়ব্রতর দিকে এগিয়ে গেল। প্রিয়ব্রতর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, বকুল লেখাপড়া জানে না বলেই কি তোমার আপত্তি বাবা?

চৌকাঠ পার হবার জন্য প্রিয়ব্রত পা বাড়িয়েছিল, প্রৌঢ়ার কথা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

কি করে করি বাবা। মাকে না জানিয়ে তুমি না কি একটি কাজও কখনও করনি। আর এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে তুমি মাকে একটি কথা বলবে না, সেটা কি করে বিশ্বাস করি বল? কাল দুপুর পর্যন্ত তোমার মা আমাকে বলেছে যে এসব ব্যাপারে তোমার মা'র কথাই নাকি শেষ কথা।

প্রত্যেক মা'ই নিজের ছেলের সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করে থাকে, এটাও তাই বলেই ধরে নিন। আমার মা আমাকে আপনার কাছে যত ভাল করে চিত্রিত করেছে, আমি তার অর্ধেকও নই। আমি আপনার কাছে কখনও কোন কথা দিইনি। মা যদি দিয়ে থাকে, তাহলে মা'র পক্ষ থেকে মার্জনা চাচ্ছি।

প্রিয়ব্রত আর দাঁড়াল না। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেল।

প্রৌঢ়া এবার ভারসাম্য হারাল। বুঝতে পারল, তার এত দিনের লালন করা আশার আজ সমাধি। অন্তরালে খাবারের

থালা হাতে অপেক্ষমানা বকুলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অপমানে প্রৌঢ়ার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল।

কি জানি তোমাদের কথা তোমরাই জানো। তোমার মা'র কথায় নির্ভর করে বকুলের দু' দুটো ভাল সম্বন্ধ আমি ছেড়ে দিয়েছি। শুধু তোমার গুণপনার কথা শুনে, তোমার ফটো দেখে, তোমার বোনের কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটাও আমল দিইনি। আমি সরল মানুষ তোমার মা যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছি। এখন দেখছি ঘোরতর বোকামীই করেছি।

প্রিয়ব্রত গতি দ্রুততর করল। তা না হলে আরো অনেক কথা কানে আসবে।

প্রিয়ব্রত যখন নিজের বাড়িতে ফিরে এল, দেখল মা'র ঠাকুর-ঘরের কাজ শেষ। তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়াও হয়ে গেছে। মা ঠাকুরঘরের সামনে দালানে বসে রামায়ণ পড়ছে। যে ভাবে ঝুঁকে, অসীম মনোযোগের ভান করে মা পড়ে যাচ্ছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে রামায়ণের পাতায় মা'র মন নেই।

বেশ শব্দ করে প্রিয়ব্রত নিজের ঘরে ঢুকল, অথচ মা'র সাড় নেই।

একবার ভাবল, মা'র কাছে বসে পুরোণো কথার জের টানবে, কিন্তু সকাল থেকে একই কথা নিয়ে জাবর কাটতে আর তার ভাল লাগল না। তাছাড়া—

নিজের ঘরে ঢুকে তক্তপোশে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে প্রিয়ব্রত ভাবতে শুরু করল। তাছাড়া, যে মেয়েটির ওপর জোর দিয়ে প্রিয়ব্রত বকুলের সঙ্গে সব সম্বন্ধ নাকচ করে দিচ্ছে, সেই মেয়েটি যে বরমাল্য হাতে কোনদিন তার জীবনের অঙ্গনে আসবে, এমন সম্ভাবনাও যথেষ্ট কম।

কঠিন একটা শাসনের নিগড়ে সুমিতা বাঁধা পড়েছে। সে নিগড় ছিঁড়ে বের হয়ে আসা তার মতন ভীরু মেয়ের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

এ ছাড়াও, অনর্গল প্রিয়ব্রতর বিরুদ্ধে গরল উদ্গীরণ চলেছে। তার মা আর দাদা দুজনে মিলে।

কিন্তু তবুও বকুলকে জীবনের সঙ্গিনী করা প্রিয়ব্রতর পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনে যেমন, তেমনই প্রেমেও সে একনিষ্ঠ। হয় সুমিতা, নয়তো কেউ নয়। বাকি জীবন নিঃসঙ্গ হয়েই কাটাবে।

দেহে মনে তীব্র আঘাত একটা পাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে নতুন একটা জীবিকা, নতুন একটা দায়িত্ব গ্রহণের মুখে।

এটা অবশ্য আশীর্বাদেরই সামিল যে তাকে পুরোণো শহরে, পুরোণো শিক্ষায়তনে থাকতে হয়নি। তাহলে লজ্জায়, অপমানে তার মুখ তোলবার উপায় থাকত না। ছাত্রীমহলে কথাটা তো জানাজানি হয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া, রাজপথে রয়েছে গৌরী রায়। যেতে আসতে কতবার তার মোটরের সামনে পড়তে হতো। বিদ্রূপ, ব্যঙ্গাত্মক চাউনি, শ্লেষমাখানো হাসি।

অসহ্য, অসহ্য।

তার চেয়ে শহর থেকে এ নির্বাসন অনেকগুণে শ্রেয়। কলকাতার ঘটনার জের জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। সেখানে নির্বিবাদে অধ্যাপনা করার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।

চিন্তা করতে করতে প্রিয়ব্রত বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েই পড়েছিল, মা'র ডাকে চমকে উঠে বসল।

কি মা?

রাত হয়েছে, খেয়ে নে। তখনও মা'র কণ্ঠস্বর যথেষ্ট গম্ভীর। তার অর্থ, মনের মেঘ তখনও দূরীভূত হয়নি।

বেরিয়ে আসতে আসতে প্রিয়ব্রত কোণে রাখা নিজের হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল। নটা দশ।

এখনও দেবু তো আসেনি?

তার আসতে অনেক রাত হয়।

অনেক রাত?

হ্যাঁ, সাড়ে দশটা, এগারোটা। তার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। অত রাত অবধি এই বয়সে আমার জেগে থাকা পোষায় না।

মা'র কণ্ঠে অভিমানের সুর।

প্রিয়ব্রত আর কথা বাড়াল না। মা'র পিছন পিছন রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। খেতে খেতে প্রিয়ব্রত একবার শুধু বলল, তুমি খাবে না মা?

আমার একটু কাজ রয়েছে। পরে খাব।

প্রিয়ব্রত বুঝল মা তার সঙ্গে খেতে রাজী নয়। মা'র রাগ যে নরম হয়নি, প্রকারান্তরে সেটাই দেখানো।

প্রিয়ব্রত হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। বিছানায় শুল, কিন্তু দরজায় খিল বন্ধ করল না। বলা যায় না, মা'র রাগ পড়লে, আগের দিনের মতন, প্রিয়ব্রতর শয্যাপার্শ্বে বসে হয়তো সাংসারিক কথা বলবে। মাঝে মাঝে ফেলে-আসা দিনের কথাও। একটা মানুষের রক্তমোক্ষণের ইতিহাস। কি করে শক্ত সমর্থ মেয়ে নীলার ব্যবস্থা করবে, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ।

সেদিন কিন্তু দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও মা এল না। মার জন্য প্রিয়ব্রত বিশেষ চিন্তিত নয়। সে জানে সুমিতাকে এনে কোনরকমে যদি একবার মা'র পায়ের কাছে বসিয়ে দিতে পারে, তাহলে মা বকুলকে হারানোর শোক ভুলতে পারবে। সুমিতা যখন ব্রাহ্মণেতর জাতের নয়, তখন তাকে ক্ষমা করতে মা'র মোটেই দেরী হবে না।

চোখে রোদ এসে পড়তে প্রিয়ব্রত ধড়মড় করে উঠে পড়ল। হাতঘড়ির দিকে দেখল, না, খুব বেলা হয়নি। এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

মুখ হাত ধুয়ে ফিরতেই মা'র সঙ্গে দেখা হল। মায়ের এক হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ, অন্য হাতে খাবারের রেকাবি। মুখে অপ্রসন্নতার মেঘ অনেক লঘু।

মা'র হাত থেকে কাপ আর রেকাবি নিয়ে প্রিয়ব্রত চেয়ারের ওপর বসল। মা সরে গেল না। বঁটি নিয়ে সামনেই বসল।

তুই কি ওখান থেকেই জলপাইগুড়ি চলে যাবি?

উত্তর দেবার আগে প্রিয়ব্রত মাকে একবার জরিপ করল, তারপর বলল, তুমি যা বলবে মা।

আমার পক্ষে ঘর-দোর ফেলে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। তবু তুই যাবার আগে একবার ঘুরে যাস। এ তবু কাছে পিঠে রয়েছিস, দরকার হলেই চলে আসতে পারবি। জলপাইগুড়ি থেকে তো আর তা পারবি না।

না তা' পারব না। ট্রেনের ভাড়াও অনেক, তাছাড়া নতুন চাকরিতে ঘন ঘন ছুটিও পাব না।

মা আর কিছু বলল না। হাতের বেগুন ক'টা শুধু দ্বিগুণ বেগে খণ্ডিত হতে লাগল।

স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে যাবার মুখে প্রিয়ব্রত দেবব্রতর খোঁজ করল।

হ্যাঁ মা, দেবু ওঠেনি?

কেন উঠবে না। কোন্ ভোরবেলা বেরিয়েছে পাড়ায় টহল দিতে।

আমার সঙ্গে সকালে যে দেখা করার কথা ছিল।

সে তাহলে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার কথায় তো কান দেবে না, তুমি যাবার সময় একটু বলে যেও।

কি বলে যাব?

যদি তোমার পক্ষে বকুলকে বিয়ে করা সম্ভব না হয় তো দেবু যেন বিয়ে করতে অরাজী না হয়। আমি সইকে কথা দিয়েছি, তার

মেয়েকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব। এ বয়সে আমার মুখ পুড়লে লজ্জার শেষ থাকবে না।

বেশ মা দেবুকে আমি কথাটা বলে যাব।

প্রণাম করে স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে পড়ল।

বেশী দূর নয়। নন্দীদের নারকেল বাগানটা পার হয়েই থেমে গেল। কে যেন ডাকছে।

শুনুন।

প্রিয়ব্রত এদিক-ওদিক দেখল, তারপরই চোখ পড়ে গেল। একটা আতা ঝোপের পাশে বকুল দাঁড়িয়ে।

প্রিয়ব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ধীর পায়ে এগিয়ে এল।

আপনার কাছে মাফ চাইবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

মাফ? মাফ কিসের জন্য?

মা'র রূঢ় আচরণের জন্য। উত্তরটা যেন বকুলের মুখে তৈরিই ছিল। একটু থেমে আবার বলল, অবশ্য বুকের ওপর সোমত্ত মেয়ে থাকলে বাংলাদেশের সম্পদহীন মা'য়েদের কি অবস্থা হয়, কিছু নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

হঠাৎ প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিতে পারল না। বকুলকে যতটা বুদ্ধিহীনা, অচতুর মনে হয়েছিল, এই কথাবার্তার পরে সংসারের ব্যাপারে ততটা অনভিজ্ঞা বলে মনে হল না।

অবশ্য গরীবের মেয়েরা দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে শক্ত হয়। বেদনা আঘাত দিয়ে দিয়ে তাদের চৌকস করে তোলে।

না, না, আমি কিছু মনে করিনি। এর জন্যে আপনার এতটা পথ আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

বকুল আর কথা বাড়াল না। দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল। বোধহয় যে পথে এসেছিল, সেই পথেই।

সারাটা পথ প্রিয়ব্রত চিন্তিত রইল। বকুলকে নিতান্ত গ্রাম্য

মেয়ে ভেবে মন থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এ ব্যাপারের পর সেটা সম্ভব হবে না। অবসর মুহূর্তে মাঝে মাঝে বকুল উঁকি দেবে, তার কথার টুকরো বাতাসে ভেসে আসবে।

মা'র কথাই ঠিক।

স্টেশনে পা দিয়েই দেবব্রতকে দেখা গেল। হাতে একরাশ পোঁটলা।

সর্বনাশ, মা নিজে প্রিয়ব্রতকে কিছু দিতে সাহস করেনি। ছেলের যা মেজাজ। অন্যবারেও শাক-সব্জি, তরি-তরকারি প্রিয়ব্রত সঙ্গে আনতে চায়নি।

মাকে বুঝিয়েছে, এসব নিয়ে আমি কি করব মা? আমার কি আর বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট আছে? হোটেলে ওসব দিতে গেলে তারা নিতেই চাইবে না। তাছাড়া দুদিন তো তোমার হাতের রান্না খেয়ে গেলাম। শহরের লোক তরি-তরকারিতে অমন স্বাদ কিছুতেই আনতে পারবে না। তার চেয়ে রেখে দাও। যখন আসব তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব।

মা আর আপত্তি করেনি। রাত জেগে বাঁধা পোটলাগুলো সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এবার মা অন্য কায়দা করেছে।

দেবব্রতর সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত প্রথমেই সেই কথাটা পাড়ল। এত সব পোঁটলা পুঁটলি কিসের রে?

অপ্রস্তুত দেবব্রত চোখ তুলে দূরের গাছপালার দিকে দেখল, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে রেললাইনের ওপর রেখে বলল, এতে কিছু আচার আছে।

আচার?

হ্যাঁ তেঁতুলের আচার আছে, কুলের আচার আর লঙ্কার আচার।

ও সব কি হবে? আমি আবার কবে আচারের পক্ষপাতী?

তোমার জন্যে নয়।

তবে?

নীলার জন্যে ! সে তো তোমার কাছে আসে, তখন দিয়ে দিও।

এইবার প্রিয়ব্রত রীতিমত বিস্মিত হল।

নীলার জন্য মা আচার পাঠিয়েছে ?

না, ধীরে ধীরে দেবব্রত ঘাড় নাড়ল, মা দেয়নি। অন্য লোকের নাম করে আমি মার কাছ থেকে ক'দিন আগে নিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে এ সব ছিল, আজ তোমার হাতে দিতে এলাম। তুমি তো জান দাদা নীলা কি রকম আচার ভালবাসত।

প্রিয়ব্রত আপত্তি করতে যাচ্ছিল, যে এতগুলো পোঁটলা তার পক্ষে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর, কিন্তু দেবব্রতর মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারল না।

দেবব্রতর ত্ব'চোখ বেয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে।

দে, আমার হাতে দে। প্রিয়ব্রত একটা হাত প্রসারিত করল।

না, এখন থাক ট্রেন আসুক, একেবারে তোমার কামরায় উঠিয়ে দেব।

আবার সেই পাষাণহৃদয় কলকাতা। সবুজের সম্পর্কহীন রুক্ষ সৌধমালা। উদ্যান নয়, উদ্যানের ছলনা। রত্না নেই, শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। পতিতপাবনবাবু আছেন, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে যাওয়া-আসার মুখে দেখা হয়।

প্রিয়ব্রতকে প্রায়ই বলেন, মশাই, আপনি তো চললেন। আপনার মতন একটা নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে যোগাড় করে দিন না। কোন ঝামেলা নেই। একলা মানুষ শুধু থাকবে আর খাবে হোটেলে।

প্রিয়ব্রত হেসেছে, ঠিক আছে। সন্ধানে আছি। পেলেই আপনাকে জানাব।

সেদিন সকাল থেকেই মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। আর মাঝখানে ক'টাই বা দিন। তারপরই তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদেশে

রওনা হতে হবে। এই রাজধানী আর রাজকুমারী পিছনে পড়ে থাকবে। এই হয়। মধ্যবিত্ত প্রেমের এইটুকুই পরমায়ু।

কিন্তু প্রিয়ব্রত আশা করেছিল সুমিতার প্রেমের উৎস চিরাচরিত পম্বলের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যাবে না। তার প্রেম নক্ষত্রের মতন আকাশচারী হবে, প্রোজ্জলতার বাহক।

তা হল না। মার অশ্রু আর দাদার হুঙ্কারে প্রেমের বন্যা ক্ষীণধারা হয়ে গেল। সব আহ্বান, সব প্রতিশ্রুতি নিঃশেষিত।

হয়তো কোন ফলই হবে না, তবু হৃদয়ের দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে প্রিয়ব্রত দমিত করতে পারল না। একটু বেলা হতে প্রিয়ব্রত সুমিতাদের গলির মধ্যে ঢুকল।

প্রায় পৌনে এগার। অফিসযাত্রীর ভিড় অনেকটা তরল। কিছু ব্যবসায়ীরা দ্রুতপায়ে ট্রাম, বাস ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত। ফেরিওয়ালারা বিচিত্র সুরে গৃহলক্ষ্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

বেড়ানোর ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে প্রিয়ব্রত এগোতে লাগল।

সুমিতাদের বাড়ির সামনে এসেই চমকে উঠল। প্রতিটি জানলা বন্ধ। দেখে মনে হয় এ বাড়িতে বুঝি কোন লোকই থাকে না। সম্ভবত প্রিয়ব্রতর চোখ এড়াবার জন্য সুমিতারা সাময়িক-ভাবে অন্য বাড়িতে চলে গেছে।

প্রিয়ব্রত খুব আশা করেছিল সুমিতার সঙ্গে দেখা হবে। হয় গবাক্ষপথে, নয় তো ছাদে শাড়ি মেলে দেওয়ার সময়। সুমিতাকে এই মুহূর্তে তার বড় প্রয়োজন ছিল।

বারকয়েক ফুটপাথে ঘোরাঘুরি করে প্রিয়ব্রতর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। ডক্টরেট অধ্যাপক, অথচ হাল-চাল কলেজের ছোকরাদের মতন। সুযোগ-সুবিধা বুঝে অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে চোখে-লাগা মেয়ের বাড়ির সামনে যেভাবে ঘোরাফেরা করে, এ তো ঠিক তাই।

কথাটা মনে হতেই প্রিয়ব্রত দ্রুতপায়ে ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ল। সামনেই একটা রিক্সা যাচ্ছিল। হাত নেড়ে তাকে ডেকে প্রিয়ব্রত তার ওপর উঠে পড়ল।

অঙ্গুলি-নির্দেশে যেদিকে চালককে যেতে বলল, সেটা দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত হতে পারে। রিক্সা ছুটল। ঘন্টির তালে তালে।

দুপুরের উত্তপ্ত হাওয়া। শরীর আর মনে অবসাদ জাগায়।

অনেকক্ষণ। প্রিয়ব্রতর মনে হল এক যুগ। আবেশে দুটি চোখ জড়িয়ে এসেছিল, চোখ খুলেই চমকে সোজা হয়ে বসে বলল, ব্যস, রাখো রাখো।

রিক্সাচালক থামল। অপরদিকে কলেজ। যে কলেজে প্রিয়ব্রত একদা অধ্যাপনা করত। রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে প্রিয়ব্রত কলেজের মধ্যে ঢুকল। একবার কমনরুমে ঢুকে সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করে আসবে। ডি. ফিল. পাওয়ার পর একমাত্র চিত্ত ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখাই হয়নি।

টিচার্স রুমে উঁকি দিয়েই হতাশ হল।

কেবল মাত্র দু'জন বসে। তাও একজন জাগ্রত, আর একজন তন্দ্রামগ্ন।

ইতিহাসের অধ্যাপক অনাদিবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি আবাহনের ভঙ্গীতে দুটো হাত প্রসারিত করলেন, আরে, এসো এসো। চিত্তর কাছে সুখবর শুনলাম! খুব ভাল হয়েছে ভায়া। বস কথা আছে।

প্রিয়ব্রত অনাদিবাবুর পাশে গিয়ে বসল।

অনাদিবাবু গলার স্বর একটু খাদে নামিয়ে বললেন, ইউনিভার্সিটিতে তোমার জানাশোনা লোক কে আছে হে?

আমার? আমার জানাশোনা তো কেউ নেই। প্রিয়ব্রত রীতিমত বিস্মিত হল।

আমি কি আর পাঁচকান করব ? আমাদের কথাও একটু বলে যেও, কতদিন আর এ কলেজে মুখ রগড়াব।

প্রিয়ব্রত কথা বাড়াল না। উঠে দাঁড়াল।

যাবার সময় বলল, চিত্তর সঙ্গে দেখা হল না। তার বোধহয় ক্লাশ আছে। আপনার সঙ্গে দেখা হলে একবার আমার বাসায় যেতে বলবেন।

বলব, বলব, দেখা হলেই বলব। যাক ভায়া, তুমি তো নরক থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে।

অনাদিবাবু কথা শেষ করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন।

প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিসপত্র কিনে প্রিয়ব্রত ফিরে এল। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করল না। দরজাটা ভেজিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল।

মাঝখানে আর কয়েকটা দিন। তারপরই যাত্রা শুরু করতে হবে এখানকার বাস উঠিয়ে, এখানকার মন গুটিয়ে নিয়ে।

খুব আশা করেছিল সুমিতা কোন এক ছলছুতোয় তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এ বাসা তার চেনা, কিংবা এ বাসায় আসতে তার অসুবিধা হয়, একটা চিঠি লিখে কোথাও দেখা করতে বলবে।

যতই নজরবন্দী রাখুক, এ যুগের মেয়েকে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে নিশ্চয় রাখবে না। কিংবা রুদ্ধদ্বার কক্ষে দিনের পর দিন নিপীড়িত করবে না। কিছু স্বাধীনতা তার আছেই। ভীরু, দুর্বলচিত্ত সুমিতা সেই স্বাধীনতাটুকুর সদ্ব্যয় করতেও পারল না।

প্রথমে মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রিয়ব্রত কলেজের কাছাকাছি একটা আস্তানা পেতে নেবে তারপর মাকে আহ্বান জানাবে।

মা যে সহজে তার আহ্বানে সাড়া দেবে এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। বিশেষ করে মা'র যে মনের অবস্থা প্রিয়ব্রত দেখে এসেছে।

দেবব্রতকে ছেড়ে মা হয়তো যেতেই চাইবে না। তাছাড়া তার ঠাকুরঘর রয়েছে, নিজের হাতে তৈরী করা সব্জীর বাগান রয়েছে, সবচেয়ে বড় কথা, সইয়ের মেয়ে বকুল রয়েছে যে মার প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করেছিল।

বকুলের কথা মনে হতেই বকুল যেন সামনে এসে দাঁড়াল। নম্রমুখী, অপাপবিদ্ধা তরুণী।

সুমিতা যদি প্রিয়ব্রতর জীবনে না আসত, তাহলে বকুলে তার আপত্তি ছিল না। এই রকম শান্ত মাটির প্রদীপই তার চিরদিনের কাম্য। শুধু কিছু লেখাপড়া। এ যুগে অশিক্ষিতা নারী অন্ধের সমান। বিশ্বের বহু বৈচিত্র থেকে তারা বঞ্চিত।

হঠাৎ বাইরে তুমুল শব্দ হতে প্রিয়ব্রত চমকে জেগে উঠল।

খেয়াল করেনি, আকাশে মেঘের স্তূপ জমে উঠেছিল, সহসা প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে অশনিপাত। প্রিয়ব্রত উঠে জানলা বন্ধ করার আগেই বর্ষণ আরম্ভ করল।

সর্বনাশ। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে প্রিয়ব্রত আকাশের দিকে লক্ষ্য করল। যেভাবে সাজসজ্জা করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, শীঘ্র থামবে এ আশা সুদূর পরাহত।

বর্ষার কবি কে আছে ওদেশে প্রিয়ব্রত স্মরণ করতে পারল না। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে এভাবে ঘনঘটা করে আকুল হয়ে বর্ষা নামে না। সে দেশের বর্ষা কিছুটা বিরক্তিজনক। সারা ঋতু জুড়ে তার অত্যাচার। বর্ষণও বোধহয় এত প্রবল নয়, ঝিরঝির ধারায়। গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে, ইলশেগুঁড়ি।

এদেশে তাই আকাশের আঙিনায় মেঘের আলপনা দেখা গেলেই কবিচিত্ত উতলা হয়। কবি বলে, হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয় নাচে রে।

দরজার ফাঁক দিয়ে জলের ধারা আসতে প্রিয়ব্রতর চেতনা হল।

পতিতপাবন বাবুকে বলতে হবে একটা কাঠের তক্তা লাগিয়ে দেবার কথা।

এ কথার পাশাপাশি আর একটা কথাও প্রিয়ব্রতর মনে পড়ে গেল।

এ বাড়ি ছেড়ে প্রিয়ব্রত বাইরে চলে যাচ্ছে, কাজেই এ বাড়ির মেরামতের ব্যাপারে আর তার কোন আগ্রহ থাকবে না। থাকার কথা নয়।

রাত নটা পর্যন্ত বৃষ্টি একটুও কমল না।

ঘরের মধ্যে বসেই প্রিয়ব্রত অনুভব করতে পারল রাস্তায় রীতিমত জল দাঁড়িয়েছে। হতভাগ্য পথচারীর দল অর্ধসিক্ত অবস্থায় ছপ ছপ করে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছে।

প্রিয়ব্রত ষ্টোভ জ্বালল। চা তৈরি করল। তারপর চা আর পাঁউরুটি সহযোগে রাত্রের আহারপর্ব সমাধা করল।

ব্যস, আর কোন অসুবিধা নেই। পৃথিবী ভেসে যাক, প্রিয়ব্রতর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অর্ধমলিন এই শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা ছাড়া আর তার কোন কাজ নেই।

কিছু সমস্যা প্রিয়ব্রতর আছে, অর্থাভাব, চিন্তার কণ্টক, কিন্তু এসব কোনদিন তার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

প্রিয়ব্রতর নিদ্রাকর্ষণ হতে মোটেই বিলম্ব হল না।

কত রাত প্রিয়ব্রতর খেয়াল নেই, তবে রাত গভীর। বাইরে বৃষ্টিপাত সামান্য কম। মেঘের গর্জন রয়েছে। উদ্দাম বাতাসের বেগ।

ঠক্, ঠক্, ঠক।

প্রিয়ব্রত প্রথমে ভেবেছিল বাতাসে কোথাও কিছু দুলছে। কিন্তু বিছানার ওপর বসে কান পেতে শুনে বুঝতে পারল, না, কে বা কারা দরজায় করাঘাত করছে। সম্ভবত আশ্রয়প্রার্থী কোন পথচারী। আর কে হবে!

টেবিলের ওপর রাখা হাতঘড়িটা প্রিয়ব্রত তুলে নিল। রেডিয়ম ডায়াল। দেখতে কোন অসুবিধা হল না। তিনটে বেজে দশ।

এমন সময় পথচারী আসবে আশ্রয়ের সন্ধানে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হতেই প্রিয়ব্রত লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

আধুনিক নভেলে, সস্তা রোমান্টিক সিনেমায় ঠিক এই ভাবেই তো সব কিছু আবর্তিত হয়। নায়িকা এসে দাঁড়ায় নায়কের বাড়ির দরজায়। এমনই উন্মত্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে।

বাতিটা জ্বেলে প্রিয়ব্রত ক্ষিপ্রহাতে খিল খুলে দিল।

ঝড়ের ঝটকার সঙ্গে একটা মানুষ ভিতরে এসে ঢুকল।

কে?

কোন উত্তর নেই। লোকটি সিক্তবাসে থর থর করে কাঁপছে।

প্রিয়ব্রত চিনতে পারল। চিনতে পেরে বিস্মিত হল সব চেয়ে বেশী।

মনীশ!

হ্যাঁ, সুমি এসেছে তোমার কাছে?

সুমি? আমার কাছে? ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে প্রিয়ব্রতর বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল।

বিকেল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মনীশ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের এদিক ওদিক দেখল। তার স্থির ধারণা, সুমি যদি কোথাও থাকে তো এখানেই থাকবে।

তুমি জামা কাপড় ছেড়ে একটু বস। এই দুর্যোগে কুকুর বেড়াল বাইরে বেরোয় না।

মনীশ মাথা নাড়ল, না, আর বসা চলবে না। এই রাত্রে ট্যাক্সি পথে বের হতে চাইল না, বহু কষ্টে একটা রিক্সা যোগাড় করে

ঘুরছি। সব শেষে তোমার কাছে এসেছিলাম। এবার একবার থানায় রিপোর্ট করে বাড়ি ফিরব। মা ভীষণ চঞ্চল হয়ে রয়েছে।

ভাবতেও প্রিয়ব্রতর আশ্চর্য লাগল, অনুসন্ধান করতে যেখানে সবচেয়ে আগে আসা উচিত ছিল, মনীশ সেখানে এসেছে সবচেয়ে শেষে। খুবই স্বাভাবিক, সুমিতা নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা আর ছেলের প্রিয়ব্রতর আস্তানার কথাই আগে মনে পড়েছে।

কি ব্যাপার বল তো?

সম্পূর্ণ ভেজা হাতেই মনীশ প্রিয়ব্রতর দুটো হাত জড়িয়ে ধরল, সত্যি করে বল প্রিয়, সুমি কোথায় গেছে তুমি জানো না?

ছি, ছি, এ কি কথা বলছ মনীশ? আমাকে এত নীচ তুমি ভাবতে পারলে কি করে? সাধারণভাবেই আমি তোমার বোনের পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম, তোমাদের যখন আপত্তি, তখন ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

মনীশ প্রিয়ব্রতর হাতটা ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে একটু সরে দাঁড়াল।

প্রিয়ব্রতর দিকে সোজাসুজি না চেয়ে বলল, আজ দুপুরবেলা সুমির কাছে নিরূপা বলে একটি মেয়ে এসেছিল। সুমির সঙ্গে নাকি পড়ত। ইদানীং আমরা বাইরের লোকের সঙ্গে সুমির বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ করতে দিচ্ছি না। মেয়েটি মাকে বলল শীগ্গীরই তার বিয়ে হবে আর বিয়ের পর একেবারে পুণায় চলে যাবে, তাই সুমির সঙ্গে একটু দেখা করতে চায়। মা আর কিছু বলেনি। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে, দরজা ভেজানো আছে বটে, কিন্তু দুজনের কেউ নেই। এমন কি সুমিতা যে শাড়িটি পরেছিল, সেটা পরেই বাড়ি ছেড়েছে। গয়নাগাটি বা অন্য কিছুই সঙ্গে নেয়নি। তাইতেই আরো গোলমাল ঠেকছে।

প্রিয়ব্রত ভাবতে আরম্ভ করল। ছাত্রীদের নামগুলো মোটামুটি পরিচিত। নিরূপা বলে তো কাউকে মনে পড়ছে না।

মনীশকেও প্রিয়ব্রত সেই কথাই বলল, নিরূপা বলে কোন মেয়েকে তো মনে পড়ছে না।

কি জানি, আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে। অফিস থেকে ফিরে যত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি খোঁজ করলাম। খোঁজ করাও এক বিপত্তি, নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তারপর বড় বড় হাসপাতালে। ফেরার মুখে তোমার এখানে এসেছি।

আমার এখানেই তো তোমার সব চেয়ে আগে আসা উচিত ছিল মনীশ। তোমাদের চোখে আমিই তো প্রথম নম্বরের আসামী।

মনীশ একটু অপ্রতিভ হল। সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর দিতে পারল না। মাথাটা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, তোমার এখানে আসতে সাহস হয়নি প্রিয়। কি জানি নিজের আওতায় পেয়ে যদি অপমান কর।

প্রিয়ব্রত হাসল, তাহলে একেবারে পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আসাই উচিত ছিল।

মনীশ কোন উত্তর দিল না। বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল।

একটু পরেই প্রিয়ব্রতর কানে রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ এল। মনীশ ফিরে চলেছে। এখান থেকে থানায় যাবে। অবশ্য বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি নিজের তরুণী বোনের উধাও হবার খবর এত তাড়াতাড়ি পুলিশের কর্ণগোচর করায় না। তাতে অনেক হাঙ্গামা, বহু ঝঞ্ঝাট।

কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

দরজা খোলা। ঝড়ের ঝাপটায় বৃষ্টির জল ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে। বিছানা বেশ কিছুটা ভিজে গেছে। প্রিয়ব্রতর খেয়াল নেই। এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করবে সে বোধও নেই।

চুপচাপ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জটিল চিন্তায় মগ্ন।

কে এই নিরূপা ? কাকে অবলম্বন করে সুমিতা এভাবে বাড়ি ছাড়ল ? সুমিতার মতন প্রকৃতির মেয়ের পক্ষে এটা অকল্পনীয়, কিন্তু যা কল্পনা করা যায় না, এমন ব্যাপারও তো হয়। বিশেষ করে প্রেমের স্পর্শে সব কিছু নতুন রূপ পায়। কোমল কঠিনে পরিণত হয়, জলধারা রূপান্তরিত হয় লেলিহান অগ্নিশিখায়।

দরজা অবারিত থাক। প্রিয়ব্রত শয্যা গ্রহণ করতে পারবে না। কি জানি তন্দ্রার ঘোরে যদি সুমিতার আহ্বান শুনতে না পায়। দ্বারে ভীরু করাঘাত করে করে যদি ফিরে যায় সুমিতা। নিজেকে নিবেদন করতে এসে হতাশ হয়।

পরের দিন পতিতপাবনবাবুর চিৎকারে প্রিয়ব্রতর ঘুম ভেঙে গেল।

কি ব্যাপার মশাই, এ দুর্যোগে দরজা খুলে শুয়েছেন ? ঘরের মধ্যে যে জল থই থই করছে।

চোখ মুছে প্রিয়ব্রত বিছানার ওপর উঠে বসল। একটু একটু করে স্মরণ করার চেষ্টা করল দরজা খোলা থাকার ইতিহাস।

কি মশাই সারা রাত দরজা বন্ধ করেননি ?

পতিতপাবনবাবু দুর্যোগের পর বাড়ির চারদিক তদারক করতে বেরিয়েছেন। গত রাত্রের ঝড়ের তাণ্ডবে বেশ কিছু লোকসান হয়েছে।

কি জানি ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। দরজাটা বোধহয় ভেজিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছিলাম, হাওয়ায় খুলে গেছে।

জানলার ফ্রেমে পতিতপাবনবাবুকে দেখা গেল। মাথায় পাগড়ির আকারে গামছা। গায়ে গেঞ্জি, পরণে আধময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর। মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়।

না বিয়ে-থা একটা করুন মশাই। এই ঝড়বৃষ্টির রাত দরজা ভেজিয়ে ঘুমাচ্ছেন। আর আপনার ঘুমকেও বলিহারি। বিছানা

তো অর্ধেক ভিজে সপ সপ করছে, তার ওপর শুয়ে দিব্যি ঘুমাচ্ছেন।

পতিতপাবনবাবু সরে গেলেন।

প্রিয়ব্রত বিছানা থেকে নেমে কোণে রাখা ঝাঁটাটা হাতে নিয়ে জল পরিষ্কার করতে লাগল। ভোরের দিকে সম্ভবত তন্দ্রা এসে থাকবে, কিন্তু দরজা তো খোলা ছিল। সুমিতা নিশ্চয় অভিমানে ফিরে যায়নি।

সকাল বেলায়ই বৃষ্টি প্রায় থেমে গিয়েছিল, দুপুরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

স্নান সেরে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে পড়ল। খাওয়া সেরে সোজা নীলার বাড়িতে চলে যাবে। সারাটা দিন কাটিয়ে রাতের দিকে বাড়ি ফিরবে।

দেশ থেকে ফিরে একবার আচারের হাঁড়িগুলো দিতে গিয়েছিল। কি ভাবে দেবব্রত সেগুলো সংগ্রহ করেছে সে কথাও বলেছিল। নীলা আচারের শিশিগুলো জড়িয়ে ধরে হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। প্রিয়ব্রত বহু কষ্টে বোনকে থামিয়েছিল।

তবু মাঝে মাঝে দেখাশোনা হয়। জলপাইগুড়ি চলে গেলে সব কিছুই চিঠি-নির্ভর। আবার কতদিন পরে চাক্ষুষ দেখা হবে, কে জানে।

খাওয়া সেরে প্রিয়ব্রত মোড়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ পিছনে মোটরের শব্দ। শব্দটা কিন্তু পরিচিত।

পিছন ফিরে দেখেই প্রিয়ব্রত ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

সারা মুখে চড়া রং, চোখে রৌদ্রতাপহারী গগল্‌স, মুখে বাঁকা হাসি। চালনচক্র হাতে গৌরী রায়। ইঙ্গিতে প্রিয়ব্রতকে কাছে ডাকল।

প্রিয়ব্রত মোটরের পাশে যেতে বলল, হাজার বললেও নিশ্চয়

আপনি আমার মোটরে উঠবেন না। আপনার পরমায়ুর দাম অনেক। আপনার সঙ্গে খুব জরুরী একটা কথা রয়েছে। আপনি ওপারে গিয়ে দাঁড়ান, আমি পুলিশের আলো পেরিয়ে যাচ্ছি।

বিস্মিত, কৌতূহলী প্রিয়ব্রত সাবধানে রাস্তা পার হয়ে গুলমোহর গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। একটু পরেই গৌরীর মোটর ফুটপাথের ধার ঘেঁসে থামল।

আপনি কবে এ শহর ছাড়ছেন স্যার?

আর দিন কয়েক। কেন, বল তো?

এখানকার কাজ আজ কালের মধ্যে মিটিয়ে ফেলতে পারবেন না?

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার কথা আর কবে আপনি বুঝতে পারলেন, গৌরী কপট নিশ্বাস ছাড়ল, তাহলে শুনুন স্যার, আমি একটা অন্যায় কাজ করেছি।

অন্যায় কাজ?

আপনি হয়তো তাই বলবেন। সুমিতাকে হরণ করে নিয়ে এসেছি।

এঁ্যা?

অনেক চেষ্টা করেও প্রিয়ব্রত নিজেকে সংযত করতে পারল না। কণ্ঠস্বর প্রয়োজনের চেয়ে বেশ একটু জোরেই হয়ে গেল। দু' একজন পথচারী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

একটু আস্তে স্যার, অত চেঁচাবেন না। সুমিতার বাড়ির লোক যদি পুলিশে খবর দিয়ে থাকে, মুশকিলে পড়ব। ভাবলাম আপনাকে গুরু দক্ষিণা দেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়টা তো পেশাই করেছি। নিরূপা সেজে সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সুমিতারও আপনার মতন অবস্থা। কেবল চোখের জল আর

দীর্ঘশ্বাস সম্বল। সাহসের শুধু অভাব। ঘণ্টাখানেক ধরে বোঝালাম। সাবালিকা মেয়ের আইন সহায়। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না। তাছাড়া আমার মনে হয় স্যার, একবার বিয়েটা হয়ে গেলে তার মা'র দিক থেকেও বিশেষ আপত্তি হবে না। নৈকষ্য না ভঙ্গ এ নিয়ে আবার আজকাল কেউ ভাবে নাকি ?

প্রিয়ব্রতর মনে হল অবিশ্বাস্য কাল্পনিক এক কাহিনী সে শুনে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল প্রথম পর্বে গৌরীর মধ্যে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন হিংসা আর রেষারেষির ভাবও ছিল। গৌরী যে কোনদিন এ ভাবে, এত দায়িত্ব নিয়ে, সুমিতাকে সাহায্য করবে এটা কল্পনার অতীতই ছিল। নারীর চরিত্র সত্যিই বিচিত্র। এর হদিশ পাওয়া পুরুষের পক্ষে অসম্ভব।

এবার বাকি কাজটুকু আপনাকে করতে হবে স্যার।

যন্ত্রচালিতের মতন প্রিয়ব্রত বলল, বল কি করতে হবে আমাকে ?

এই দু'দিন আপনি সব গোছগাছ করে নিন। পরশু রাত আটটায় আমি গাড়ি নিয়ে আসব। কোথাও গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। আমার এক মামার বাড়ি অবশ্য আছে।

না, না, প্রিয়ব্রত সবেগে মাথা নাড়ল, আমার এক বোনের বাড়ি আছে এ শহরে। সেখানেই নমো নমঃ করে বিয়েটা সেরে ফেলে পরের দিন ভোরে আমার দেশের বাড়িতে চলে যাব।

Fine, সোল্লাসে গৌরী হেসে উঠল, কে বলে স্যার unpractical, এসব ব্যাপারে সবাই সমান। ছাত্র আর অধ্যাপক একেবারে এক হয়ে যায়। আজ চলি স্যার। পরশু দেখা হবে।

দুটো দিন প্রিয়ব্রতর নিশ্বাস ফেলার সময় রইল না। প্রথমেই কাঠকুটো বাড়তি আবর্জনা সব বিক্রি করে দিল। এমন কি চেয়ার,

টেবিল, তক্তপোশটাও। এগুলো এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। পতিতপাবনবাবুকে ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ভদ্রলোকের দুঃখটা আন্তরিক সেটা কথাবার্তাতেই বোঝা গেল।

তাহলে সত্যিই চললেন। আপনার মতন এমন অমায়িক ভাড়াটে কি আর পাব। দেখবেন স্যার, ভুলে যাবেন না। কাজেকর্মে কলকাতায় যদি পদার্পণ করেন, কোন হোটেলে উঠবেন না। সোজা গরীবের আস্তানায় চলে আসবেন।

নীলা আর তরুণ একটু ম্রিয়মান ছিল, আশু বিচ্ছেদ ব্যথায়, কিন্তু প্রিয়ব্রতর বিয়ের ব্যাপার শুনে হৈ হৈ করে উঠল।

তরুণ বলল, আমি ক'দিন ছুটি নিই দাদা। বাড়িতে একটা শুভ কাজ হচ্ছে।

নীলা বলল, এ বাড়িতে শুধু মালাবদলের পাঠটা সেরে নেওয়া হবে। আসল কাজ সব দেশের বাড়িতে গিয়ে। কথাটা বলেই নীলা থেমে গেল। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে বলল, সেখানে অবশ্য আমাদের প্রবেশ নিষেধ।

প্রিয়ব্রত একটা হাত নীলার পিঠে রাখল, আজকাল কারও কোথাও প্রবেশ নিষেধ নেই। পৃথিবী অনেক বিরাট, অনেক উদার হয়ে গেছে। বউভাতের দিন দেবু তোদের নিজে নিয়ে যাবে নিমন্ত্রণ করে।

কিন্তু মা?

মাকে বদলানোর ভার আমার ওপর।

কেনাকাটি বাবদ কিছু টাকা প্রিয়ব্রত তরুণের হাতে দিল। অনেক আপত্তি, অনেক ধস্তাধস্তির পর তরুণ সে টাকা নিতে রাজী হল।

সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল, একটু শুধু খুঁত রয়ে গেল।

বিয়ে করে প্রিয়ব্রত বৌ নিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। তার

আগে মা বিন্দুবিসর্গ জানতেও পারবে না। এ অভিমান মা'র কোনদিন দূর হবার নয়।

কিন্তু মাকে বোঝাতে হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে অভিভাবক-দের মত হয়েছে, তখন আর সকলকে খবর দেবার সময়ও ছিল না। খোঁজ খবর দিতে গেলে লগ্ন পার হয়ে যাবে। মনে হয়, মা বোধ হয় অতটা অবুঝ হবে না। অন্তত সুমিতার মুখ দেখে সব দুঃখ সব অভিমান ঠিক ভুলে যাবে।

আর একটা বড় ব্যাপার রইল, নীলা আর তরুণকে মা'র সামনে নিয়ে যাওয়া। রীতিমত কঠিন সমস্যা। তবে নীলা আর তরুণ কেউই মা'র কাছে থাকবে না। বউভাতের হাঙ্গামা মিটলেই কলকাতায় চলে আসবে। কাজেই মনে হয় দু' একদিনের জন্য কোন রকম গোলমাল মা নাও করতে পারে।

এদিকের সব কাজ শেষ। এখন শুধু ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা। মৃদু শঙ্খধ্বনির মত মোটরের হর্ণ।

ভাগ্য ভাল প্রিয়ব্রতর, পতিতপাবনবাবু বাড়ি নেই। মেয়ের বাড়ি গেছেন। না হলে হয়তো প্রিয়ব্রতর সঙ্গে সঙ্গে মোটর পর্যন্ত যেতেন।

তারপর হাজার প্রশ্ন, হাজার কৈফিয়ৎ।

দু'হাতে দুটো স্যুটকেশ ঝুলিয়ে প্রিয়ব্রত মোটরে গিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মোটর রওনা হল। এবার আর প্রিয়ব্রত গৌরীর পাশে বসেনি। পিছনের সিটে বসেছে। তবুও প্রিয়ব্রতর আর একদিনের সর্বনাশা সংঘাতের কথা মনে পড়ে গেল। আজকের সংঘাতও কিছু কম নয়। এক মুহূর্তের ভুলে আর এক সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

শহর ছেড়ে শহরতলীর পথ ধরল মোটর। বেশী দূর নয়। বাগানবাড়ি প্যাটার্নের একটা বাংলোর সামনে মোটর থামিয়ে গৌরী নেমে গেল।

এখনই আসছি স্যার।

আকাশে চাঁদের ফালি। আলো দেয় না, অন্ধকারও মোছে না। বাইরে জোনাকির মেলা। বাংলো বাড়িতে কোথাও আলোর রেখামাত্র নেই।

দু'গালে দু'হাত রেখে প্রিয়ব্রত মনের মধ্যে চিন্তার ডুবুরি নামাল।

অনেকগুলো পায়ের শব্দ, ফিসফাস কথার আওয়াজ।

প্রিয়ব্রত পিছন ফিরে দেখল। নতমুখী সুমিতার হাত ধরে গৌরী আসছে।

কাছে আসতেই প্রিয়ব্রত আত্মদমনে অসমর্থ হয়ে বলে উঠল, সুমিতা।

ক্লান্ত, আয়ত, ভীরু দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে সুমিতা প্রিয়ব্রতকে আরতি করল।

ব্যস্, আর এগোবেন না স্যার, আমি ছাত্রী সামনে রয়েছি।

প্রিয়ব্রত সত্যিই কয়েক পা এগিয়েছিল, গৌরীর কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাহাদুর, বাহাদুর। গৌরী হাততালি দিয়ে ডাকল।

ঝোপের আড়াল থেকে কোট প্যাণ্ট পরা একজন নেপালী বেরিয়ে এল।

গৌরী প্রিয়ব্রতর দিকে চেয়ে বলল, বাহাদুর আপনাদের নিয়ে যাবে স্যার। আমি আর ষ্টিয়ারিং ধরব না। আজকেও একটু টিপ্‌সি রয়েছি। সাহস সঞ্চয় করার জন্যে অল্প ড্রিংক করেছিলাম।

সুমিতার হাত ধরে গৌরী তাকে মোটরের মধ্যে বসিয়ে দিল

ইতিমধ্যে নেপালীটা চালকের আসনে বসেছে। প্রিয়ব্রত আস্তে আস্তে পিছনের সিটে গিয়ে বসল।

মোটর কোটরে মুখ ঢুকিয়ে গৌরী বলল, চলি তাহলে স্যার ?

এখন তুমি কোথায় থাকবে? প্রিয়ব্রত প্রশ্ন করল।

এটা আমার মামার বাড়ি। রাতটা কাটিয়ে কাল বাড়ি ফিরে যাব। আমার জন্যে কেউ ভাবে না, স্যার, কেউ খোঁজ করে না।

একটু থেমে গৌরীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, চলি রে সুমিতা, তুই জিতলি মুখপুড়ি। যাক্, আমাকে যেন একেবারে ভুলে যাসনি। ভরাট সংসারের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ভাবিস আমার কথা।

শেষদিকে গৌরীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। প্রিয়ব্রতর মনে হল চড়া রং ভেদ করেও যেন জলের দু' একটি ফোঁটা চিক চিক করে উঠল।

মোটর ছেড়ে দিল। এবার শহরতলী থেকে শহরের দিকে মোটর মোড় নিল। তাল নারিকেল সুপারীর বন মুছে গিয়ে দু' পাশে রুদ্ধশ্বাস অট্টালিকার শ্রেণী দেখা গেল। রাতের বিলাসিনী কলকাতা। যৌবনসর্বস্ব।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রিয়ব্রত ভিতরের দিকে চেয়েই লজ্জা পেল।

সুমিতা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে ভয়, কুণ্ঠা, জড়তা নেই, আছে শুধু নববধূর ব্রীড়া। সুমিতার একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে প্রিয়ব্রত আবেগ-তরল কণ্ঠে বলল, হ্যারিয়েট!

সুমিতা সরে এসে প্রিয়ব্রতর বুকে মাথাটা রেখে অস্পষ্ট সুরেলা গলায় বলল, শেলী, মাই শেলী!